আবৃত্তিচর্চা

প্রজ্ঞা প্রকাশন
কুড়ি-এ সুকিয়া ষ্ট্রীট
কোলকাতা সাত লক্ষ নয়

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬১

প্রকাশক :
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
শৈবাল সরকার
২০-এ, সুকিয়া স্ট্রীট
কোলকাতা 700 009

প্রচ্ছদ :
অনির্ব্বান দত্ত

মুদ্রক :
মদনমোহন সাঁতরা
সোমা মুদ্রণ
২-এ, কেদার দত্ত লেন
কোলকাতা 700 006

: প্রাপ্তিস্থান :
পুস্তক বিপণী
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কোলকাতা 700 009

উৎসর্গ

আমাকে গড়েছেন যাঁরা

ভূমিকা

স্কুল-কলেজে পড়ার সময়, যখন প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়াই ছিল আবৃত্তি-চর্চার একমাত্র পথ, এই শিল্পটার অনাদর বড় কাঁদিয়েছিল। সে কান্না আজও থাম্‌ল না। সেই কষ্টের তাড়নাই দীর্ঘদিন যাবৎ এই শিল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আমাকে প্রাণিত করে চলেছে। আবৃত্তি শেখার জন্য খ্যাত-অখ্যাত নানা জনের দরজায় ঘুরে দুটো সত্য জেনেছি। এক, আবৃত্তির শিক্ষা বলতে শিক্ষকের বাচনভঙ্গির অনুকরণ। দুই, আবৃত্তির জ্ঞান বলতে সাহিত্য ও ব্যাকরণ জ্ঞান। যার কোনোটাকেই এই শিল্পের যথার্থ প্রয়োগবিদ্যা বলে মেনে নিতে পারি নি।

তারপর, দুই দশক ধরে খুঁজে চলেছি। নানা সময়ে সঙ্গে পেয়েছি নানা মানুষকে। তাঁদের সকলেই আমার মতো ব্যথাকাতর তা নয়, তবু এই অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে, আমার নির্মীয়মান পদ্ধতির শ্রমসাধ্য অনুশীলন করে, কখনো আংশিক কখনো পূর্ণ সাফল্যের রূপ দেখবার দুর্লভ সুযোগ তাঁরা আমাকে করে দিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ আজও সঙ্গে আছেন, কেউ দূরে গেছেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তার কিছুই শোধ হয় না।

ছন্দনীড় আবৃত্তি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার থাকার সূত্রে আবৃত্তি-শিল্পে রসসৃষ্টির নানা পরীক্ষণের সুযোগ পেয়েছি দীর্ঘ সতের আঠার বছর। সেই সূত্রেই সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও আবৃত্তি-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ও নানা শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যাদি আহরণের সুযোগও পেয়েছি। সেই সব অর্জন দিয়ে আর সাধ্যমতো শিল্পতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব, কণ্ঠবিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, উচ্চারণ-তত্ত্ব, ছন্দোবিজ্ঞান, অভিনয়বিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান এবং সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের দ্বারস্থ হয়ে আবৃত্তি-শিল্পের ধারাবাহিক চর্চার যে পদ্ধতি এ পর্যন্ত সাজিয়ে তুলতে পেরেছি, তারই রূপরেখা এখানে তুলে ধরা গেল।

কোনো শিল্পেরই চর্চা সম্বন্ধে ‘শেষ কথা’ বলে কিছু নেই। তেমন কোনো ঔদ্ধত্য এ লেখার কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকলে, তার জন্য আমার প্রকাশের

অক্ষমতা দায়ী। সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আবৃত্তির ক্ষেত্রে মৌলিক সৃষ্টি করার ও সেই সৃষ্টির প্রভাবে এই শিল্পের শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষক তৈরী করার কাজে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে—এটা ঘটমান বর্তমান।

বইটির প্রকাশ সম্বন্ধে প্রথমেই বলতে হয়, বাংলাভাষায় প্রথমতম আবৃত্তির বইয়ের লেখক ডঃ নীরদবরণ হাজরার কথা। তাঁর সহৃদয় হস্তক্ষেপেই এ বই এত শীঘ্র প্রকাশ পেতে পারল। শিল্পপ্রেম যে মানুষকে কতটা নিঃস্বার্থ করতে পারে, তাঁর সংস্পর্শে আসার আগে কখনো এমনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটে নি। এই প্রসঙ্গে কবিবন্ধু প্রমোদ বসুর উদ্যমও উল্লেখনীয়। অপর কবিবন্ধু রতন দাস ও আবৃত্তিকার রামচন্দ্র পালের নিয়ত প্রণোদনা ও পরামর্শ আমাকে সদাজাগ্রত রেখেছে।

শ্রীঅরূপ চট্টোপাধ্যায় ও শৈবাল সরকার যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে বইটির প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কবি ও শিল্পী অনির্বাণ দত্ত ভালোবেসে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর স্পর্ধা না করা-ই ভালো।

পরম শ্রদ্ধাভাজন ডঃ পবিত্র সরকার ও ডঃ অরুণ বসু বইটির পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

আবৃত্তি-চর্চার মধ্যে দিয়ে যাঁরা শিল্প সৃষ্টির আনন্দ পেতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই বইয়ের প্রকাশ। তাঁদের প্রতিভা-বিকাশের কাজে লাগলেই এ উদ্যম সফল মানবো।

বিষয়ক্রম

আবৃত্তি : কী ও কেন

প্রথমেই এই কথাটা বোঝা দরকার যে "আবৃত্তি" মানে কিছু মানুষের সামনে কিছু বলতে আসা। যিনি আবৃত্তি করছেন, তিনি তাঁর কোনো আবেগ-অনুভব-বক্তব্য শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। তিনি বলবেন, শ্রোতারা শুনবেন। এই সংযোগটা যেন অত্যন্ত সরাসরি ঘটে। এবং সামগ্রিক উপস্থাপনে এই সংযোগসূত্রটি যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্ন থাকে। তাঁর বাচনভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরের উত্থানপতনে, উচ্চারণে, অভিব্যক্তিতে এমন মায়া সৃষ্টি হতে হবে, যা তাঁর সামনে উপস্থিত মানুষজনকে তাঁর সমগ্র কথনকাল জুড়ে অপ্রতিরোধ্য টানে টেনে রাখবে, তা তিনি শোষিত মানুষের যন্ত্রণার কথাই বলুন, কি ব্যক্তিগত প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথাই বলুন, কি ঈশ্বরের কথাই বলুন বা কোনো একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনাই করুন। তার মানে এই নয় যে তিনি তাঁর কথাগুলি, শব্দ বা বাক্যাবলী, সর্বদাই শ্রোতার দিকে ছুঁড়ে দেবেন, বরং তিনি আত্মমগ্নই হোন্ বা সচেতন আলাপচারিতার মেজাজেই থাকুন, শ্রোতারা তাঁকে অনুসরণ করতে যেন বাধ্য হ'ন। তাঁর সমগ্র উপস্থাপনে তিনি কিছু অমৃত মুহূর্ত সৃষ্টি করবেন এবং এই নন্দিত আস্বাদ তাঁকে বারে বারে ফিরে ফিরে গড়ে দিতে হবে আসরের পর আসরে, নানা দিনে, নানা সময়ে, নানা পরিবেশে। এই-ই হচ্ছে আবৃত্তি।

তবে কি আবৃত্তি আর বক্তৃতা একই ব্যাপার?

একদিক থেকে দেখলে তাই। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই শ্রোতার সামনে আপন আবেগ-অনুভব-বক্তব্য বাক্‌মাধ্যমে হাজির করাই কাজ। উভয়ক্ষেত্রেই কণ্ঠস্বরের, উচ্চারণের, অভিব্যক্তির অনুশীলন দরকার। আবার অপর দিক থেকে দেখলে একে অপরের বিপরীত। বক্তৃতাকারের কাজ হ'ল নিজের ভাষায় বলা। তাৎক্ষণিক তৈরি করা বাক্‌বিন্যাসে আপন প্রকাশিতব্যকে সাজানো। তিনি যত অন্যের ভাষা এড়াতে পারেন, ততই তাঁর কৃতিত্ব। আবৃত্তিকার যত বেশি নিজের ভাষায় কথা বলবেন,

ততই বিরক্তি উৎপাদন করবেন শ্রোতাদের। আবৃত্তিকারের কাজ নয় সেটা। আবৃত্তিকারকে চয়ন করে আনতে হবে তাঁর প্রকাশোপযোগী ভাষা সুবিস্তৃত অফুরান আবহমান সাহিত্যভাণ্ডার থেকে। তারই মধ্যে দিয়ে তিনি, তাঁর প্রকাশপিয়াসী যা কিছু, তাকে মেলে ধরবেন। যেমন কোনো সংগীতশিল্পী তাঁর অনুভবগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন তাঁর গায়নশৈলীর মধ্যে দিয়ে। এইখানে আবার গায়ক বা অভিনেতার সঙ্গে মিল রয়েছে আবৃত্তিকারের। তাঁরাও পূর্বরচিত বা পূর্বনির্দিষ্ট ভাষা বা স্বরবিন্যাসের মাধ্যমেই নিজেদের প্রকাশিতব্য ভাবনা বা অনুভবকে দর্শক বা শ্রোতার কাছে নিয়ে আসেন।

গায়কের চর্চার বিষয় হ'ল, তাঁর ওই গায়নশৈলী বা পদ্ধতি। সেইটের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব। তারই শিক্ষা বা চর্চা হ'ল সংগীত-চর্চা। আবৃত্তিকারেরও তাই। আবৃত্তির শৈলী বা করণকৌশলই আবৃত্তিতেও চর্চার বিষয়।

কী বলছেন আবৃত্তিকার, সেটা কি আবৃত্তি? না কীভাবে বলছেন, সেইটা আবৃত্তি, কেমন করে বলছেন, সেইটা আবৃত্তি?

যাঁরা আবৃত্তি শুনে আবৃত্তির 'বিষয়'টা অর্থাৎ কবিতা বা সাহিত্যটা ভালো কি মন্দ এটুকুই বিচার করে থাকেন বা মনে করেন বিষয়টার উৎকর্ষ বা অপকর্ষই নিয়ন্ত্রিত করছে আবৃত্তিরও সার্থকতা বা ব্যর্থতা, তাঁরা যে ঠিক "আবৃত্তি" শিল্পের সমঝদার এমন কথা বলা যায় না।

অবশ্য বিষয়-এর সম্যক ধারণা বা জ্ঞান সব শিল্পেই প্রয়োজন। ধ্রুপদ এবং ঠুংরী যে একইভাবে গাইবার বিষয় নয়, একথা জানতে হয় যেমন গায়ককে, তেমনি গদ্য ও স্বরবৃত্তে লেখা বিষয় যে একই ভাবে আবৃত্তি করা চলে না, তা জানতে হয় আবৃত্তিকারকে। বা রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির গায়কীর মধ্যে যে মিশে আছে রচয়িতাদের আত্মরুচির স্বাদ, সে কথা যেমন করে বুঝে নিতে হয় গায়ককে তেমনভাবেই জীবনানন্দ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার আবৃত্তিতে কতখানি মেজাজের ভিন্নতা, তা বুঝতে হবেই আবৃত্তিকারকে। তবু শিল্পের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কখনোই এক স্তভাবে তার বিষয়ের জোরে নয়, বিষয়টি থেকে রূপ ও রসসৃষ্টির এবং তা পরিবেশনের মুন্সীয়ানার ওপরেই শিল্পের সাফল্য-ব্যর্থতা। আবৃত্তি বিষয়ে এই সত্যটির সম্যক উপলব্ধির অভাব দেখা যায়।

আবৃত্তি কি ?

এই কথাটা যে কোনোভাবে নির্দিষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে এমন আশা নিয়ে এই লেখা নয়। ওই যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটা কবিতা আছে না,

আঁকতে পারি চক্ষু তাহার
আঁকতে পারি নাক,
নকল চুলে লুকিয়ে রাখা
মস্ত বড় টাক,
ঠোঁটের পাশে কাজল দিয়ে
বানিয়ে তোলা তিল,
কিন্তু সবটা মিলিয়ে মুখ
আঁকাই তো মুশ্‌কিল!

সেই রকম। সব মিলিয়ে যে ব্যাপারটা, সেটা ফোটানো মুশ্‌কিল, তবু নানা দিক থেকে দেখার চেষ্টা। শিল্প কী? এই তর্কের মীমাংসায় 'শিল্পতত্ত্ব' নামক একটি বিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে, আর তাই নিয়ে ঢাউস ঢাউস সব বই লেখা হয়ে গেছে। আবৃত্তি যদি শিল্প, তবে তার ক্ষেত্রেও একই হাল হতে বাধ্য। সমাধান কিছু নেই, চেষ্টা কেবল বোঝার (বোঝা বাড়ানোরই আসলে)।

যে কোনো সৃষ্টির দুটি দিক আছে—এক হ'ল তার আত্মা, আর এক হল তার চেহারা। মানুষ নামক ঈশ্বরের এই বিস্ময়কর সৃষ্টিটির যেমন, তার হাতে যা সৃষ্টি হয়েছে, তাদেরও তাই।

চেহারাটা নিয়ে অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ চলতে পারে। চেহারাটা গড়ার ব্যাপারেই শিক্ষা চর্চা যা কিছু। এ লেখার সমস্তটাই আবৃত্তি নামক শিল্পটির চেহারা নিয়ে সেই ভাঙাগড়ার খুঁটিনাটি আলোচনা।

শিল্পের আত্মা নিয়ে আলোচনাই 'শিল্পতত্ত্ব'। সে আলোচনা কেবল এই অধ্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা।

একটা বহুল প্রচারিত ও অতিস্বীকৃত ধারণা একটু ফিরে ভাবার অবকাশ আছে। আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, আবৃত্তি বলতে কবি তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে যা বলতে চেয়েছেন, সেটাই ঠিকমত বুঝে নিয়ে, কবিতাটা বলার মধ্যে দিয়ে সেই ভাবটাকে ফুটিয়ে তোলা। কথাটা এতই প্রচারিত ও স্বীকৃত যে শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতনতাহীন সাধারণ মানুষ তো এটাই বোঝেন আবৃত্তি বলতে, এমন-কি প্রাতঃস্মরণীয় বহু বিদগ্ধজন, এই তত্ত্বটাকেই আরো

প্রসারিত করে বলে থাকেন যে কবির সম্পূর্ণ মানসিকতা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর হুবহু অভিপ্রায় ও অনুভব, এমন-কি কবিকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবহমান তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও যদি নিখুঁতভাবে কণ্ঠে তুলে আনতে পারেন আবৃত্তিকার, তাতেই আবৃত্তির চূড়ান্ত সার্থকতা।

কিন্তু তাই কি?

আবৃত্তিকার একজন রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর নিজস্ব আবেগ, অনুভব, বোধ, মেধা, মানসিকতা এসব তিনি কোথায় সরিয়ে রাখবেন? রেখে কবির মগজ, তাঁর আবেগ, তাঁর অনুভব আপন খোলসে ভরে নিয়ে একটা দম দেওয়া রোবটের বা কলের পুতুলের মত আচরণ করবেন?

আবৃত্তিকার একজন শিল্পী। এমন কখনো শোনা গেছে কি কোনো শিল্পে, যে শিল্পী তাঁর নিজস্ব অনুভবের প্রকাশ না ঘটিয়ে অন্যের অনুভবের প্রকাশের জন্যই শিল্পরচনা করেন? কোনো শিল্পী কি রাজী হবেন এমন দায় বহন করতে? আবৃত্তিকার কি কবির অনুভবের বাহক বা প্রচারক মাত্র? তাঁর কোনো সৃজনশীল ভূমিকা নেই?

উপারোক্ত তত্ত্বকে সত্য বলে মানলে, একটা কবিতার সঠিক বা আদর্শ আবৃত্তি বলতে কি কেবল একটিই অতিনির্দিষ্ট উপস্থাপন বোঝাবে না? অর্থাৎ যে কোনো মানুষই একটি কবিতার আবৃত্তি করুন, তাঁকে সার্থক হতে হলে ওই একইরকম অতিনির্দিষ্ট উপস্থাপনে পৌছতে হবে। সেটা কি হাস্যকর চিন্তা নয়?

প্রত্যেকটি মানুষের মানসিক গঠন যেহেতু তার ব্যক্তিসত্তারই অন্তর্গত, কোনো বিষয় সম্বন্ধেই দুটি মানুষের অনুভব হুবহু এক হতে পারে না। একজনের মনের যথাযথ অনুভব অন্যজন তার হয়ে সঞ্চারিত করবেন, এ ভাবনা নিতান্তই অলীক।

একটা সাধারণ ঘটনার কথা ধরা যাক্। আমারই কোনো বন্ধু অপর একজনের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। সেই কথা সে আমাকে জানালো। আমি যদি সেই বার্তা অপরজনটির কাছে পৌছে দিই, আমি কি তার আবেগ অনুভব সমেত হুবহু পৌছে দিতে পারব? যদি তারই ভাষায়, তারই ভঙ্গিতে বলি, তবুও? সে চেষ্টাও হাস্যকর। বরং সেটা না করে কেবল খবরটুকু তাকে জানানোই শ্রেয়। নিরাবেগ, নিস্পৃহ খবর কেবল। কিন্তু, আমি যদি ওই বন্ধুটির প্রতি তার এরকম ব্যবহারে নিজেও রি-অ্যাক্টেড্ হয়ে থাকি, সেই

রি-অ্যাক্‌শনটা তার কাছে প্রকাশ করলে সেটা আমারই সত্য অনুভব প্রকাশ হয় এবং সেটার একটা প্রভাব ওই অপরজনটির ওপর পড়তে পারে। এটা সম্ভব।

দৈনন্দিন জীবনযাপনে, রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া এরকম সব অনুভবই যথাযথ আর একজনের মাধ্যমে পৌঁছতে পারে না। আর লিখিত ভাষা থেকে উদ্ধার করে অবিকৃত মানসিক অভিঘাতকে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেবেন আবৃত্তিকার—সেটাই নাকি তাঁর কাজ, এরকম ধ্যান-ধারণার মধ্যে সুষ্ঠু চিন্তার অভাব রয়ে যাচ্ছে না কি?

রবীন্দ্রনাথ একজন বিরল মানসিকতার মানুষ। তাঁর তুল্য আভিজাত্য, ব্যক্তিত্ব ঔদার্য, অনুভব, কল্পনাশক্তি আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের কী করে সম্ভব? আমি হেন অতি সাধারণ মেধা ও প্রতিভার কেউ প্রকাশ করবে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা, তবেই রবীন্দ্রকবিতার আবৃত্তি সার্থক হবে —এ তো অসম্ভব কল্পনা। আমি কি অনন্ত সাধনাতেও সেই মানসিকতায় পৌঁছতে পারব? তবে কি আমার আবৃত্তি করা চলবে না রবীন্দ্রকবিতা? বা রবীন্দ্রমানসস্তরে পৌঁছবার মত প্রতিভা রয়েছে এমন মানুষ ছাড়া কেউ রবীন্দ্রকবিতা দিয়ে কোনো সার্থক আবৃত্তি-শিল্প সৃষ্টি করতে পারবেন না? বা অপরপক্ষে, খুব সাধারণ প্রতিভার কোনো কবির কবিতা যদি শ্রীশম্ভু মিত্রের মতো প্রতিভাধর ও পরিশ্রমী শিল্পী আবৃত্তি করেন, তাঁকে হাঁটু মুড়ে ব'তে হবে সেই কবির মানসিকতা বরাবর? সেই কবির ভাষা দিয়ে ব্যাপ্ততর কিছু প্রকাশ করতে পারবেন না শ্রীমিত্র?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, যেহেতু কবিতা একটা শিল্প, তার রসগ্রহণ করতে পারলে, তার সংস্পর্শে এলে যে কোনো সংবেদনশীল মানুষেরই একটা অনুভব হবে। কিন্তু সেটা যে কবি যেটা চেয়েছেন, সেটাই হতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা কি শিল্পসম্মত?

কোনো ঘটনা, কল্পনা, আবেগ থেকে শিল্পীর মনে জন্ম নেয় প্রকাশপিয়াসী অনুভব। তখন তিনি তাঁর অনুশীলিত নিজস্ব মাধ্যমে সেই অনুভবকে রূপ দেন। এটা হঠাৎ ঘটতে পারে, বহু শ্রমে বহু দিন ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়েও ঘটতে পারে। কিন্তু সেই রূপসৃষ্টির খেলাটা শিল্পীর সঙ্গে তাঁর শিল্পের। আবার সেখানেই শিল্প সম্পূর্ণ নয়। তার আর আধখানা তখনো বাকি থাকে। অপর প্রান্তে আছেন ভোক্তা। যতক্ষণ না শিল্পীর সৃষ্ট শিল্প ওই অপর প্রান্তটির

ওপর মানসিক কোনো সংবেদন সৃষ্টি করছে, ততক্ষণ ওই শিল্পটির কোনোই মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে না।

ভোক্তা একজন মানুষ। তাঁর নিজস্ব রুচি, বুদ্ধি, মেধা অনুযায়ী তিনি শিল্পের ওই অবয়বটুকু থেকে প্রকৃত শিল্প-উপভোগ সৃষ্টি করছেন নিজের মধ্যে। এক একজনের কাছে এক এক রূপে ধরা দিচ্ছে শিল্প। এইটা যদি না-ই হ'ল তবে শিল্প তো অসম্পূর্ণ। এবং এই যে জনে জনে নিজের নিজের মত উপভোগ তৈরি করতে পারছে, এই-ই শিল্পের বৈশিষ্ট্য। তা যদি না হ'ত মানুষ শিল্পের কাছে যেত না। আর, কোনো শিল্প থেকে যদি এক বই দু রকম অনুভব সম্ভবই না হয়, তবে তা শিল্পই নয়। সে বিজ্ঞানের ফর্মুলামাত্র বা একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারমাত্র—কোনো যন্ত্র, যান্ত্রিক পদ্ধতি বা রাসায়নিক পদার্থ। একটা বিজ্ঞানের সূত্রের যে দ্বিতীয়রকম মানে বোঝে, সে আসলে মূর্খ—একথা সর্বজনস্বীকার্য। শিল্প কি সেরকম একমাত্রিক? প্রত্যেক ভোক্তার অনুভবেই শিল্পের নতুন জন্ম হয়। সেই জাত অনুভব দিয়ে সকলেই হয়ত আর একটা শিল্প গড়তে যান না, কেবল উপভোগ করেন। কিন্তু গড়েনও কেউ কেউ। তাই আমরা দেখি সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে কবিতা লিখছেন বিষ্ণু দে, জীবনানন্দের কবিতা পড়ে ছবি আঁকছেন কোনো আধুনিকতম চিত্রকর। সেখানে কিন্তু সুচিত্রা মিত্র যা বলতে চান সেই বক্তব্যটা কবিতায় প্রকাশ করেন না বিষ্ণু দে বা জীবনানন্দ যা বলতে চান তারই ব্যাখ্যা প্রকাশ করে না ছবি। তখন আমরা সেখানে বিষ্ণু দে বা ওই শিল্পীরই অনুভবটুকু পাই। তাঁদেরই খুঁজি, বুঝতে চেষ্টা করি। আবৃত্তিকারও তেমনি একজন স্রষ্টা।

কবিতা যেহেতু একটা শিল্প, তাই কবিতা নানাভাবে অনুভূত হতেই পারে নানা জনের দ্বারা। তারা সবাই সেই প্রেরণায় অপর একটা শিল্পসৃষ্টি করতে যান না। উপভোগ করেন কেবল। আবৃত্তিকার শিল্পী, তাই তিনি তাঁর অনুভবকে প্রকাশ করতে চান। আবার সব সময়ই যে কবির কবিতা পড়ে আপ্লুত হয়ে আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার তা নয়। নিজের ভেতরেই কোনো ভাব জন্ম নেয়, বক্তব্য গড়ে ওঠে, যাকে প্রকাশ করার উপযোগী কাব্যপংক্তি খুঁজে নিতে হয় আবৃত্তিকারকে। এ-ও ঘটনা।

যদি মনে করা হয়, নিজে প্রকাশোপযোগী কাব্যপংক্তি লিখতে পারেন না বলেই কবির কাছে ভাষা ধার করতে হয় আবৃত্তিকারকে, তবে সে নিতান্ত মূর্খামি হবে। তা হবে আবৃত্তি মাধ্যমকে না বোঝার ফল। আবৃত্তিকারের

কাজই তো নয় কথা বা শব্দ সাজিয়ে নিজ অনুভব প্রকাশোপযোগী বাক্য বা ভাষা গঠন করা। চলচ্চিত্র সৃষ্টির জন্য অন্যের গল্পকে আশ্রয় করেন চলচ্চিত্রকার। তিনি নিজে গল্প লিখতে পারছেন না কেন, এই প্রশ্নে কি তাঁর প্রতিভার অবমূল্যায়ন করতে হবে? না কি লিখতে পারলে তাঁর যে কৃতিত্ব, সেটা তাঁর চলচ্চিত্র প্রতিভারই অন্তর্গত হবে? না কি গল্প যেখান থেকেই নেওয়া হোক তার রূপায়নের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা কতদূর সফলভাবে ব্যবহার করতে বা গড়ে তুলতে পারছেন তিনি, সেটাই হবে তাঁর শিল্পবিচারের মাপকাঠি?

একজন ক্ল্যাসিক্যাল গায়ক যদি সুর-তাল-লয় দিয়ে, রাগ-রাগিণী দিয়ে তাঁর আত্মঅনুভব প্রকাশ করতে না পারেন, একজন নৃত্যবিদ্ যদি নৃত্যভঙ্গিমা দিয়ে না প্রকাশ করতে পারেন তাঁর প্রকাশিতব্য, তাঁদের প্রকাশের জন্য কথা সাজাতে হয়, তবে যত সুচারু আর মূল্যবান হয়ে উঠুক তাঁদের সেই কথাভাষা, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ মাধ্যমে ব্যর্থই প্রতীয়মান হবেন। নিজেই যদি লিখবেন আবৃত্তিকার, তবে তিনি আর আবৃত্তিকার কিসে? তাঁর সেই লেখার কৃতিত্ব-টুকুর জন্য তিনি কবিখ্যাতি দাবী করতে পারেন অবশ্যই, আবৃত্তিকার হিসেবে তার আলাদা কোনো মূল্য নেই। পূর্বরচিত কোনো সুচারু ভাষাকে নিজস্ব দ্যোতনায়, নিজস্ব অনুভবের রঙে কণ্ঠমাধ্যমে প্রকাশ করে রসসৃষ্টি করাই আবৃত্তিকারের শিল্প। তেমনই কোনো ভাষাকে কাজে লাগিয়ে আপন স্বরক্ষেপণ, উচ্চারণ, অভিব্যক্তি, ছন্দবোধ দিয়ে যদি আত্ম-অনুভব প্রকাশ করতে না পারেন তিনি, তবে সে তাঁর ব্যর্থতা—ওই সংগীতশিল্পী বা নৃত্যশিল্পীরই মতো।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে পাশ্চাত্য সংগীততত্ত্ববিদ হার্বার্ট স্পেন্সারের একটা চিন্তার মুখোমুখি হই আমরা, "সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে ধরনে কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (sign of ideas) আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (sign of feelings)।

বুঝে নেওয়া দরকার, কথার এই অনুভাবের দিকটিই আবৃত্তিকারের চর্চার বিষয় এবং আবৃত্তি-শিল্পের মূল ভিত্তি।

আবৃত্তি শোনার সময়ও তাই। কোনো আবৃত্তিকারের কণ্ঠে আমরা যখন কোনো কবিতার আবৃত্তি শুনি তখন কবি কী লিখেছেন এটাই কি জানতে চাই? যাঁরা আবৃত্তিকারের গলায় আবৃত্তি শুনে কবির মানসিকতা উপলব্ধি করে নিতে চান, তাঁরা কি আবৃত্তির প্রকৃত শ্রোতা? রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' বা

সুকান্তের ‘প্রিয়তমাসু’ কবিতার কী বিষয়বস্তু সে তো আমরা সবাই জানি। এবং এখানে কবি কী বলতে চেয়েছেন, এ নিয়ে নানা আলোচনাও শোনা আছে —সেগুলোও সব একই রকম তা নয় (না হওয়াই স্বাভাবিক)। আমরা যখন এইসব কবিতা বিভিন্ন আবৃত্তিকারের কণ্ঠে শুনতে চাই, তখন কি সেই পূর্ব-আলোচিত ধ্যানধারণাগুলোকে মিলিয়ে নিতে যাই? তা যদি হয়, তবে আবৃত্তি শুনে কোনদিনই তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। যাঁর কাছ থেকে আবৃত্তি শিল্পটাকে আমরা পাচ্ছি, শিল্পী হিসেবে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, মননশীলতা, কল্পনাশক্তি এসব কিছুর খোঁজে যাচ্ছি না আমরা, এ কেমন শিল্প-উপভোগ? তবে কি আবৃত্তিকারকে আমরা কোনো সৃজনশীল শিল্পী মনে করছি না?

একটা কবিতাকে ভিত্তি করে নিজস্ব অনুভবকে মেলে ধরাই আবৃত্তিকারের কাজ। সে তিনি নিজের ভাবনা প্রকাশের জন্য পংক্তিগুলি খুঁজে নিন বা পংক্তিগুলিই তাঁকে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে থাকুক। সেখানে কবি কী ভেবে সেই পংক্তিগুলি লিখেছিলেন, কোন্ অভিঘাত থেকে কবিতাটির জন্ম হয়েছিল, এসব তথ্য আবৃত্তি করার জন্য তো নয়ই, আবৃত্তি উপভোগের জন্যও অনিবার্য নয়। কারণ, আবৃত্তি কবিতা-শিল্পের Extensicn নয়। তা একটা অন্য শিল্প। তা আবৃত্তিকারের সৃষ্ট শিল্প। কবিতা সেই শিল্পসৃষ্টির উপকরণ মাত্র। একটা ‘কবিতা’কে সম্যক উপলব্ধি করার জন্য হয়তো বা তার সৃষ্টির গল্প আমাদের কাজে লাগে, তেমন কোনো সৃষ্টিকাহিনীর উপযোগ যদি থাকে আবৃত্তি উপভোগের ক্ষেত্রে, তবে তা ‘আবৃত্তি’টি সৃষ্টির যে গল্প, সেটাই। কবিতা সৃষ্টির গল্প নয়।

অবশ্যই অনিবার্য নয়, কিন্তু কবিতাটি সম্পর্কে বিশদ জানা ও কবি ও আবৃত্তিকারের সৃষ্টিপ্রতিভার তুলনামূলক বিচার অনভিপ্রেতও নয়। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আবৃত্তি তার নিজস্ব আঙ্গিকবৈশিষ্ট্যসহ একটি বহুমাত্রিক শিল্প। আবৃত্তি-শিল্পী আপন অনুভবকে প্রকাশ করেন, আপন সমগ্র অস্তিত্ব নিংড়ে রূপসৃষ্টির মাধ্যমে। রসিক শ্রোতা তাঁদের আপনাপন মেজাজ, রুচি, বুদ্ধি অনুযায়ী সেই সৃষ্ট রূপটি থেকে নিজ নিজ উপভোগ গড়ে নিতে পারেন। একটি প্রকৃত মননশীল সৃষ্টিধর্মী আঙ্গিকনৈপুণ্যময় আবৃত্তি থেকে কেউ অভিহত হ'ন ভাবের দ্বারা, কেউ শোনেন স্বরের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার, কেউ লক্ষ্য করেন বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণের ব্যঞ্জনা, কেউ শ্রুতি-অনুভবে রূপায়িত দৃশ্য চোখের সামনে

ফুটে উঠতে দেখেন, কেউ চমৎকৃত হন কবিতা ব্যবহারের ব্যাপারে আবৃত্তি-কারের মননশীলতায়, কেউ বা উপস্থাপিত বক্তব্য ও অনুভবকে আপন অভিজ্ঞতার নিরিখে স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করেন। একটি প্রকৃত আবৃত্তিতে উপভোগের এরকম নানা দিক, নানা স্তর থাকে। কখনো আবার স্তরগুলি মিলিতভাবে একই সঙ্গে আপ্লুত করে কোনো শ্রোতাকে। কিন্তু যাঁরা মনে করেন, স্থিরভাবে কবিতাটি বই দেখে পড়ে গেলেই তার যা কিছু মহিমা আপনি ফুটে উঠবে, কেবল কাব্যবোধটুকু থাকলেই হ'ল—তাঁদের সেই পাঠে উপভোগের এত স্তর থাকা সম্ভব নয়। তাঁরা কিছুই সৃষ্টি করেন না। তাই তাঁদের সেই উপস্থাপন থেকে কবির রচিত ভাষাটুকু ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার থাকে না শ্রোতার।

আবৃত্তির আঙ্গিক সম্বন্ধে যদি চর্চা না থাকে এবং কোন্ ভাষার পক্ষে কোন্ আঙ্গিক প্রযোজ্য, কোন্ অনুভবের প্রকাশকে কোন্ আঙ্গিকে বাঁধা সম্ভব, এ বিষয়ে নিয়ত মনন ও অনুশীলন না থাকে নতুন নতুন রূপবন্ধ সৃষ্টির মাধ্যমে আবৃত্তিকারের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটা তো দূরের কথা, বলবার সময়ে মানবস্বভাবের স্বাভাবিক বৃত্তি অনুযায়ী যে আবেগ আসে, সেটুকুও সুনির্ণীত সুচিন্তিত আঙ্গিকে রূপান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে এবং আবৃত্তিকারের সঙ্গে শ্রোতার সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

কবির হৃদয়ে যে বোধির জন্ম, তিনি কবিতাটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্পরূপায়ণ শেষ হ'ল। আবৃত্তিকারের নিজের বুদ্ধি ও হৃদয়ের আলোড়ন থেকেই কেবল জন্ম নিতে পারে আবৃত্তি।

কোনো শিল্পেরই আত্মার সন্ধান তো দেওয়া যায় না এভাবে। এ বিষয়ে এটুকুই মাত্র বলা গেল। এ অধ্যায় শেষ করার আগে আরও দু'একটি কথা না বলে নিলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে বিস্তর। সেটুকু বলেই এ অধ্যায় শেষ করব।

তবে কি কবিকে জানবার বা কবিকৃতির উৎস সন্ধান করার কোনো চেষ্টা করবেন না আবৃত্তিকার? যে কোনো কবির যে কোনো কবিতাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করবেন নির্বিচারে?

আদৌ তা নয়। একটি বাদ্যযন্ত্রকে যত নিপুণভাবে, যতটা মমতা দিয়ে জানেন বাদ্যযন্ত্রী, তেমন করে প্রতিটি কবির সৃষ্টি, তাঁর কাল ও পরিবেশ, স্বভাব ও মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে জেনে নিতে হবে আবৃত্তিকারকে। নতুবা

যে ভাষা তিনি ব্যবহার করবেন তার অসম্ভবরকম ভুল নির্বাচন বা ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা।

কোনো কোনো মানুষের ব্যবহার এমন যে হঠাৎ তার মুখোমুখি হলে খুব রূঢ় বোধ হয়, অথচ কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে মিশলে টের পাওয়া যায় যে ওটা তাঁর বাইরের চেহারা মাত্র। আবার বিপরীতও আছে। কারো ব্যবহার খুব মেয়েলী, দুর্বল বলে চেনায় তাকে। কিন্তু গভীরতর মেলামেশায় বোঝা যায়, তারও ভেতরে রয়েছে কতটা আগুন, দৃঢ়তা বা আত্মপ্রত্যয়। বিভিন্ন কবির রচনাও এরকম করে উপলব্ধি করার বিষয়। গভীর আসঙ্গ-লিপ্সা নিয়ে যদি তাদের কাছে যেতে পারেন আবৃত্তিকার, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার মতো আনন্দ পেতে পারেন তিনি। একই মানুষ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের যেমন ভিন্ন ভিন্ন বোধ জন্মায় তেমনি একই কাব্যকৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমা গড়ে ওঠে বিভিন্ন আবৃত্তিকারের হৃদয়ে।

যার সঙ্গে মেলামেশাই হ'ল না ঠিকমতো, তার সম্পর্কে কিছু বলবার বা তাকে নিয়ে কোনো কাজ করার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুতেই নেই। কবিতার বা কবিকৃতির সঙ্গে আবৃত্তিকারের সম্পর্কটা এভাবেই বুঝে নিতে হবে।

কবিতার সঙ্গে নিত্য বসবাস চাই আবৃত্তিকারের। আবহমান কবিতার সঙ্গে। এমন হওয়া চাই সে সখ্য যে, যখনই যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো ঘটনার মুখোমুখি বা যে কোনো মানসিক অবস্থায় তিনি থাকুন, খাপ খাওয়ানোর মত কোনো না কোনো কবির, কোনো না কোনো লাইন তাঁর ঠোঁটে যেন ঠিক উঠে আসে।

তারপরও বাকি থাকে আবৃত্তিকারের শিল্পীসত্তার জাগরণের দিকটি। এই প্রকৃতির মধ্যেই তো সবাই বসবাস করছে, এই সকাল-সন্ধ্যা, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের আবহ গায়ে মেখে এই সাতরঙা বর্ণচ্ছটা চারপাশে রোজই দেখছে, কিন্তু দেখেও যেন দেখছে না, দিনযাপনের গ্লানি আর গতিতে ভেসে যাচ্ছে তাদের সব অনুভব।

কবি আর শিল্পীরাই অনুভব করেন সব কিছু প্রতিক্ষণে, প্রতিস্থানে। তাই, শিল্পীর হাতে আঁকা এই প্রকৃতিরই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সুন্দরকে খুঁজে পাই।

ধূলিম্লান এই জীবনেরই অনভিপ্রেত জটিলতার, সমস্যার উন্মোচনই সাহিত্যে, কবিতায়, রসের ধারায় ধুইয়ে দেয় আমাদের। বেদনাও হয় পরম রমণীয়। আরও একটু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

এই কাজ শিল্পীর। আবৃত্তিকার তো তার ব্যতিক্রম নন। জীবন, জগৎ আর পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তাঁর সংবেদনশীলতা চাই, সেই সংবেদন তাঁর শিল্পে সঞ্চারিত হওয়া চাই। মনে রাখতে হবে আবৃত্তিকারের হাতে সময় বড় কম। এক শ্রোতাসমষ্টিকে তিনি একবারই পাবেন, খুবই স্বল্প সময়ের জন্য। শিল্পীর করণীয় যা কিছু তা তাঁর কণ্ঠস্বর আর বাচনিক দক্ষতায় সেই সময়টুকুর মধ্যে একবারের একক প্রচেষ্টাতেই করতে হবে। কবির মতো বা চিত্রকরের মতো লিখে আবার বদল করার, এঁকে আবার মুছে ফেলার সুযোগ তাঁর নেই। এমন কি সংগীতশিল্পীর মত একই সুর বা পংক্তি দ্বিতীয়বার প্রক্ষেপণ করে উন্নততর প্রকাশের সুযোগও তাঁর নেই। মঞ্চে আসীন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি প্রক্ষেপণ অমোঘ ও অব্যর্থ না হয়ে উঠলে তাঁর সাফল্য দূর অস্ত্।

এই কঠিন যুদ্ধের জন্য তাঁর প্রস্তুতি ততটাই পরিশ্রম মনন, সংবেদন ও একাগ্রতা দাবী করে।

দুই

আবৃত্তি কলার কৌশল

শিল্পের কৌশল বা আঙ্গিক নিয়ে যতই কসরত্ দেখানো যাক্, রসে পৌঁছতে না পারলে সবই নিরর্থক। একথা যেমন সত্য, তেমনি কৌশল বা আঙ্গিকের উপযুক্ত শিক্ষা ও সেই পথে দক্ষতার ধার না ধেরে শুধু স্বভাবপ্রতিভার জোরে শিল্পসৃষ্টি করতে গেলে অনেকেরই পথ যে মাঝখানে এসে ফুরিয়ে যায়, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে, কিন্তু তার সংখ্যা অনিবার্য-ভাবেই স্বল্প।

আসলে, শিল্পের যে কোনো কৌশলই যে রসসৃষ্টির উপায়মাত্র, এই কথাটি কৌশল বা আঙ্গিক চর্চার প্রতি পদে মনে রাখতে হবে আমাদের। কৌশল-গুলির স্বরূপ চেনা এবং প্রকাশিতব্য অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে ব্যবহার করতে পারার শিক্ষাই যে কোনো শিল্পের শিক্ষণীয় বিষয়। তার প্রাথমিক কিছু বিষয়ের অনুশীলন বাঁধা পথে করা উচিত। সেই অনুশীলন যত শ্রম ও মনোযোগ দিয়ে করা হবে, ততই শিক্ষার ভিতটি পাকা হবে। আঙ্গিক বা কৌশলের বাঁধা ধরা নির্দিষ্ট শিক্ষাটুকু একেবারে যন্ত্রের মত নিখুঁত কুশলতায় পৌঁছে না দিলে, পরবর্তী ধাপে কোনো শিল্পীই উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন না। কৌশলের এই নির্দিষ্ট শিক্ষা শিল্পসৃষ্টির কঠিন সংগ্রামে কখনোই শিল্পীর 'রেডিমেড হাতিয়ার' নয়। বরং বলা চলে, ঐ শিক্ষাটুকু হাতিয়ার তৈরির জন্য দরকার। শিল্পীর মানসলোকে প্রতিমুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে যে জটিল চেতনা বা অনুভব তাকে নিজের শিল্পে যথাযথ রূপ দেওয়ার সংগ্রামই শিল্পীর মূল সংগ্রাম। এ এক ভীষণ কষ্টের ব্যাপার। কিছুতেই তৃপ্তি নেই, কেবলই নতুন নতুন পথ, রীতি-পদ্ধতির জন্য প্রাণপাত। চেতনা বা অনুভবই তাকে ঐ পথ খুঁজতে চাপ দেয়। প্রত্যেক সচেতন শিল্পীই এই ভাবে কলাকৌশলের নতুন পথ বা রীতি বা প্রয়োগপদ্ধতি, যাই বলা যাক্, খুঁজে চলেছেন প্রতিনিয়ত।

বিজ্ঞানে যেমন, একজন কতরকম ফর্মুলা জানেন, কোন্ দ্রব্যের সঙ্গে কোন্ দ্রব্যের বিক্রিয়ায় কী ঘটে এরকম সহস্র সূত্র বলতে পারেন, বা কোনো জটিল যন্ত্রদানবের কোথায় কী অংশ সন্নিবেশিত আছে সব নখদর্পণে রাখতে পারেন,

তাঁকে আমরা জ্ঞানী বলবো, কিন্তু যতক্ষণ না তিনি এই সব জ্ঞানের প্রয়োগে নতুন কোনো দ্রব্য বা যন্ত্র বা নিদেনপক্ষে নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে পারছেন ও তার উপযোগ দেখা যাচ্ছে, তাঁকে আমরা স্রষ্টা বলতে পারি না, শিল্পেও তেমনি, ফর্মূলার মতো পূর্বার্জিত কলাকৌশলের বিশাল সংগ্রহ থাকলেও, যতক্ষণ না নবীনতর কোনো কৌশল ও রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার উপযোগ দেখা যাচ্ছে, কোনো শিল্পচর্চাকারীকেই স্রষ্টার সম্মান দেওয়া যায় না। শিল্পী বলা যায় না। শিল্পে অবশ্য প্রাচীন কোনো কৌশলেরও নতুন রকম প্রয়োগে নতুন রস সৃষ্টি সম্ভব হয়। নিঃসন্দেহে, সেও এক নতুন আবিষ্কারই। অর্থাৎ শিল্পী নিত্যই আবিষ্কর্তা। একটা সার্থক শিল্পসৃষ্টি মানেই নতুন আবিষ্কার।

কিন্তু যে শিল্পী সেই শিল্পের কৌশল বা আঙ্গিক সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানেন না বা সেগুলির সচেতন চর্চা করেন নি, তিনি প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট সীমার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকেন। আবার কৌশল বলতে যিনি তাঁর বাঁধাধরা শিক্ষাটুকুই বোঝেন, সেগুলিকে ভিত্তি করে নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন না, তাঁরও একই অবস্থা। আরও একটা দরকারী কথা হ'ল এই যে, শিল্পীর কাছে তাঁর অনুভব প্রকাশের জন্য নির্ণীত কৌশলগুলি বা আঙ্গিকটি কেবল ভোক্তার চিত্তে রস সঞ্চারের জন্য তাই নয়, শিল্পীর নিজের ভেতরটাকে জাগিয়ে তুলতেও সাহায্য করে সেটি।

কোনো সংগীতশিল্পী যখন ভৈঁরোর নির্দিষ্ট পর্দাগুলিকে তাঁর স্বর দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছেন, তখন কেবল যে শ্রোতার মনেই ভোরের আমেজ জাগছে তা নয়, শিল্পীর কানে যখন পৌঁছচ্ছে তাঁর নিজ কণ্ঠস্বর, তা তাঁর নিজেরও অনুভবকে জাগিয়ে তুলে তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছে উন্নততর গানের দিকে। জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার যে কোনো শিল্পে, যেখানে একই রূপারোপ, একই অনুভব বা পরিবেশ ফিরে ফিরে নানা জনসমষ্টির সামনে শিল্পীকে গড়ে তুলতে হয়, সেখানে কৌশল বা আঙ্গিক এইভাবে তাঁকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই নিমগ্ন হতে, উন্মুক্ত মঞ্চে বসে নিজস্ব আবেগের বা অনুভবের কেন্দ্রবিন্দুকে ছুঁতে সাহায্য করে। সেই হিসেবে পারফর্মিং আর্ট-এ তার আঙ্গিক (ফর্ম) বা কলাকৌশলকে বলা যায় টু-ওয়ে-ট্র্যাফিক। যে বিষয় প্রকাশ করা দরকার, তার যথাযথ অনুভব থেকে নির্ণীত হবে আঙ্গিক। আবার প্রতিদিন অনুশীলনের সময় সেই আঙ্গিকগুলি ঠিকমত পরিক্রমা করতে থাকলেই যাতে অনুভবে ফিরে আসা যায়, আবেগ আপনি সংযুক্ত হয় নিবেদনে, জোর করে আনতে না হয়, সেই সংযোগের অভ্যাস

করতে হবে। এর ফলে, বারে বারে ফিরে ফিরে একই পরিবেশ বিভিন্ন জনসমষ্টির সামনে গড়ে তোলার ব্যাপারটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে যাবে। এই টু-ওয়ে-ট্র্যাফিক-এর অনুশীলনটি খুব মজাদার খেলা। ধ্যানের মত নিমগ্ন হওয়ার প্রক্রিয়া এটি। যিনি এই সৃষ্টির পথ একবার চিনেছেন, তিনি আপনার আনন্দে আপন শিল্পে মগ্ন হতে পারেন।

কলাকৌশল নিয়ে এই যে আলোচনাটি এতক্ষণ হ'ল, আবৃত্তিকে কেন্দ্র করে এইসব কথা ভাবতে নিশ্চয় খুব ধোঁয়াটে লাগবে। কেননা, আবৃত্তি বলতে প্রচলিত যে ধ্যানধারণা তা হ'ল, কবিতাকে ঠিকমত উপলব্ধি করে সেই উপলব্ধিকে কণ্ঠে প্রকাশ করা। যার কাব্যবোধ যত ভালো, সে তত ভালো প্রকাশ করতে পারবে। সেই যে প্রকাশ, সেটা তো বোধসঞ্জাত। এর মধ্যে আবার আঙ্গিক কোন্‌টা? দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই, আবৃত্তির আঙ্গিক বলতে তাই, কবিতার আঙ্গিকেরই আলোচনা হয়—কবিতায় ব্যবহৃত অলঙ্কার, তার চিত্রকল্প, ছন্দ ইত্যাদি। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে কি উপরোক্ত আলোচনার কোনো অর্থ উপলব্ধি করা যাবে?

কেউ যখন আবৃত্তি শিখতে যান কারো কাছে, তখন শিক্ষক তাঁকে কবিতাটি বুঝিয়ে দেন এবং শিক্ষার্থী নিজে থেকে প্রকাশ করতে না পারলে তাকে গলায় করে দেখিয়ে দেন। সে সেটি অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। ক্রমে সমগ্র কবিতাটির প্রকাশ সে গুরুর ধরনে করতে পারে। তা যত পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়, মনে করা হয় সে আবৃত্তিতে তত উন্নতি করছে। কখনো কখনো এমন দাবীও শোনা যায়, যে আবৃত্তি সংগীতের মতই গুরুমুখী বিদ্যা, সুতরাং গুরূপ নিখুঁত নকলেই শিক্ষার সার্থকতা। এইভাবে পঞ্চাশ ষাট বা একশোটি কবিতা আবৃত্তি করলে শিক্ষার্থী ক্রমেই গুরুর বাচনভঙ্গির ধরনটি রপ্ত করে ফেলেন। তখন তিনি যে কবিতাই আবৃত্তি করুন, চোখ বুজলে তাঁর গুরুর আবৃত্তিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মকসো করতে করতে যেমন হাতের লেখা ভালো হয়, তেমনিভাবে এই পদ্ধতিতেও কারো আবৃত্তি হয়তো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই অর্থে যিনি ভালো আবৃত্তি করেন, তিনিও আবৃত্তির আঙ্গিক যে কোন্‌টা তা জানেন না।

পাশাপাশি অন্য শিল্পের আলোচনায় আসা যাক্‌। যখন কেউ সংগীতশিক্ষা করতে যান, তাঁকে প্রথমে চেনানো হয় তাঁর কণ্ঠের মৌলিক স্বরগুলি। তারপর সেই স্বরগুলিকে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজিয়ে এক স্বর থেকে অন্যস্বরে গমনাগমনের

রীতিপদ্ধতি। পরে সেই স্বরগুলিকে ক্রমে সহজ থেকে কঠিন তালবিন্যাসে বাঁধা হয়। শুনেছি, আগেকার দিনে বছরের পর বছর এই স্বর আর সরগম শিক্ষা চলতো যতক্ষণ শিক্ষার্থী প্রকৃতির বা পরিবেশের কোনো শব্দ শুনে সেই ধ্বনির স্বরগ্রাম ও স্বর সঠিকভাবে নির্ণয় না করতে পারেন। তারপর গুরু তাঁকে প্রথম গানটি শেখাতেন। এই অবস্থায় গুরু যখন গলায় গেয়ে গান শেখাবেন যাকে বলা হয়ে থাকে গুরুমুখী শিক্ষা, শিক্ষার্থী সেই সুর শুনে কণ্ঠে তুলে নেবেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি কোন্ কোন্ স্বর বলছেন, কোথায় কতটুকু মীড়-মোচড়, কোথায় অন্য কোন্ স্পর্শস্বর, সব কিছু তিনি নিজেই বুঝতেও পারবেন, বিশ্লেষণ করে দেখাতেও পারবেন তাঁর তুলে নেওয়া সুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কারণ তিনি জানেন, কোন্‌টা তাঁর গানের আঙ্গিক। সেইভাবেই তাঁর শিক্ষা।

অনুরূপভাবে, যিনি নাচ শেখেন, ছবি-আঁকা শেখেন, তাঁদেরও শিখে নিতে হয় আঙ্গিকের ব্যবহার। তারপর শিল্পসৃষ্টি। সেইসব আঙ্গিকের শিক্ষা বা শিক্ষার ধারার প্রচলনও একদিনে হয় নি। ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে সেই ভাণ্ডার। প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে আমরা খুঁজে নেবো আমাদের আবৃত্তির কলাকৌশল বা আঙ্গিক বলতে কী কী আছে?

একটা গানকে, মনে করুন, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখছি। তার সুরটি তালের ছকে বিভক্ত করা। সেই ছকটিকে ভাঙলে আমরা তালের চাল, বিভাগ, ঝোঁক ইত্যাদি বিবরণ পেতে পারি। সুরটির গতিবিধিকে অনুসরণ করলে আমরা দেখবো সেটা কতগুলো স্বরের সমষ্টি। স্বর থেকে স্বরে দাঁড়িয়ে বা গড়িয়ে উঠে-নেমে চলা। এই ভাবে ভেঙেই তো স্বরলিপির পদ্ধতি আমরা পেয়েছি। এছাড়াও এতে নানা রীতিবৈচিত্র্য রয়েছে। যত নমুনা, যত বিশ্লেষণ, ততই সম্পদগুলিকে চেনা যায়।

একজন অভিনেতার অভিনয়ের বিশ্লেষণ করছি। তাঁর দাঁড়ানোর বা অবস্থানের ভঙ্গি, প্রতিটি অঙ্গের সংস্থাপনা, মুখের ও চোখের অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ও রংবদল এরকম সব নিরীক্ষণ দিয়েই অভিনয়ের আঙ্গিক চেনা যায়। শিখে নেওয়া যায়।

সেইভাবে, একটা আবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারলেই আমরা পেতে পারি আবৃত্তি শিল্পের আঙ্গিক বা কলাকৌশলগুলি।

আবৃত্তিতে স্বরের উত্থানপতন থাকে। কিন্তু সে সবই যে সোজা উঠে যায় আর নেমে আসে এমন তো নয়। তারও নানা ধরন থাকে। তার কোন্‌টা

নিছক ডিজাইন আর কোন্‌টা কোন্‌ কোন্‌ ভাব বা অনুভবের সঙ্গে জড়িত, খুঁজে দেখা যায়।

স্বরের নানা ধরনের সঙ্গে আবৃত্তিতে শব্দের উচ্চারণও থাকে। সে কি কেবল যে শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে তার বর্ণগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ না কি বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণে তারতম্য ঘটে? কী সেই তারতম্য? ঝোঁক বা চাপের? না কি সেই সব শব্দের উচ্চারণেও স্বরের কিছু কারুকাজ এসে পড়ে?

ছন্দের একটা দোলা থাকে আবৃত্তিতে অনেক সময়। কখনো স্বর আর ছন্দের সেই দোলায় সংগীতের মতো মূর্ছনা আসে। আবার কখনো কাটা কাটা কথার ভেতরেও ওরকম একটা চাল থেকে যায়। কখনো কি ঐ ছন্দের চাল বা দোলা দিয়ে কোনো দৃশ্য বা অনুভব গড়ে তোলা হয়? আবৃত্তিতে যে দোলা তা কতটা কবির ইঙ্গিতানুসারী, কতটা আবৃত্তি-শিল্পীর দ্বারা আরোপিত? কবিতার ছন্দকে গলায় কত বিবিধ রকমে রূপ দেওয়া যায়?

যে কথাটা বলা হ'ল আবৃত্তির মাধ্যমে, তার অভিব্যক্তিটা কিসের? দুঃখের, আনন্দের, উল্লাসের, ব্যঙ্গের না নিছক বর্ণনার? না কি কোনো মিশ্র অভিব্যক্তি?

এ তাবৎ প্রচলিত সু-আবৃত্তির নানা নমুনা থেকে আঙ্গিকের যে কয়টি উপাদান পাওয়া যায়, তারই চর্চা ও প্রয়োগের বিবিধ আলোচনা আমাদের লক্ষ্য।

এই কয়টি উপাদান হ'ল স্বর, উচ্চারণ, ছন্দ ও অভিব্যক্তি। এই চার উপাদানের বিবিধ বিন্যাসে কেমন করে আবৃত্তির শ্রুতিগত চেহারাটা গড়ে ওঠে, সেই সচেতন চর্চার মাধ্যমে পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের মর্মোদ্ধার ও সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করা যেতে পারে।

আবৃত্তিতে কণ্ঠসাধনা

আবৃত্তির আঙ্গিক বলতে যা কিছুই আমরা বুঝি না কেন, তার সবই কণ্ঠস্বরাশ্রয়ী। সংগীতও তাই। কিন্তু সংগীতে শিক্ষা ও পরিবেশনকালে কণ্ঠস্বরকে সহায়তা করার জন্য নানা যন্ত্রের চল্ হয়েছে। আবৃত্তিতে তেমন সাহায্য পাবার উপায় নেই। আবৃত্তিচর্চাকারীকে তাই নিজ কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণ গঠন ও প্রকৃতি এবং তার নানা রূপান্তর নিজ বাক্‌যন্ত্রের কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে বুঝে নিতে হয়। আবৃত্তি শিক্ষার এটাই অনিবার্য প্রথম ধাপ।

আমরা জীবনধারণের কারণে যে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করি সেই প্রক্রিয়ারই একটা অতিরিক্ত প্রাপ্য হিসেবে আমরা স্বর বা বাক্-উৎপাদনের ক্ষমতা পেয়ে গেছি। পরিমণ্ডল থেকে যে বায়ু আমরা নাক ও মুখ দিয়ে গ্রহণ করি তা আমাদের ফুসফুসে হাজির হয়। সেখান থেকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় ওই বায়ুর অক্সিজেন রক্তবাহিত হয়ে শরীরে প্রবেশ করে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্য গ্যাস ওই ফুসফুসেরই মাধ্যমে ঠেলে বাইরে পাঠানো হয়। তাই-ই আমাদের নিশ্বাস।

আমাদের ফুসফুস অনেকটা স্পঞ্জের মতন। শংকু (Cone) আকৃতির সংকোচন ও প্রসারণযোগ্য একটা পাম্পস্বরূপ। ফুসফুস সংযুক্ত থাকে আরেকটি ফাঁপা থলির (কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো ও অনিয়মিত আকৃতির) সঙ্গে, যাকে বলা হয় ব্রংকাই। ব্রংকাই এসে মিশেছে একটি লম্বা নলের সঙ্গে। এই নলটিকে বলে ট্রাকিয়া বা উইণ্ডপাইপ। উইণ্ডপাইপের শেষাংশ একটি ফ্লানেলের আকারের। এই অংশটিকে বলা হয় গলবিল্ (Larynx)। Larynx-কে স্বরযন্ত্রও বলা হয়। ট্রাকিয়ার শেষ অংশ ও ল্যারিংসের প্রথমাংশের কিছুটা জুড়ে থাকে Vocal Fold, যার অন্তর্গত দুটি পাতলা পর্দা। ওই পর্দা দুটিকে বলে Vocal Cords (স্বরতন্ত্রীদ্বয়)। সংলগ্ন মাংসপেশীর সাহায্যে এই পর্দাদুটির মাধ্যমে নিশ্বাসবায়ুর পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়। পর্দা দুটি পরস্পরের দিকে এগিয়ে এলে ওই পথ, যাকে Glottis বলে, তার

আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ১ম ও ৪র্থ ছবি মিলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। স্বরযন্ত্র যেখানে মুখগহ্বরে মিশেছে, সেখানে ঠিক স্বরযন্ত্রের পথটির পাশাপাশি রয়েছে আর একটি পথ, যা খাদ্যনালী। ল্যারিংসের কিছু ওপরে আছে অধিনালিকা (epiglottis), যা শ্বাসনালী বা স্বরযন্ত্রের দিকে ঢাকনা হিসেবে কাজ করে। খাদ্যগ্রহণকালে একে বন্ধ রাখে। খাদ্যনালী বরাবর মুখগহ্বরেরর ভেতর দিকে উঠে গেলে, নাসিকাগহ্বরে যাওয়ার একটা পথ পাওয়া যায়। একটা গর্ত। সেই গর্তটিকে পেরিয়ে মুখগহ্বরের সামনের দিকে এগোলে প্রথমেই পাওয়া যায় কোমল তালু (soft palate বা velum palatti)। এই নরম অংশটি উঠে-নেমে নাসিকাগহ্বরের পথ খোলা বা বন্ধ রাখতে পারে। তার ফলে, প্রয়োজনমতো আমরা নাসিকা-গহ্বর ব্যবহার করতে বা না-করতে পারি। কোমল তালুর সামনের অংশ কঠিন তালু (hard palate)। একে মূর্ধাও বলে। এ-টি গিয়ে মিশেছে ওপরের সারির দন্তমূল (alveolum বা teeth-ridge)-এ, তারপর দন্ত, তারপর ওষ্ঠ।

অধিনালিকার যেখানে শেষ, জিহ্বা (tongue)-র সেখানে শুরু।

জিহ্বার অপর প্রান্ত ছুঁতে পারে নীচের সারির দন্তমূল। তারপর অধর।

খাদ্যনালীর দিকে নেমে গেছে যে পথ, স্বরযন্ত্রের পেছন দিকে যার অবস্থান, ওই অংশ থেকে কোমলতালুর মুখ পর্যন্ত সমস্ত অংশটাকে বলা হয় ফ্যারিংস (pharynx)। নাসিকাগহ্বরে ঢোকার পথটির প্রথমাংশ পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে pharynx। অনুনাদ সৃষ্টির কাজে এই ফ্যারিংস এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে ট্রাকিয়া, ব্রংকাই, লাংস ও নাসিকাগহ্বর বা মুখগহ্বরের সামনের অংশও কাজে অংশ নেয়। ১ম ছবিতে এই সমস্ত বর্ণনাগুলো মিলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হবে। সমস্ত স্বারোৎপাদন ব্যবস্থা বুঝতে সব ক'টি ছবিই অনুসরণ করা দরকার।

নির্গমনমুখী শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে আসে ব্রংকাই-তে। তারপর ট্রাকিয়া পার হয়ে যখন ল্যারিংস-এর মধ্যে প্রবেশ করে, সে সময় স্বরতন্ত্রী দুটি যদি এগিয়ে এসে পথের (Glottis) আকার পরিবর্তন ক'রে পথরোধের চেষ্টা না করে, তবে সে বাতাস নাক বা মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়, কোনোরকম স্বরোৎপাদন হয় না। যদি স্বরতন্ত্রী পথ অবরোধ করে, তবে নিশ্বাসবায়ুর ধাক্কায়, স্বরতন্ত্রী কাঁপতে থাকে। এই কম্পনের ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাই

আমাদের কণ্ঠস্বর। কিন্তু স্বরতন্ত্রীর কম্পন থেকে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা নিতান্তই স্বল্প। এই ধ্বনি ফুসফুস্, ব্রংকাই, ট্রাকিয়া, ফ্যারিংস, মুখগহ্বর, নাসিকাগহ্বরের ফাঁকা স্থানে অনুরণনের (Resonance) মাধ্যমে পরিবর্ধিত হয়। তবেই আমরা স্পষ্টতর কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই।

এই অনুরণন ব্যাপারটা কিন্তু প্রতিধ্বনি (echo) নয়। প্রতিধ্বনি হয় প্রতিফলন (Reflection) থেকে। সেখানে একটা ধ্বনিই ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে মূল ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে ধ্বনিভর বৃদ্ধি পেলেও, ধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কোলাহলে পরিণত হয়ে যায়।

অনুরণন বোঝাবার জন্যে আমাদের সকলেরই জানা পদার্থবিদ্যার একটি পরীক্ষার (experiment) কথা বলবো। ঘোড়ার নালের আকৃতির একটা লোহা, যার একটা হাতলও আছে (স্বরশলাকা বলে), তাকে একটা রবারের মুগুর দিয়ে আঘাত করলে সেটা আমাদের হাতের মধ্যে কাঁপে। কাঁপতে থাকে, টের পাই, কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পাই না।

এবার একটা চওড়া দুমুখ খোলা কাঁচের নলের শেষ প্রান্তে একটা দীর্ঘ রবারের নল যুক্ত করা হ'ল। কাঁচের নলটি একটি স্ট্যাণ্ডে ক্ল্যাম্প দিয়ে যুক্ত করে তার মধ্যে জল ঢালা হ'ল। জল রবারের নল পর্যন্ত চলে গেল। এখন ওই রবারের নলটিকে যদি ওঠাই বা নামাই দেখা যাবে কাঁচের নলে জলের লেভেল্ বাড়ছে কমছে। কাঁচের নলের যেখান থেকে জল শুরু, তার ঊর্ধ্বাংশে খোলা মুখের প্রান্ত পর্যন্ত রয়েছে বাতাস। যেই রবারের নলটি উপরের দিকে তুলে কাঁচের নলে জলের লেভেল্ নামিয়ে দিচ্ছি, ওই বাতাসের মোট আয়তন যাচ্ছে বেড়ে। আবার রবারের নলটি নীচে নামালে, জলের লেভেল্ উঠছে, বাতাসের আয়তন কমছে। এবার ওই লোহার স্বরশলাকাটিকে কম্পমান অবস্থায় কাঁচের পাইপের মুখে ধরা হ'ল। কিন্তু কোনো শব্দ শোনা গেল না।

রবারের পাইপটি উঠিয়ে নামিয়ে কাঁচের নলে বাতাসের আয়তন কমাতে বাড়াতে থাকলে একসময় পয়সা পড়ার মত 'খং' করে একটা ধ্বনি শোনা যাবে। এই ধ্বনিটি শোনা গেল, কম্পমান স্বরশলাকার থেকে উদ্গত ধ্বনির অনুনাদ (Resonance) এর কারণে। স্বরশলাকা যে হারে (কম্পাঙ্কে) কাঁপছে, তার সংলগ্ন কাঁচের নলের বাতাস যখন সেই হারে কাঁপতে পারলো, তখনই এটা সৃষ্টি হ'ল। কাঁচের নলে বাতাসের আয়তন যখন এমন একটা অবস্থায় এলো
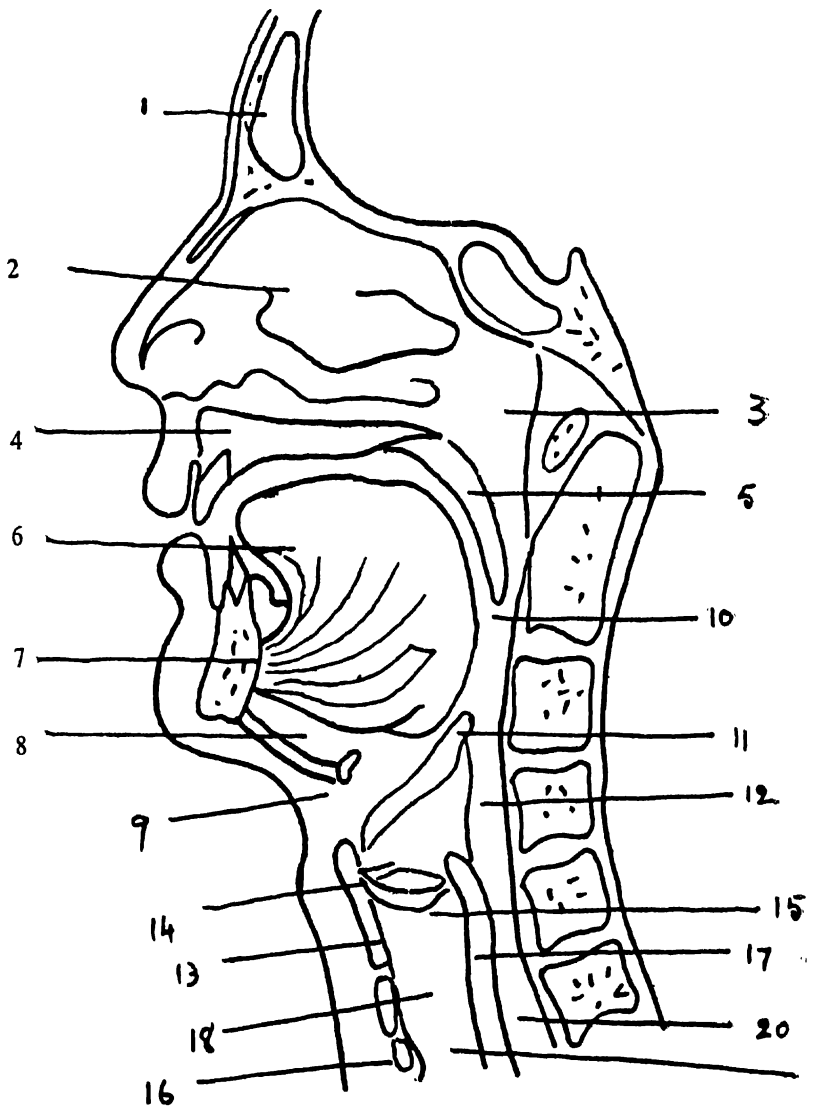
1. Frontal Sinus 2. Nasal Cavity 3. Nasal Pharynx 4. Hard Palate 5. Soft Palate 6. Tongue 7. Genioglossus muscle 8. Geniohyoid muscle 9. Hyoid Bone 10 Oral Pharynx 11. Epiglottis 12. Laryngeal Pharynx 13. Thyroid Cartilage 14. Ventricular Fold 14. Ventricular Fold (Larynx) 15. Vocal Fold (Larynx) 16. Cricoid 17. Cricoid Cartilage 18. Larynx Cavity 19. Trachea 20. Oesophagus 21. Lips 22. Alveolum or Teeth ridge
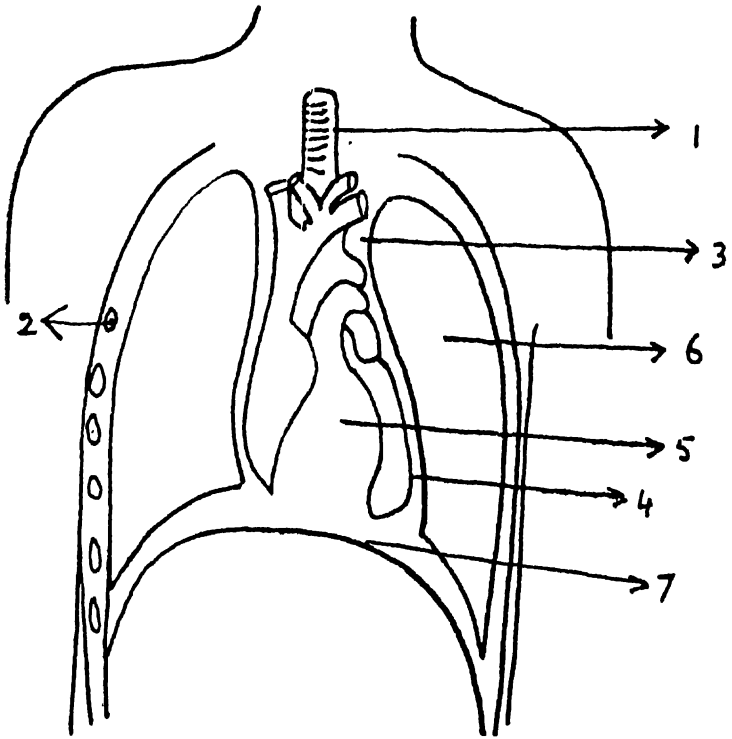
1. Trachea 2. Section of ribs 3. Outline of Plura 4. Outline of pericardiam 5. Heart 6. Lungs 7. Diaphragm
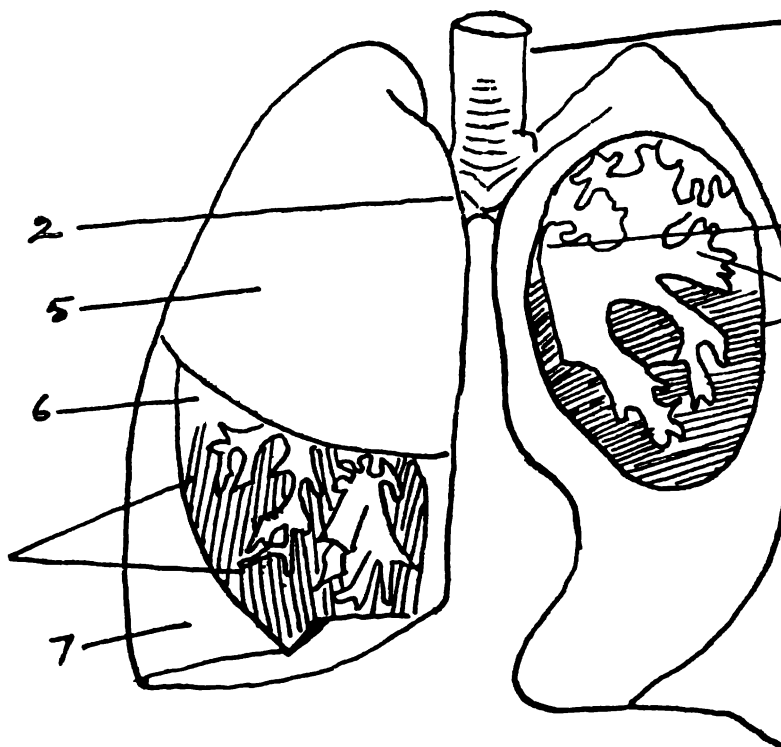
1. Trachea 2. Right Bronchus 3. Left Bronchus 4, Bro
5, Upper lobe 6. Middle lobe 7. Lower lobe
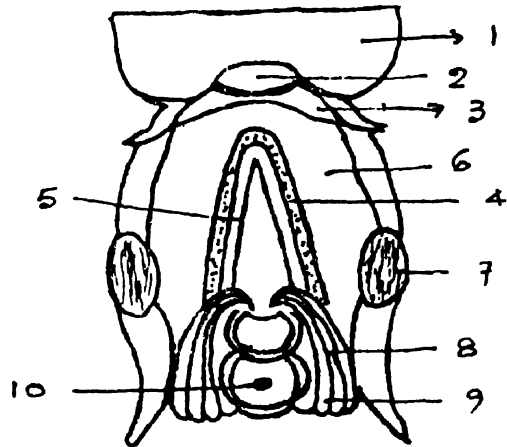
1	Root of tongue	2.	Cushion of Epiglottis
3,	Epiglottis	4,	False vocal Cord
5.	Vocal Cord	6.	Voice muscles
7.	Thyroid Cartilage	8.	Arytenoid Cartilage
9,	Voice muscles	10.	Cricoid Cartilage

যে স্বরশলাকার কম্পনজনিত ধাক্কায় তা স্বরশলাকার কম্পাঙ্কে কাঁপতে থাকলো, তখনই অনুনাদিত ধ্বনি আমরা শুনতে পেলাম।

আমাদের বাক্‌যন্ত্রে অনুনাদের ক্রিয়া অনেকটা এই পদ্ধতিতেই ঘটে। ট্রাকিয়া, ব্রংকাই, ফুসফুস্‌, মুখগহ্বর, নাসিকাগহ্বর প্রভৃতি ফাঁপা স্থানে যে বায়ু জমে আছে, তার কোনো কোনো অংশ অনুনাদের জন্য বন্ধ বা খোলা রাখার কাজ আমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সংশ্লিষ্ট পেশীগুলির সাহায্যে করা সম্ভব। আমাদের স্বরতন্ত্রীটির ওপর শ্বাসের চাপ পড়লে সেটি কাঁপে। যখন তার হার স্বল্প হয়, তখন ভারী ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই ধ্বনি উৎপন্ন করার জন্য সমগ্র স্বরতন্ত্রীটিকেই কাঁপতে দিতে হয়। অনুনাদের জন্য আমাদের গহ্বরগুলির পরিসর যেমন আমরা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তেমনিভাবেই, স্বরতন্ত্রীর কম্পনের হারও আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। স্বরতন্ত্রীর কম্পনের হার যতই বাড়তে থাকে, ততই ধ্বনি হাল্কা কিন্তু তীক্ষ্ণতর হয়। এবং ক্রমেই স্বরতন্ত্রীর ভেতরের অংশের কম্পন বন্ধ হয়ে কেবল প্রান্তটি কাঁপতে থাকে। এই কম্পনের হারের সঙ্গে সাজুয্য রেখে অনুনাদের জন্য গহ্বরগুলি ব্যবহার করতে হয়। তবেই বৈজ্ঞানিকভাবে স্পষ্টতর কণ্ঠধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেরূপ স্পষ্টতর ধ্বনির জন্য গলায় কোনো বাড়তি চাপ দেওয়ার দরকার করে না।

স্বরোৎপাদনের এই পদ্ধতিটি ঠিকমত উপলব্ধি করে নিতে পারলে যে কোনো আবৃত্তিকার নিজের প্রকৃত কণ্ঠস্বর, কণ্ঠস্বরের পরিধি ও ক্ষমতা নিজের কানে শুনেই চিনতে শিখবেন।

স্বরোৎপাদনের এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? যাঁর কণ্ঠস্বর এমনিতেই সুখশ্রাব্য ও সক্ষম, তাঁরও কি এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে?

স্বরোৎপাদনের শিক্ষার দুটি উপযোগিতা। একটি শরীরগত (Biological), অন্যটি শিল্পগত (Aesthetic)।

সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরোৎপাদন করতে শিখলে, উৎপাদনকারী অঙ্গগুলির যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের ওপর বাড়তি বা অন্যায় কোনো চাপ তো পড়েই না, বরং নিয়মিত অনুশীলনে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকের নিজ নিজ শারীরিক সীমার উপলব্ধি ঘটলে, একটানা দীর্ঘসময় স্বরোৎপাদন ও স্বরের ব্যবহার করলেও তা সমান সজীব, সুস্পষ্ট ও অক্লান্ত থাকে।

নিজ বাক্‌যন্ত্র থেকে কত সুরের কত রং-এর স্বর উৎপাদন সম্ভব তা বিস্তারিত জানলে, আবৃত্তি করার সময় স্বরে নানা বৈচিত্র্য আনা যায় (অবশ্যই

বিষয়ের সঙ্গে সাজুয্য রেখে)। ফলে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় কখনো ক্লান্তি অনুভব করে না, আবৃত্তির সমগ্র সময়কাল জুড়ে শ্রোতার আগ্রহকে সজীব রাখা সম্ভব হয়। নিজ কণ্ঠস্বরের সমগ্র সীমার মধ্যে প্রত্যেকটি সূক্ষ্মতম স্বর থেকে স্বরে অনায়াস সঞ্চালন ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে তবেই, প্রকাশপিয়াসী যে কোনো চিন্তা বা অনুভব কণ্ঠে প্রকাশ করা সম্ভব।

আমাদের স্বরোৎপাদনের যে পদ্ধতি উপরে আলোচিত হয়েছে, তা নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়,

(১) শ্বাসবায়ুর নিয়ন্ত্রণ (Exitor)

(২) স্বরতন্ত্রীর ওপর তজ্জনিত চাপের সাহায্যে কম্পন সৃষ্টি (Vibrator)

(৩) কম্পনজাত ধ্বনি থেকে মুখগহ্বরে, ট্রাকিয়া-ব্রংকাই-ফুসফুস্ ও নাসিকাগহ্বরে অনুনাদ সৃষ্টি (Resonator)

(৪) অনুনাদিত স্বরকে যথাযথ মুখাকৃতি ও বাধাদানের ক্রিয়ায় পরিস্ফুটন ও উচ্চারণ (Articulator)

স্বরোৎপাদনের যোগ্য শিক্ষা মানে নানাভাবে এই চারটি ধাপেরই অনুশীলন।

আবৃত্তি-চর্চার সূত্রপাত হবে শ্বাসনিয়ন্ত্রণের অনুশীলন থেকে। যে শ্বাস আমরা ত্যাগ করছি, তাই আমাদের বাক্‌শক্তির উৎস। অর্থাৎ নিঃশ্বাস। কিন্তু নিঃশ্বাস নির্ভর করে প্রশ্বাসের ওপর। প্রশ্বাসই নিঃশ্বাসবায়ুর জোগানদার।

শ্বাসবায়ুর নিয়ন্ত্রণ

আমরা যখন স্বাভাবিকভাবে শুয়ে-বসে থাকি তখন প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস সমগতিতেই বক্ষপঞ্জরে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু সামান্যতম শ্রম করলে, শ্রমের প্রকার অনুযায়ী উভয়ই দ্রুত হয়। বাক্‌যন্ত্র ব্যবহারকালে প্রশ্বাসের তুলনায় নিঃশ্বাস দ্রুত হয়। অর্থাৎ যে পরিমাণে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করি তার চেয়ে দ্রুত তা ফুরিয়ে যায়। ভালো স্বরোৎপাদনের জন্য ঠিক এর বিপরীত অভ্যাস প্রয়োজন। যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন নিঃশ্বাসবায়ু এ কাজে অপরিহার্য, তাই 'দ্রুত শ্বাসগ্রহণ ও যথাসম্ভব ধীরে শ্বাসত্যাগ'—এই হল স্বরোৎপাদন ক্ষেত্রে শ্বাসনিয়ন্ত্রণের মূল সূত্র।

দ্রুত শ্বাসগ্রহণ—সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সময় ধারণ—ধীরে শ্বাসত্যাগ। এই নিয়ন্ত্রণটি শিখতে হলে প্রথমে শ্বাসগ্রহণের পদ্ধতিটি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া চাই। তবেই সেই শ্বাস বেশী সময় ধারণ করা যাবে। আমাদের শ্বাসগ্রহণ তিনটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

(১) কণ্ঠনালীয় (Clavicular): এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম শ্বাসগ্রহণ ও সবচেয়ে স্বল্পকাল শ্বাস ধরে রাখা সম্ভব। গলা ফুলিয়ে খুব ছোট করে এই শ্বাস নেওয়া হয়। স্বরোৎপাদনে এই পদ্ধতির শ্বাসগ্রহণ কোনো কাজে আসে না বললেই হয়।

(২) বক্ষপঞ্জরে শ্বাসগ্রহণ (Rib brea hing): সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বা সহজ আসনে বসে বগলের খাঁজ বরাবর, কোমরের কিছু ওপরে বুকের দিকে, পাঁজরের ওপরে হাতের চার আঙুল ও পিঠের দিকে বুড়ো আঙুল শিরদাঁড়ার দিকে নির্দেশ করে ক্ল্যাম্পের মতো রাখলে, শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি সঞ্চরণ অনুভব করা যাবে। একটি পার্শ্বসঞ্চরণ। মনে হবে যে ভেতরটা ফুলে উঠে বুড়ো আঙুলের দিক্ থেকে ক্রমশঃ ধরে থাকা সমস্ত হাতের তালুটা ভরিয়ে তুলছে। অপরটি ঊর্দ্ধসঞ্চরণ। সামনের দিকে রাখা চার-আঙুলে অনুভব করা যাবে পাঁজরগুলি যেন চার আঙুল বরাবর ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। এই ঊর্দ্ধসঞ্চরণ এর অর্থই হ'ল বক্ষপঞ্জরে শ্বাসগ্রহণ।

(৩) ডায়াফ্রামের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণ (Diaphragm bre thing): ওপরের বর্ণনায় যে পার্শ্বসঞ্চরণের অনুভব রয়েছে, সেটাই ডায়াফ্রামের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণের অনুভব। আমাদের বুকের খাঁচাটি বসানো আছে একটি পাতলা পর্দার (membrane) উপর। মাংসপেশীর সাহায্যে ওই পর্দাটি নামে বা ওঠে। ওই পর্দা নীচে নামলে পেটপুরে শ্বাস নেওয়া যায় এবং শ্বাসে পেটভর্তি হলে বুকের খাঁচাটি ওপরের দিকে উঠে যায়। খাঁচার ভিতরটিও শ্বাসপূর্ণ হয়।

পরিপূর্ণ শ্বাসগ্রহণ মানে, মূলতঃ, এই দুই পদ্ধতির মিলিত শ্বাসগ্রহণ। কিন্তু অভ্যাসের জন্য, জোরে শ্বাস নিতে বললে অনেকেই ডায়াফ্রামের সাহায্যে শ্বাস-গ্রহণের পর্য্যায়টি সুচারুভাবে সম্পন্ন না করেই বক্ষপঞ্জরে চট্‌জলদি শ্বাস টেনে নেন ও সেই শ্বাস প্রয়োগ করেই বাক্‌যন্ত্রের ব্যবহার করতে থাকেন। তার ফলে প্রশ্বাস বায়ুর জোগানে ঘাটতি পড়ে ও বারেবারে শ্বাস টানতে হয়, তাছাড়া শ্বাসের ঘাটতি মেটাতে স্বরের শেষাংশে বাক্‌যন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ দিয়ে স্বরোৎপাদন করা হয়। ফলে স্বরোৎপাদনও যথাযথ হয় না, বাক্‌যন্ত্রেরও ক্ষতি হয়।

শ্বাসগ্রহণের সময় যেমন প্রথমে পেটের দিক্‌টা ভর্তি হয় তারপর বুকের খাঁচাটি। শ্বাস ছাড়ার সময়েও প্রথমে বুকের খাঁচার শ্বাস জমা রেখে ডায়াফ্রাম

দ্বারা গৃহীত শ্বাস ছাড়া হয়। সেটা ফুরোলে বক্ষপঞ্জরের শ্বাস ছাড়া হয়। এটা অনুশীলনসাধ্য। স্বাভাবিক ক্রিয়ায় উভয় শ্বাসই বেরিয়ে যেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, বাক্‌যন্ত্রের অনুশীলনের সময় বক্ষপঞ্জরের শ্বাস সংরক্ষিত রাখতে পারার অভ্যাসই শ্বাসনিয়ন্ত্রণের মূল কথা। বক্ষপঞ্জরে সর্বদাই শ্বাস (অতিরিক্ত প্রয়োজন হিসেবে) সংরক্ষিত (stock বা reserve) থাকবে। সেই অবস্থাতেই ডায়াফ্রামের শ্বাসগ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্বাসের জোগান অব্যাহত থাকবে। তার ফলে বাক্‌যন্ত্র কখনোই শ্বাসহীন পেশীর চাপের অধীন হতে পারবে না। শ্বাসনিয়ন্ত্রণের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা অনুশীলন করা যায়। কয়েকটি উল্লেখ করা গেল।

(১) পূর্ববর্ণিত অবস্থায় পাঁজরের ওপর হাত রেখে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন। পার্শ্বসঞ্চরণ (ডায়াফ্রাম দ্বারা গৃহীত শ্বাসের জন্য) অনুভব করুন। কিছু সময় শ্বাস ধরে রাখুন। একই গতিতে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। কুড়ি বার অভ্যাস করুন।

(২) পাঁজরের সাহায্যে (rib breathing) শ্বাস নিন। শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটি কানের পাশ দিয়ে সোজা মাথার ওপরে তুলুন। কাঁধে ও গলায় যেন বেশী চাপ না পড়ে। ওই অবস্থায় জিভ বার করে অল্প অল্প হাঁফাতে থাকুন ও ডায়াফ্রামের গতিবিধি অনুভব করুন। পাঁচ-ছ'বার হাঁফানোর পর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটি নামিয়ে আনুন। পাঁচবার অভ্যাস করুন।

(৩) প্রথমে পাঁজরের সাহায্যে (ঊর্দ্ধসঞ্চরণ) কিছুটা শ্বাস নিন। তারপর ডায়াফ্রামের সাহায্যে (পার্শ্বসঞ্চরণ) আরও কিছুটা শ্বাস নিন। 'আ' স্বরের উচ্চারণ করতে করতে (অকম্পিতভাবে) ডায়াফ্রামের সাহায্যে গৃহীত শ্বাস ছেড়ে দিন। তারপর 'উ' স্বর উচ্চারণের সঙ্গে পাঁজরের শ্বাস ছেড়ে দিন। এই স্বরোচ্চারণ ও শ্বাস ছাড়ার সময়সীমা যত প্রলম্বিত করা যায়, ততই ভালো।

(৪) ৩ নং এর মতো করে শ্বাস নিন। ৫ সেকেণ্ড শ্বাস ধরে থাকুন। মনে মনে ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত গুণে মুখ দিয়ে সমানভাবে ধীর গতিতে কিছুটা শ্বাস ছাড়ুন। আবার ২ সেকেণ্ড থামুন। আবার ১০ গুণে কিছুটা শ্বাস ছাড়ুন। আবার থামুন। আবার একইভাবে কিছুটা শ্বাস ছাড়ুন। এইভাবে অন্তত চারবারে সমগ্র শ্বাস ছাড়তে হবে।

(৫) ৪ নং অনুশীলনে শ্বাস ছাড়ার সময়ে 'আ' স্বরটি একটি নির্দ্দিষ্ট পর্দায় ধরে রাখুন।

শ্বাসের অনুশীলনের ফলে স্বর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কতটুকু ফল পাওয়া গেল, তার পরীক্ষা হাতে-নাতে করে নিয়ে তবেই স্বরানুশীলনের পরবর্তী ধাপে আমরা যাবো।

(১) বন্ধ ঘরে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে তার শিখার ওপরে শ্বাসের সাহায্যে চাপ সৃষ্টি করে শিখাটিকে একইরকম ভাবে হেলিয়ে রাখতে হবে।

(২) একটি বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে একটি পর্দায় স্থির ও একটানা স্বর উৎপাদন করতে হবে।

(৩) 'আ' স্বর স্থির ও নিষ্কম্প্র ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্বরে কোনো বাড়তি জোর দেওয়া হবে না, কোনো ধাক্কা থাকবে না, ধ্বনি সমান ও একটানা হবে। আ এর পরে উ, ও, এ, অ্যা, ই ইত্যাদি সব স্বরেই অভ্যাস করা ভালো। স্বরের স্থায়িত্বকাল অন্তত ১৫ সেকেণ্ড হবে। একটানা স্থির ও নিষ্কম্প্র স্বরের যে অভ্যাস করা হল, সেই ক্রিয়া এখন কবিতার পংক্তি অবলম্বন করে করতে হবে।

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃতছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

(রবীন্দ্রনাথ)

'যখন' থেকে 'কায়ায়' পর্য্যন্ত একটি নির্দ্দিষ্ট পর্দায় সহজ সাবলীল প্রক্ষেপণে, কোনো অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে স্থির ও অকম্পিত স্বরে উচ্চারণ করতে হবে। পংক্তির শেষে যেন একটি রেশ থেকে যায়। যেন কোনো ফাঁকা ঘরে প্রতিধ্বনি শোনার অপেক্ষায় বিস্তার করে ছড়িয়ে উচ্চারণ করা হচ্ছে পংক্তিগুলি। অর্থাৎ এখানে কেবল কবিতার পংক্তিতে আশ্রিত শব্দগুলিই বলা হচ্ছে না, তার ফাঁকে ফাঁকে স্বর থেকে যাচ্ছে। ফলে গানের মতোই সমগ্র পংক্তিটি জুড়ে স্বরের একটা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ তৈরী হচ্ছে। লক্ষ্য রাখতে হবে,

নিজ কণ্ঠস্বর ও স্বরসীমার বোধ

(১) গলায় কোনো বাড়তি চাপ দেওয়া হবে না

(২) একটি পংক্তিতে ব্যবহৃত স্বর পরিবর্তন করা চলবে না। অর্থাৎ স্বরস্থান বা পর্দা বদলে যাবে না। দু তিনটি পংক্তি একই স্বরে বলবার পর, পরের পংক্তিতে, একঘেয়েমি কাটানোর জন্য স্বর বদলানো চলতে পারে।

(৩) চেষ্টা থাকবে কোনো বাড়তি চাপ ছাড়াই স্বর যেন আরো দূরগামী ও স্পষ্টতর হয়।

(৪) পংক্তির শেষে স্বর বুজে আসবে না। সমানভাবে, রেশ রেখে, পংক্তি শেষ হবে।

এইভাবে 'স্মরণ' কবিতাটি সবটাই স্মৃতি থেকে অভ্যাস করতে হবে। তারপর কবিতার কথাগুলো সরিয়ে, যে রকম সুরে পংক্তিগুলি উচ্চারণ করা হচ্ছিল, সেইভাবেই, ওই পংক্তির মাপ অনুযায়ী 'আ' স্বরে বলতে হবে। পংক্তি শেষের মতো থামতে হবে। আবার পরবর্তী পংক্তি অবলম্বনে 'আ' স্বরে বলতে হবে। এই ক্রিয়াটি এমন, যে স্বরের ওই প্রক্ষেপণ শুনেই বোঝা যাবে 'স্মরণ' কবিতাটি বলা হচ্ছে। এইভাবে গোটা কবিতাটাই অভ্যাস করতে হবে। এর ফলে নিজস্ব অনায়াস কণ্ঠস্বর নিজের কানেই শোনা যাবে। নিজ কণ্ঠের সাবলীল সৌন্দর্য্য ও ক্ষমতা অনুধাবন করার আনন্দকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করলে এই অনুশীলন ভালো লাগবে। নতুবা, একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। স্মৃতি থেকে অভ্যাস না হলে নিজশ্রুত স্বকণ্ঠ-স্বরের প্রতি মনোনিবেশ সম্ভব হবে না। এই কবিতাটি শেষ হলে রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ, শিবাজী উৎসব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মধুর চেয়েও আছে মধুর' প্রভৃতি কবিতা অবলম্বনে একই রকম অনুশীলন চালানো যায়।

এর পরবর্তী ধাপ হ'ল স্বরের তীব্রতা বৃদ্ধির অনুশীলন। আগের অনুশীলন ও বাক্‌যন্ত্রের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বুঝে নেবার সময় দেখা গেছে যে, স্বরতন্ত্রীর ওপর শ্বাসের চাপের নিয়ন্ত্রণেই স্বরের নিয়ন্ত্রণ। এখন, ঐ শ্বাসের চাপ যদি বাড়ানো যায়, তবে স্বরের জোর বাড়বে। ঐ চাপ কমিয়ে দিলেই স্বরের জোর কমে যাবে। সচেতন ভাবে, এই শ্বাসের চাপ বাড়িয়ে কমিয়ে স্বরের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাকেই স্বরের 'তীব্রতা'র নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। প্রথমেই 'আ' স্বর উচ্চারণ করে এই অভ্যাস করা হবে। এক্ষেত্রেও, লক্ষ্য রাখতে হবে,

স্বরের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি

(১) জোরে চেঁচিয়ে গলায় যেন চোট না আসে, ধীরে ধীরে স্বরতন্ত্রীর ওপর শ্বাসের চাপ বাড়িয়ে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত তীব্রতা বৃদ্ধি করতে হবে ও ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

(২) এই অভ্যাসকালে স্বরস্থান যেন পরিবর্তিত না হয়। শ্বাসের চাপ বাড়িয়ে তীব্রতা বৃদ্ধি করার সময় সাধারণতঃ স্বরের পর্দা চড়ে যাওয়ার প্রবণতা

থাকে ও হ্রাস করার সময়ে নেমে যাওয়ার। সেই বিভ্রাট এড়িয়ে অনুশীলন করতে হবে।

(:) পূর্ববর্তী ধাপের অনুশীলনে স্বরের স্থিরতা যদি না এসে থাকে, কম্পন রয়ে যায়, তবে এই অনুশীলন করে কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

একটি নির্দিষ্ট পর্দায় এই অভ্যাস হওয়ার পরে, স্বরস্থান বদল করে বিভিন্ন স্থানে এটির অভ্যাস করা উচিত। তারপর এই কৌশল কবিতার পংক্তির আবৃত্তি দিয়েও অভ্যাস করতে হবে।

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ড.ন পিঙ্গল জটাজাল
তপোক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

(রবীন্দ্রনাথ)

স্বর একটা নির্দিষ্ট পর্দায় থাকবে। কেবল তীব্রতা বাড়বে পংক্তি থেকে পংক্তিতে। শেষ পংক্তিতে সাধ্যের শেষ সীমায় পৌছনো হবে। দু'একবার অভ্যাস করার পর এই সাধ্যের পরিধি বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী পংক্তি থেকে পংক্তির স্বরবৃদ্ধির পরিমাপ ঠিক করে নিতে হবে। গলায় যেন কোনোক্রমেই কোনো চোট্ না আসে। গলা খুস্‌খুস্ করলেই তীব্রতার বৃদ্ধি সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেতে হবে। তখনকার মতো অনুশীলন বন্ধ রাখতে হবে।

কবিতার পরবর্তী stanza শুরু হবে সাধ্যমতো তীব্রতম স্বর দিয়ে। এবং ক্রমে স্বরকে একটি নির্দিষ্ট পর্দায় স্থির রেখে তীব্রতার হ্রাস করে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

এইভাবে গোটা 'বৈশাখ' কবিতায় একটি করে পদবন্ধে তীব্রতার বৃদ্ধি ও পরবর্তীতে হ্রাস অভ্যাস করতে হবে। প্রত্যেক বৃদ্ধি-পর্বের শুরুতে, একঘেয়েমি কাটানোর জন্য স্বরস্থান বদলে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একবার আবৃত্তি শুরু হলে, তীব্রতার হ্রাস শেষে পূর্ব্বাবস্থায় না ফেরা পর্য্যন্ত স্বরস্থান যেন একটুও না নড়ে। আবৃত্তি সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে হবে।

এরপর, আগের অনুশীলনের মতো, কবিতার কথা-কে সরিয়ে দিয়ে কেবল 'আ' স্বরে, গোটা কবিতাটা অভ্যাস করতে হবে। এবং এর পরবর্তী যে সব

রীতি আলোচিত হবে, প্রতি ক্ষেত্রেই স্মৃতি থেকে এই 'আ' স্বর লাগিয়ে অভ্যাস আবশ্যিক। এই অভ্যাসে,

(১) স্মৃতির অনুশীলন খুব ভালো হয়।

(২) স্বরের এই প্রকার রেওয়াজ, সংগীতের তান অভ্যাসের মতোই, কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করতে ও স্বরজ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে।

স্বরের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে আবৃত্তি কলার একটি কৌশল এইমাত্র শেখা গেল। কিন্তু অনুশীলনের সময় কবিতার অর্থ-নিরপেক্ষভাবে কাব্য-পংক্তিগুলিকে আশ্রয় করে কণ্ঠচালনা করা হয়েছে। এখন এই কৌশলের অর্থানুগ প্রয়োগের চেষ্টা করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' কবিতাটি নিয়ে বা নজরুলের 'ওড়াও ওড়াও লাল নিশান' কবিতাটি নিয়ে, এইভাবে কবিতার মানে অনুযায়ী স্বরের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করা যেতে পারে।

তীব্রতার পরের ধাপে শিক্ষণীয় তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি। এখানে আমরা বাক্‌যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালীকে ভিত্তি করব। প্রথমে, আমরা যে স্বাভাবিক গলায় কথা বলি, সেই স্তরে স্বরকে দাঁড় করিয়ে 'আ' স্বর উচ্চারণ করতে হবে। এই স্বর,

স্বরের তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি

(১) আমাদের স্বরতন্ত্রীর মাঝামাঝি ধরনের কম্পন থেকে উদ্ভূত।

(২) স্বর পরিবর্ধিত হচ্ছে, বা অনুনাদ সৃষ্টি হচ্ছে মুখগহ্বরের ফাঁপা অংশে। 'আ' স্বরটির প্রলম্বিত ক্ষেপণ করতে করতে এই দুটি তথ্য অনুভব করতে চেষ্টা করতে হবে।

মুখগহ্বর অঞ্চলে অনুনাদিত এই যে স্বর সৃষ্টি হল, তাকে লিপটাং (lip-tongue) জাত স্বর বা সংক্ষেপে লিপটাং-এর স্বর বলা হয়।

এরপর স্বরটিকে আরও হাল্কা বা পাতলা ও তীক্ষ্ণ করে তুলতে হবে। যেন একটা ঠেলা (force) দিয়ে নাকের দিকে তোলা হল। এইভাবে, ধাপে ধাপে স্বরটিকে ক্রমশ পাতলা ও তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করলে ও ওপরের দিকে ঠেলে তুলতে থাকলে, এক সময় অনুভব করা যাবে,

(১) স্বরতন্ত্রীর দ্রুততর কম্পন থেকে স্বরটির উৎপত্তি,

(২) স্বরের পরিবর্ধনের জন্য বা অনুনাদ সৃষ্টির জন্য মুখগহ্বর ছাড়াও, নাসিকাগহ্বরটিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাসিকাগহ্বর সহযোগে অনুনাদিত এই যে স্বর সৃষ্টি হ'ল, তাকে ন্যাজাল্ (nasal) স্বর বলা হয়।

এইভাবে স্বরটিকে আরও ওপরের দিকে ঠেলে তোলার চেষ্টা করতে থাকলে, ক্রমশঃ নাসিকাগহ্বরের অধিকতর ব্যবহার অনুভবে আসবে এবং এক সময় স্বর-প্রয়োগজনিত মৃদু ধাক্কা মস্তিষ্ক ছুঁয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। এই যে-স্বর অনুনাদ সৃষ্টির সময়ে মস্তিষ্ক ছুঁয়ে যাওয়ার অনুভব দেয়, এটাই অনুশীলনকারীর স্বরসীমার তীক্ষ্ণতম স্বর। এই স্বরকে হেড্ রেজিস্টার্ বলা হয়।

স্বরতন্ত্রীতে উদ্ভূত স্বর মুখগহ্বর, নাসিকাগহ্বর ইত্যাদিতে পরিবর্ধনের প্রক্রিয়াগুলি জানা হ'ল। কিন্তু আরও যে সব স্থানে অনুনাদ হয়, ট্রাকিয়া, ব্রংকাই, লাংস, সেগুলোর ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত করা হয়নি। এবার আমরা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে 'আ' উচ্চারণ করবো। মুখগহ্বরের অনুনাদজাত প্রথম যে স্বর আমরা উৎপাদন করেছিলাম, নাসিকাগহ্বরের দিকে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন একটা force দিয়ে ওপরের দিকে ঠেলে তোলা হচ্ছিল, এবার তেমনি force সরিয়ে নিয়ে নিয়ে তাকে নীচের দিকে নামার সুযোগ করে দিতে হবে। এইভাবে যে ভারী ও অপেক্ষাকৃত অ-তীক্ষ্ণ স্বর সৃষ্টি হবে, অনুভব করলে দেখা যাবে,

(১) এই স্বর স্বরতন্ত্রীর মন্থরতর কম্পন থেকে উদ্ভূত

(২) ট্রাকিয়া, ব্রংকাই ও লাংস-এ এই স্বর পরিবর্ধিত হচ্ছে।

force সরিয়ে সরিয়ে স্বরটিকে ক্রমশঃ আরো নামানোর চেষ্টা করলে এক-সময় মনে হবে স্বরপ্রয়োগজনিত মৃদু ধাক্কা diaphragm এর পর্দাটিতে লাগছে। এই জন্য এই স্বরকে বলা হয় 'নাভি থেকে বলা' (abdominal) স্বর।

এইভাবে, আমাদের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি আমরা চারটি স্তরে করে থাকি। অ্যাবডোমেন্, লিপটাং, ন্যাজাল্ ও হেড্ রেজিস্টার্। অনেকে এই ভাগকে চেষ্ট্ (chest) রেজিষ্টার্, মিড্ রেজিষ্টার্ ও হেড্ রেজিষ্টার্ নাম দিয়ে তিন ভাগ বলে ধরেন। কেউ আবার দুটি মাত্র ভাগে লোয়ার্ ও আপার্ রেজিষ্টারও বলে থাকেন।

আসলে, এই নিম্নতম স্বর থেকে তীক্ষ্ণতম স্বর (যা আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে) অসংখ্য ধাপে বা স্তরে বিভক্ত। মোটের ওপর তিনটে বা চারটে ভাগকে অনুভব করে প্রক্ষেপণ করতে পারলে তখন এই প্রতিটি ভাগের অন্তর্গত ছোট ছোট ধাপ বা স্তরগুলি আমাদের গলায় আনার চেষ্টা করতে হবে।

লিপটাং অঞ্চলের স্বর উৎপাদনে তিন-চারটি ধাপ খুঁজে পেতে কারোরই অসুবিধে হয় না। ন্যাজাল্ অংশের স্বরস্থাপনেও চার পাঁচটি স্তর অনেকেই সহজে

সনাক্ত করেন। কিন্তু সেই স্থানগুলিতে স্বরকে অনায়াসে দাঁড় করিয়ে রাখতে বা বিস্তার করতে সকলে পারেন না। যিনি একবার স্থান বা স্তরগুলিতে স্বরের পা রাখতে পারেন, তিনি নিয়মিত অভ্যাসে স্বরকে সেই সব স্তরে প্রলম্বিত করতেও পারবেন। কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে, ম্যাজালের স্বর যেন হাল্‌কা ও তীক্ষ্ণ হয়, একটা ভার যেন তার মধ্যে মিশে না থাকে।

এটা খুব সমস্যার ব্যাপার নয়। কিন্তু অ্যাবডোমেন্ অঞ্চলের স্বরোৎপাদন নিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়েন। লিপটাং এর নীচে গলা সহজে নামতে চায় না। ভারী বা গম্ভীর এক ধরণের স্বর যে-কেউ গলায় আনতে পারেন, কিন্তু সেটা তার পরবর্তী ধাপগুলোতে নামানো যায় না এবং ট্রাকিয়া ও ব্রংকাইতে অনুনাদের অনুভবও পাওয়া যায় না। তার কারণ, গলার স্বরতন্ত্রী ও সংলগ্ন পেশীগুলিকে ফুলিয়ে তাঁরা সেই গম্ভীর স্বর উৎপাদন করেন। এতে স্বরতন্ত্রীর যথার্থ নিম্নহারের কম্পন ঘটতে পায় না এবং স্বাভাবিকভাবেই, সেরকম কম্পনোদ্ভূত স্বরের অনুনাদস্থানও অনুনাদের জন্য উন্মুক্ত হয় না। অ্যাবডোমেনের স্বর উৎপাদনের সঠিক পদ্ধতি খুঁজে পাওয়ার জন্য দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

(১) লিপটাং-এ একটি স্তরে, ধরা যাক্, শেষ নিম্নস্তরটিতে প্রলম্বিত 'আ' স্বর সৃষ্টি করা হ'ল। টানা স্বর ধরে থাকতে থাকতে, শ্বাস যখন শেষ হয়ে আসবে স্বর স্বাভাবিকভাবেই ভেতরদিকে ঢুকে যেতে চাইবে। তখন তাকে অনুসরণ করে যে স্তরে আমরা পৌঁছতে পারি, সেই স্থানটি চিনে নিলেই, অ্যাবডোমেনের স্তরে পা রাখা সম্ভব হবে। তারপর নতুন করে দম নিয়ে সরাসরি ওই স্তরটি থেকে স্বরক্ষেপণ শুরু করে, তাকে প্রলম্বিত করতে হবে।

(২) ম্যাজাল্ অংশে একটি স্বর উৎপাদন করা হ'ল। সেখান থেকে তার পরবর্তী ধাপে নামা হ'ল। তারপর তার পরবর্তী ধাপ। প্রতিটি ধাপ নামার সময় ঠিক কীরকমভাবে force টা সরিয়ে নিলেই নীচের ধাপটিতে গলা আপনি গড়িয়ে আসছে, তা অনুভব করতে হবে। এই অনুভব করতে করতে লিপটাং পর্য্যন্ত পৌঁছনো গেল। তারপর আবার নতুন করে লিপটাং-এর নিম্নতম স্তর থেকে নামতে চেষ্টা করতে হবে। দু'একবার এইখানে এসে নিম্নগতি থমকে যাবে। তখন আবার ম্যাজাল্ থেকে লিপটাং অংশের অবরোহণ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে, অনুভবটি ধরে রেখে, আবার লিপটাং-এর নিম্নস্তর

থেকে নীচে নামতে চেষ্টা করতে হবে। এভাবে, এক সময় অ্যাবডোমেনেও তিন-চারটি স্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্তরগুলি খুঁজে পেলে প্রত্যেক স্তরে দাঁড়ানোর অভ্যাস করতে হবে। নিজ শ্বাসদৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ সময় জুড়ে এক একটি স্তরে দাঁড়াতে হবে।

স্বরের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে জানা হ'ল। এবার স্বরের আর একটি দিক জেনে নিতে হবে।

অ্যাবডোমেন, লিপটাং ও ন্যাজালের প্রতিটি স্তরেই এই অভ্যাস করতে হবে।

যে কোন একটি স্বরে দাঁড়াতে হবে। ধরা যাক্‌, লিপটাং-এর একটি স্বর। প্রথমে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে ক্ষেপণ শুরু করলে, স্বরের স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য কম থাকে। এখন, স্বরে কোনোরকম চাপ সৃষ্টি না করে, তীব্রতা বৃদ্ধি না করে, কেবল গভীর মনসংযোগে কল্পনা করতে হবে, যেন অনুনাদ কক্ষ বা গহ্বরটিকে আরও প্রসারিত করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে স্বর আরও স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন হয় ও বিস্তার লাভ করে। এইরকম মানসিক সংযোগসহ ওই স্বরটি, শ্বাসনিয়ন্ত্রণ ঠিক রেখে ক্ষেপণ করতে থাকলেই ক্রমে ক্রমে স্বরের অনুনাদ বৃদ্ধি পাবে। স্বর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হবে। ঘন হবে। প্রাথমিকভাবে এই অনুনাদবৃদ্ধির কৌশল খুবই অনুশীলনসাধ্য। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসে, আবৃত্তির প্রবাহের মধ্যেই চট্‌জলদি কোনো একটি পংক্তিতে, এমন-কি একটি শব্দেও অনুনাদবৃদ্ধির কাজ করা সম্ভব।

স্বরের অনুনাদ বৃদ্ধি

সাধারণতঃ, যদি কাউকে বলা হয় 'জোরে বলো'। সে চীৎকার করে থাকে। এই চীৎকার প্রক্রিয়াটির মধ্যে স্বরের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার বৃদ্ধি এলোমেলো ভাবে মিশে থাকে। এবং এইভাবে ক্রমাগত চীৎকার করতে থাকলে স্বরভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী—এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা বা দিনের পর দিন কণ্ঠ ব্যবহারে। এখন আমরা জেনে গেছি, 'জোরে বলা' বা কণ্ঠস্বরের হ্রাস-বৃদ্ধির তিন রকম প্রক্রিয়া। যথাক্রমে, তীব্রতার, তীক্ষ্ণতার ও অনুনাদের হ্রাস-বৃদ্ধি। আমাদের প্রকাশিতব্য বিষয় ও মনোভাব অনুযায়ী আমরা প্রক্রিয়াগুলির একক বা মিশ্রিত ব্যবহার করতে পারি। বলা বাহুল্য, সেই ব্যবহারের effectও ভিন্ন ভিন্ন।

আমি দুর্ব্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার

(নজরুল ইসলাম)

এই দুটি পংক্তিতে স্বরের যে বৃদ্ধির প্রয়োজন, তা তীব্রতার।

ভাঙ্‌রে হৃদয়, ভাঙ্‌রে বাঁধন
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ········

(রবীন্দ্রনাথ)

অংশটিতে স্বরের যে বৃদ্ধি দরকার, সে উদ্দেশ্যকে তৃপ্ত করতে তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই যথাযথ।

আবার,

কোথা তোরা আয় তরুণী পথিক ললনা
জনপদবধূ কিঙ্কিনীকলকলনা
মালতী মালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীল বসনা
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা········

(রবীন্দ্রনাথ)

এরকম পংক্তিতে যথার্থ ধ্বনি আদায় করে নেওয়ার জন্য তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির চাইতে অনুনাদের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই অধিক ফলপ্রসূ। কখনো বা তীক্ষ্ণতা বা স্তরের হ্রাস-বৃদ্ধিও এরই সঙ্গে জড়িত থাকে।

আমাদের স্বরসঞ্চালন সীমার (অ্যাবডোমেন্‌ থেকে হেড রেজিষ্টার পর্য্যন্ত) প্রতি স্তরে 'আ' স্বরে পূর্ণ অনুনাদসহ দাঁড়ানো অভ্যাস হলে, এবার প্রতিটি স্তরে 'আ' স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতার পংক্তি বলা অভ্যাস করতে হবে। যে কোনো কবিতার দুটি পংক্তি নিয়ে, সেই পংক্তি দুটিই প্রতি স্তরে একবার করে বলতে বলতে উচ্চসীমা পর্য্যন্ত ওঠা হবে। আবার ঠিক যে যে স্তর দিয়ে ওঠা হয়েছিল, সেই সেই স্তর দিয়ে নামাও হবে। প্রাথমিকভাবে তিনটি অংশে মোট বারো-চৌদ্দটি স্বরস্থান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

এখানে বলে নেওয়া ভালো, এই আলোচনায় যাকে আমরা স্বর, স্তর বা কখনো পর্দ্দা বলে উল্লেখ করছি, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাই, সুরের পর্দ্দা বা স্বর হিসেবে প্রচলিত। কিন্তু সঙ্গীতে যে সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি কোমল স্বর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, তার তুলনায় আমাদের এই 'স্তর' সংখ্যায় অনেক বেশী পাবো। কেন না, সাতটি স্বরের ও তাদের কোমল স্বরগুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য যে সব স্বর, অতিকোমল অণুকোমল ইত্যাদি আছে বা নানা শ্রুতি রয়েছে, তারও অনেকটাই আমাদের পদ্ধতিতে পরিক্রমা করতে পারছি।

সঙ্গীতে স্বরগ্রামের যে তিনটি বিভাগ আছে, উদারা, মুদারা, তারা, তার বিভিন্ন স্বর বা পর্দ্দাগুলির সঙ্গে আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক অনেকটা নিম্নরূপ :

উদারার পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ—অ্যাব্ডোমেন্ রীতির, মুদারার ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার—লিপ্টাং রীতির ও মুদারার মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ ও তারার ষড়জ ন্যাজাল্ রীতির ও তার পরবর্তী পর্দ্দাগুলি হেড রেজিস্টার্ রীতির স্বরক্ষেপণ সীমার অন্তর্গত। অবশ্য আবৃত্তির স্বরক্ষেপণ পদ্ধতি ও সঙ্গীতের স্বরক্ষেপণ পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। আবৃত্তির স্বরক্ষেপণ পদ্ধতি অনেক ঋজু। আবৃত্তিতে স্বরের আরোহণ অবরোহণে যুগ্মস্বর (chord) ধর্মিতা থাকে, সেটাই স্বাভাবিক প্রবণতা। সঙ্গীতে তা নয়। সুরের মূর্চ্ছনা নামক যে অতিরিক্ত প্রবাহ সঙ্গীতে থাকে, আবৃত্তিতে তা ততটা থাকে না। তবু আবৃত্তির কণ্ঠসাধনার জন্য এখানে বর্ণিত অনুশীলনের পাশাপাশি নিয়মিত সংগীতের তান ও সরগম অভ্যাস করলে তা স্বরজ্ঞান ও স্বরসঞ্চালন উভয়ক্ষেত্রেই সহায়ক হয়।

স্বরসঞ্চালনসীমার বিভিন্ন স্তরে পূর্ণঅনুনাদ সহ কবিতার পংক্তি উচ্চারণের অভ্যাস গড়ে ওঠার পর অ্যাব্ডোমেন্, লিপ্টাং ও ন্যাজাল্ অংশের জন্য স্বতন্ত্র কবিতা নির্ব্বাচন করে উপযুক্ত স্বরে বলবার অভ্যাস করলে ভাব ও স্বরের সাজুয্যের প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠতে পারবে। নীচে সেরকম তিনটি কবিতায় স্বরস্থান নির্দ্দেশ করা হ'ল।

প্রথমে নিম্নতম স্বর থেকে উর্দ্ধতন স্বর পর্য্যন্ত গোটা সঞ্চালনসীমা একটি scale দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। নিম্নতম স্বর A_1, উর্দ্ধতম স্বর H,

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	L_1	L_2	L_3	L_4	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	H
		অ্যাবডোমেন্				লিপটাং					ন্যাজাল্				হেড রেজিষ্টার্

কোনোরকম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই, কেবল বাক্‌যন্ত্রে স্বানিক অনুনাদের অনুভবের প্রতি মনোযোগ দিয়ে এই স্কেলের প্রতিটি স্বরে কথা বা কাব্যপংক্তি বলার অভ্যাস করে নিতে হবে। তারপর নীচের উদাহরণগুলি অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্দ্দেশিত স্বরসহ অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসের সময় যেন নিষ্প্রাণভাবে কবিতা বলে যাওয়া না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য থাকবে।

কথা কও, কথা কও

A_4.... ....

অনাদি অতীত অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও?

A_5.... ....

কথা কও, কথা কও।

A_4.. ....

যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগরতলে

A_5 ... .

কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে

অ্যাব্‌ডোমেনের স্বর

A_4.... ... .

সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর

A_3.... ....

কলকলভাষ নীরব তাহার

A_3... .. ..

তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন তারে তুমি কোথা লও?

A_2.... ....

হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও।

A_1.... ....

(অতীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে

L_2.... ....

গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে

L_1.... ....

স্থর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে

L_1 ....

ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় স্থরে

লিপ্‌টাং এর স্বর

L_2 .. ..

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ

L_2 ....

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া

L_3 ....

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ

L_4 .. ..

সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা

L_2 ....

(আবর্তন, রবীন্দ্রনাথ)

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

N_3 ....

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

স্বাভাবিক্‌ অংশের স্বর

N_4 ... . N_2 ....

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে

N_2 ....

আজকে যে যা বলে বলুক তোরে

N_2 ....

সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে

N_3 ....

পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা

N_4 ... .

আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা

N_5 ....

(সবুজের অভিযান, রবীন্দ্রনাথ)

প্রতি ক্ষেত্রে, (১) কবিতার বাকি অংশেও অর্থানুগ স্বরবিন্যাস করে নিয়ে অভ্যাস করতে হবে।

(২) পূর্ব্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে কবিতার কথা সরিয়ে 'আ' স্বরে পংক্তির মাপে মাপে অভ্যাস করতে হবে।

স্বরক্ষেপণ সীমার বিভিন্ন স্তরকে চেনা ও সর্ব্বত্র অনায়াসে কবিতার পংক্তি বলার অভ্যাস গড়ে উঠলে, এমন একটি কবিতা নির্ব্বাচন করা হবে, যাতে সব স্তরগুলি অর্থ ও আবেগের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হতে পারবে। তাহলে, স্বর থেকে স্বরে যাতায়াত করাটা যান্ত্রিকভাবে না করে সঠিক আবৃত্তির মতই করা যাবে। উপরে প্রদর্শিত স্বরগ্রাম অনুযায়ী 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতে বিন্যাস করে দেওয়া গেল। এই বিন্যাস অনুযায়ী যথাযথ ভাব ও আবেগসহ স্বরের উত্থানপতন করতে হবে।

আজি এ প্রভাতে রবির কর (A_5)
কেমনে পশিল প্রাণের পর (L_1)
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে (L_2)
প্রভাত পাখির গান। (L_2)
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ (N_1)
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ (L_1)
(ওরে) উথলি উঠিছে বারি (L_2)
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি (L_3)
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর (A_5)
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে (L_1)
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল (L_2)
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে (L_3)
স্থিরস্বরে সরল ওঠা-নামা
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় (L_4)
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় (L_4)
বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার। (L_4)
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, (A_4)
চারিদিকে তার বাঁধন কেন। (A_5)
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন, (L_1)
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন (L_2)
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া (L_3)
আঘাতের পরে আঘাত কর্। (L_4)

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ (N_1)
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ! (N_2)
উথলি যখন উঠেছে বাসনা (N_3)
জগতে তখন কিসের ডর! (N_4)

(রবীন্দ্রনাথ)

এখানে একটি কবিতায় আবেগ পরম্পরায় স্বর সাজানো হ'ল। বাকি অংশটি অর্থানুযায়ী স্বরবিন্যাস করে নিয়ে গোটা কবিতাটি অভ্যাস করতে হবে। এই পদ্ধতিটি হ'ল এক-এক পংক্তিতে স্বরকে একটি স্তরে দাঁড় করিয়ে রাখার এবং সিঁড়ি ওঠা-নামার মতো, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা-নামা করার। একে বলা যায় 'স্থির স্বরে সরল ওঠা-নামা'।

এই যে পদ্ধতি শেখা হ'ল, অনুরূপ স্বরবিন্যাসের আরও প্রয়োগ করে দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের অপমানিত, নজরুলের সাম্যবাদী, বা সুকান্তের দেশলাই কাঠি কবিতা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োগ অভ্যাসের জন্য একবারেই কোনো একটি বিন্যাস করে নিয়ে আবৃত্তি করতে থাকা উচিত নয়। বিন্যাসগুলির হেরফের করে নানারকমে পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষণ শেষে যে বিন্যাস উৎকৃষ্টতর মনে হবে, সে রকম বিন্যাস স্থির করে আবেগসহ বারবার আবৃত্তি করা উচিত। তখন সে আবৃত্তি নানাজনকে শোনানোও চলবে।

স্বরের উত্থানপতনের একরকম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আবৃত্তি করতে গেলে সব সময় যে স্বর এরকম এক স্বর থেকে অন্যস্বরে লাফিয়ে বা ধাপে ধাপে উঠবে নামবে এমন তো নয়, সংগীতে যেমন পর্দা থেকে পর্দায় গমনাগমনের নানা পদ্ধতি আছে, আবৃত্তিতেও আছে। এ পর্য্যন্ত তার যতগুলি আবিষ্কার করতে পেরেছি, কেবল তারই বিবরণ দিতে চেষ্টা করবো। সংগীতে 'মীড়' বলে একটা কথা আছে। পরবর্তী পদ্ধতি বোঝানোর জন্য সেই কথাটি সংগীত শাস্ত্র থেকে ধার করা গেল। আমাদের শেখার বিষয় হচ্ছে, "আবৃত্তিতে মীড়ধর্মী স্বরে ওঠা-নামা"।

প্রথমে একটি স্তরে 'আ' স্বরটি উচ্চারণ করতে হবে। ধরা যাক, লিপটাং-এর একটি স্তরে (L_3) বলা হ'ল। এরপর, তার থেকে নীচের স্তরে L_2তে দাঁড়িয়ে বলা হ'ল। এবার L_3 থেকে L_2তে আসা হবে। আগের শেখা পদ্ধতি অনুযায়ী L_3কে ছেড়ে, স্বরটি কেটে নিয়ে L_2তে আসা হবে না।

হবে L_3 থেকে গড়িয়ে, একটু মোচড় দিয়ে। গানে যাকে মীড় বলা হয়, এ-ও তাই। কেবল নামটাই এক তাই নয়, রীতিটাও সমধর্মী।

এইভাবে L_3 থেকে উঁচু দিকে L_4-এ যাওয়া হবে। তারপর সমগ্র স্বর-ক্ষেপণ সীমার নানা স্তর থেকে স্তরে 'আ' স্বর সহযোগে এই গড়ানোটা কখনও পর পর স্তরে, কখনো দু' একটি স্তর ফাঁক (gap) দিয়ে ওঠা ও নামা অভ্যাস করতে হবে। তারপর, একটি কবিতায় বিন্যস্ত করে, স্বর থেকে স্বরে মীড়ধর্মী ওঠা-নামা আবেগ ও ভাবসহ অভ্যাস করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' কবিতাটি নেওয়া যাক।

হে বসন্ত, / হে সুন্দর / ধরণীর ধ্যানভরা ধন

মীড়ধর্মী স্বরে ওঠা-নামা

$L_2—L_1—A_5$ $L_1—A_5—A_4$ $L_3 \cdots L_2—L_1—A_5$

বৎসরের শেষে

L_4 ....

শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধর / ভুবনমোহন নববরবেশে

$L_4—L_3—$ $L_3—L_2—L_1—$ $L_1———A_5——A_4$

যেখানে, ...এই চিহ্ন আছে, যেমন, L_4 .. ...., সেখানে L_4 স্বরে স্থির থাকা বোঝাবে। যেখানে $L_2—L_1—A_5$ এরকম হাইফেন্ বা ড্যাস্ দিয়ে জোড়া আছে, তার দ্বারা L_2 থেকে L_1 হয়ে A_5 পর্য্যন্ত মীড় দিয়ে নামা বোঝাবে। এই মীড় দিয়ে নামা বা ওঠার সময় মধ্যবর্তী স্তরগুলিকে অনেক সময়ই ছুঁয়ে আসা হয়, তবে মধ্যবর্তী স্তরের প্রতিটি স্বরই সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ঠিকমত বুঝে নিয়ে ওপরের পংক্তি কয়টি আবৃত্তি করলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্দ্দেশিত আবৃত্তি থেকে এর স্বর প্রয়োগের পার্থক্যটি নিজের কানেই ধরা পড়বে। গড়িয়ে নামার জন্য 'বসন্ত'-এর আবৃত্তিতে সুরেলা পরিবেশ কিছু বেশী। যে কোনো গীতল রচনায় বা কোনো রচনা দিয়ে গীতল পরিবেশ সৃষ্টি করতে মীড়ধর্মী স্বরপ্রয়োগ খুব উপযোগী।

বসন্ত-এর আরও কিছু বিন্যাস এ রকম—

তারি লাগি তপস্বিনী / কী তপস্যা করে অনুক্ষণ

L_4 .... $N_1—N_2—N_1$ ....

আপনারে তপ্ত করে / ধৌত করে / ছাড়ে আভরণ

L_4 ... N_1-L_4 ... L_3 .... L_2 ....

ত্যাগের সর্ব্বস্ব দিয়ে / ফল অর্ঘ্য করে আহরণ

N_1— N_2—N_1— L_4—N_3—L_2 ·· ····

তোমার উদ্দেশে

L_1········ ······ .

অনুরূপ মীড়ধর্মী স্বরপ্রয়োগ নিজে নিজে অর্থানুগ বিন্যাসের পরীক্ষণসহ অভ্যাসের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'আমি চঞ্চল হে', সুকান্তের 'স্মারক' বা নজরুলের 'বর্ষা বিদায়' কবিতা ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমরা যে সব স্বর এ-পর্য্যন্ত গলায় আনছি, তার সবগুলিই স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ। গানের ভাষায় এই স্বরগুলিকে বলা হয়ে থাকে 'শুদ্ধ' স্বর। আমরাও একে শুদ্ধ স্বরই বলবো। কিন্তু এই মীড়ধর্মী স্বর অভ্যাসের সময় একটি স্বর থেকে অন্য একটি স্বরে যাবার মাঝে দু একটা অপেক্ষাকৃত ঝাপ্‌সা ও নরম স্বর উঁকি দিচ্ছে। ভালোভাবে কান পাতলে তা ধরা পড়বে। ওই স্বরগুলি এখন আমরা চিনতে চেষ্টা করবো।

ধরা যাক্, লিপটাং-এ একটি স্বর L_3 বলা হ'ল। তার পরবর্তী স্বর L_4-ও বলা হ'ল। L_3 ও L_4এর মাঝে, L_3 থেকে সামান্য উঠলে একটি নরম ও ঝাপ্‌সা স্বরের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, যা অপেক্ষাকৃত বেশী স্নিগ্ধ বা মিষ্ট। অনুরূপভাবে, L_4 থেকে একটু নামলে বা উঠলেও পাওয়া যাবে। প্রায় গায়ে গায়েই লেগে থাকে এই স্বর এবং অনেকটা L_3 বা L_4 এরই মতো অথচ রংটা যেন কিছুটা ফিকে। এই স্বরগুলিকে গানের ভাষায় কোমল বা বিকৃত স্বর বলা হয়। আমরাও 'কোমল' স্বরই বলবো। অ্যাব্‌ডোমেন্ থেকে হেড-রেজিষ্টার্ পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্তরে দুটি শুদ্ধ স্বরের মাঝের কোমল স্বরটি অল্প উঠে বা নেমে আবিষ্কার করে নিতে হবে। এই অভ্যাসের সময় কোমল স্বরগুলি ঠিকভাবে চিনে, আগে যেমন শুদ্ধ স্বরে অনুশীলন করা হয়েছিল, তেমনিভাবে প্রত্যেকটি কোমল স্বরে দাঁড়িয়েও কবিতার পংক্তি আবৃত্তি অভ্যাস করতে হবে। আরো ভালো হয়, একই কবিতার পংক্তি পাশাপাশি একবার শুদ্ধ একবার কোমল স্বরে অভ্যাস করতে পারলে। কোমল স্বরের অনুশীলনের জন্য নেওয়া গেল নজরুলের 'সর্বহারা' কবিতাটি। প্রথম পদবন্ধে ধ্বনিবিন্যাস এইরকম—(ইংরেজী ছোট অক্ষর দিয়ে কোমল স্বরগুলি বোঝাতে চেয়েছি)।

কোমল স্বরের প্রয়োগ

ব্যাথার সাঁতার পানি ঘেরা

চোরাবালির চর (l_1)

ওরে পাগল কে বেঁধেছিস্

সেই চরে তোর ঘর। (l_2)

শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা (n_1)

হাট তুলে দে সর্ব্বহারা (n_2)

মেঘজননীর অশ্রুধারা

ঝরছে মাথার পর (a_2)

দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি

দুলিয়ে তরু কর (n_1)

এই বিন্যাসে প্রথমে শুদ্ধ স্বর দিয়ে, তারপর অনুরূপ কোমল স্বর দিয়ে আবৃত্তি হবে। নিজের কানে এই দুই ধ্বনিবিন্যাসের পার্থক্য উপলব্ধি করতে হবে। কোনো রচনায় পেলব, উদাস, মধুর বা বিষণ্ণ অভিব্যক্তি আনতে কোমল স্বরের ব্যবহার খুবই উপযোগী। এছাড়া, স্বর থেকে স্বরে গড়িয়ে আসার সময় যে সাংগীতিক আবহ গড়ে ওঠে, তারও মধ্যে মিশে থাকে এই কোমল স্বরের যাদু। 'সর্ব্বহারা' কবিতা দিয়ে এই স্বরের ব্যবহার শেখার পর প্রয়োগের জন্য নজরুলের 'পউষ্' বা রবীন্দ্রনাথের বনবাণীর অন্তর্গত 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী' কবিতাটি ব্যবহার করা যায়।

স্তর থেকে স্তরে যাতায়াত করার আর একটি রীতি হ'ল কম্পন। প্রথমে যে কোনো একটি স্তরে দাঁড়িয়ে স্বরকে কাঁপাতে হবে। যাঁদের গলায় কম্পন আসে না তাঁরা প্রথমেই কম্পন না করে, স্বরকে একটা পর্দ্দায় স্থির রেখে, দ্রুত শ্বাসের চাপ কমিয়ে বাড়িয়ে দোলন সৃষ্টি করবেন। এই রকম দোলন হচ্ছে কম্পনেরই প্রসারিত চেহারা। দোলন আরো ছোটো জায়গার মধ্যে করতে পারলেই কম্পন চলে আসবে। গানে দ্রুত তান করলে যে জিনিসটা হয়, আবৃত্তির কম্পন অনেকটা তাই। ঐ তান যদি একই পর্দ্দায় অনেকবার করে স্বরক্ষেপণ দ্বারা হয়, সা-সা-সা, রে-রে-রে, গা-গা-গা, মা-মা-মা ইত্যাদি, তবে একেবারেই আবৃত্তির কম্পনের চেহারা এসে পড়ে। প্রতিটি স্বরে দাঁড়িয়ে কম্পন অভ্যাস করে নিতে হবে। তারপর কম্পনসহ স্বর থেকে স্বরে 'আ-আ'-করে যাতায়াত অভ্যাস করতে হবে। এই স্বরক্ষেপণ একেবারেই গানের তানের

মত শুনতে লাগবে। কম্পন সৃষ্টি করার সময় স্বরকে যথাসম্ভব চাপমুক্ত রাখতে হবে। হাল্‌কাভাবে গলা ফেল্‌লে তবেই কম্পন ঠিকমত লাগবে।

এই রীতির সুবিধা হচ্ছে এই যে, গলায় কোনো প্রবল চাপ না দিয়েও, আবেগের তীব্রতা বোঝানো যায়। কবিতা বলতে বলতে কম্পনসহ স্বর ওপরে তুললে, তার effect, সরল ওঠা-নামার তুলনায় অনেক বেশী এবং অল্প স্বর পরিবর্তনের ফলে, গলা অনেক বেশী উঠে গেল বলে মনে হয়।

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু উপত্যকা

A_4´ ....

সুমেরু আক্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে

L_1´ ... ...

বার বার নানা শতাব্দীর

L_3´ ....

কম্পনযুক্ত স্বর

আকাশ উঠেছে জ্বলে ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে

L_4´ ... ...

সেই সব সেনাদের চিনি আমি চিনি

N_1´ ... ...

সূর্য্য-সেনা তারা

N_2´ ... ...

রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।

N_1´ ...... L_4´ ...... L_3´ ...... L_2´ ...... L_1´ ......

(ফেরারী ফৌজ, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

স্বরস্থানের মাথায় accent চিহ্ন দিয়ে কম্পনযুক্ত স্বর বোঝাতে চেয়েছি। এইভাবে সমগ্র কবিতাটিতে বিন্যাস করে নিয়ে অভ্যাস করতে হবে। এই আবৃত্তির লয় খুব দ্রুত হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, দ্রুততাই উপজীব্য নয়, দ্রুততার সঙ্গে স্বরে কম্পন যেন ঠিক মত লাগে। দুইয়ের সংযোগ ঘটলে তবেই এ অনুশীলনী যথাযথ মাত্রা পাবে। পংক্তিবিন্যাস যেমন দেখানো আছে, তেমনিভাবে প্রত্যেক পংক্তির শেষে দম নিয়ে, প্রদর্শিত স্বরস্থানে কম্পন সহ শুরু করতে হবে। শেষ পংক্তিটিতে কম্পনসমেত গলা গড়িয়ে নামবে। এই প্রয়োগরীতি শেখা হলে, সুকান্তের 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ' কবিতায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আবেগের তীব্রতা বোঝাতে যেমন দ্রুতলয় ও উর্দ্ধগতির (rising) স্বরে কম্পন খুব ফলপ্রসূ, তেমনি আবেগের গভীরতা বোঝাতে মধ্য বা ঢিমে লয়ে অপেক্ষাকৃত গতিহীন একই পর্দায় স্থিত স্বরে কম্পন অত্যন্ত সহায়ক।

হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ওরে,
N_1 ……… N_2 — N_1 ……
হারিয়ে গেছে বোল্ বলা সেই বাঁশী
n_1' ……… ……. . … ……. ……..

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

প্রথম পংক্তি শুদ্ধ পর্দায়, মধ্যাংশে মীড় লাগিয়ে, পরবর্তী পংক্তি কোমল স্বরে কম্পনসহ বললে আবেগের গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদ-বেদনা বোঝাতে কান্না এনে নাটক করতে হয় না, স্বরের প্রক্ষেপণেই বেদনার আভাস ফুটে ওঠে।

শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন ?
L_1…. …. ….
মদিরাবিহীন মম চুম্বন ?
A_5 … …. ….
জীবনকুঞ্জে অভিসার নিশা আজি কি হয়েছে ভোর ?
A_4' …. …. … …. ….

(রবীন্দ্রনাথ)

আগের দুটি পংক্তিতে স্থির স্বরে দাঁড়িয়ে, যথাক্রমে L_1 ও A_5 দুটি স্বরে। তৃতীয় পংক্তিতে A_4-এ পৌঁছে সমগ্র পংক্তিটিই কম্পনযুক্ত স্বরে বললে আবেগ ঘনিয়ে আসে।

আর একধরণের স্বরপ্রয়োগের কথায় আসা যাক্। সংগীতে chord বলে একটা কথা চালু আছে। সেটি নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে দুটি স্বরের একত্র ব্যবহার নির্দ্দেশ করে। যেমন, ষড়জ-পঞ্চম, গান্ধার-নিষাদ। আবৃত্তিতে আমরা এপর্য্যন্ত যে বিভিন্ন স্বরের ব্যবহার আলোচনা করেছি তাতে অ্যাব্ডোমেন্, লিপ্টাং, ন্যাজাল ইত্যাদি স্তরে ওঠা-নামার নানা কৌশল বর্ণিত হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রেই স্বরগুলির পৃথক পৃথক প্রয়োগের ও তাদের সংযোগের ধরন বলা হয়েছে। অর্থাৎ যখন ন্যাজাল-এ স্বরপ্রয়োগ করছি, তখন অ্যাব্ডোমেন্ ও লিপ্টাং এর অনুনাদস্থলের কোনো প্রত্যক্ষ সাহায্য নিচ্ছি না। বিশেষতঃ অ্যাবডোমেনের অনুনাদস্থল

ট্রাকিয়া, ত্রংকাই এই সময় বন্ধ থাকছে। কিন্তু এই যুগ্মস্বর পদ্ধতিতে (chord system) যখন যে স্বরে দাঁড়ানো হয়, তার নিম্নবর্তী অপর একটি স্বরের অনুনাদস্থলও ব্যবহৃত হতে থাকে। লিপ্‌টাং-এ বলার সময় আব্‌ডোমেনের স্বরের অনুনাদস্থলও একই সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে। লিপ্‌টাং-এ বলার সময় অ্যাব্‌ডোমেনের আওয়াজটাও মিশে থাকে। ন্যাজালে বলার সময় লিপ্‌টাং-এর স্বর একই সঙ্গে বেরোতে থাকে। এমন কি অ্যাব্‌ডোমেনের কোনো অনুনাদ ন্যাজাল্‌কেও সমৃদ্ধ করে। এ যেন স্বরের সিঁড়িগুলি ওঠা-নামার সময়ে দু সিঁড়িতে পা রাখা এক-একটি ব্রিজ্‌ শট্‌। ফলে এই স্বরসঞ্চালনরীতি একটা গাম্ভীর্য্য আনে। একটা গম্‌গমে ভাব; যা মন্ত্রোচ্চারণের স্বরের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যর একটা কবিতা দিয়ে এই রীতির আবৃত্তি অভ্যাস করব।

যুগ্মস্বর পদ্ধতি

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
A_3 ....
দূর করে দাও তুমি সর্ব্বতুচ্ছভয়
(A_3+A_4) ... ...
লোকভয় রাজভয় মৃত্যুভয় আর
(A_4+L_1) ... ...
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণভার
(A_4+L_4) ... ...
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
(A_4+N_1) ... ... (A_4+N_2)
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
... ...(A_5+N_3)...
এই আত্মঅবমান, অন্তরে বাহিরে
... ... (L_1+N_3)...
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
... ...(L_1+N_4)...
সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারম্বার
... ...

মনুষ্যমর্য্যাদাগর্ব চিরপরিহার
$(L_1 \ + N_5)$ … … …
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
$(L_2 + N_6)$ … … … … …
চূর্ণ করি দূর করো /
$(N_6 + H)$… N_1… L_1…
মঙ্গল প্রভাতে, মস্তক তুলিতে দাও
A_5… A_4 … … …

বাকিটা A_4 স্বরেই হবে।

এই প্রয়োগের ধরন আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত জটিল মনে হলেও, আসলে খুব দুর্বোধ্য নয়। কারণ, সাধারণভাবে আবৃত্তির স্বরপ্রয়োগের ধরনই হ'ল একটা স্বরের ওপর ভর দিয়ে (যেন এক পা রেখে) পরবর্তী উচ্চতর ধাপে ওঠা। গানের সঙ্গে এখানেই তার একটা মূল প্রভেদ। এই যুগ্মস্বর পদ্ধতি আবৃত্তির সাধারণ লক্ষণেরই একটা বিশেষায়িত চেহারা।

'এ দুর্ভাগ্য……… মঙ্গলময়' অ্যাব্‌ডোমেনের A_3 স্বরে দাঁড়িয়ে হবে। 'দূর করে……তুচ্ছভয়' পর্য্যন্ত ওই স্বরটিকে ছুঁয়ে থেকে পরবর্তী স্বর A_4 লাগাতে হবে। ফলে A_4 এর অপেক্ষাকৃত হাল্কা স্বরের সঙ্গে A_3-র ভারী স্বর মিশে থেকে পংক্তিটি অনেকটাই গম্‌গমে শোনাবে। এখানে A_4 মূলস্বর, A_3 সাহায্যকারী স্বর। এইভাবে ক্রমশঃ দুটি স্বরে ক্ল্যাম্প করে উঠে যেতে থাকলে প্রদর্শিত স্বরগুলি অনুসরণ করা যাবে। সব শেষে, 'চূর্ণ করি' N_6, অর্থাৎ ন্যাজাল্‌-এর উচ্চতম স্বরকে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়ে H অর্থাৎ হেড-রেজিষ্টার ছুঁতে হবে। স্বরটি প্রয়োগের সময় মাথার তালুতে অনুনাদের অনুভব পাওয়া যাবে। যেন কিছুটা ছুঁড়ে দেওয়া, N_6 এর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। 'চূর্ণ' শব্দটির উচ্চারণে একটু জোর অর্থবশেই আসে, সেই সুযোগটা নেওয়া। তারপরে 'দূর' ও 'করো' শব্দে যেন forceটা সরিয়ে নেওয়ার পর হুদ্দাড় করে গড়িয়ে নেমে আসবে স্বরটি L_1 পর্য্যন্ত। তারপর থেমে, অ্যাব্‌ডোমেনের মাঝখান থেকে 'মঙ্গল প্রভাতে' ধরা হবে।

এরপর, উপরের বিন্যাসে যে যুগ্মস্বর $(A_3 + A_4)$, $(A_4 + L_1)$ ইত্যাদি আছে, সে স্থলে নিম্নতম স্বরটি বাদ দিয়ে শুধু উচ্চতর স্বরটি রেখে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করুন।

দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়

A_3 ....

লোকভয় রাজভয় মৃত্যুভয় আর

L_1 ....

এই ভাবে। তারপর আবার যুগ্মভাবে স্বরগুলি লাগাবার চেষ্টা করলেই, পার্থক্যটি কানে ধরা পড়বে। যাঁরা পার্থক্যটি আগেই ধরতে পেরেছেন, তাঁরাও এইভাবে অনুশীলন করলে প্রয়োগকৌশলের ফলে স্বরের এই রংবদল অনুভব করতে পারেন।

কোনো আবৃত্তিতে ভাবগম্ভীর পরিবেশ গড়ে তুলতে এই স্বরপ্রয়োগ খুব কাজে দেয়। প্রার্থনামূলক কবিতায় এর প্রয়োগ বেশী। আবার সব সময়েই নিম্নস্থ স্বরের একটি আবরণ (guard) থাকে বলে অনেকে এই সঞ্চালনকে উত্থান-পতনহীন বলে ভুল করেন। যাঁদের স্বর হাল্‌কা বা পাত্‌লা বলে মনে দুঃখু আছে—তাঁরা এই পদ্ধতিতে স্বরপ্রয়োগে কিছুটা আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই এই পদ্ধতির প্রয়োগ উচিত নয়, তাতে কণ্ঠস্বরের ক্ষতি হতে পারে। কারণ, এই প্রয়োগে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুনাদের জন্য স্বররজ্জুর নির্দ্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সঙ্গে অন্য অনুনাদের নির্দ্দিষ্ট কম্পাঙ্ক মিলে এক ভিন্নতর কম্পাঙ্কে রজ্জুটি নিয়ন্ত্রিত হয়, যা সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহের ওপর স্বাভাবিকভাবেই কিছু বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। অবশ্য অধিক অনুশীলনে কিছুটা সহজ হয়ে ওঠে সব কাজই, তবু সতর্ক থাকাই সমীচীন। নৈবেদ্যর ওই কবিতাটি দিয়ে পদ্ধতিটি শেখা হলে পর নজরুলের 'হে সর্ব্বশক্তিমান' বা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির 'অন্তর মম বিকশিত করো' প্রভৃতি কবিতায় রীতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অপর একটি রীতি হল আবর্তিত স্বরের প্রয়োগ। এই পদ্ধতি অনুশীলনের পক্ষে যেমন একান্ত জরুরী, আবৃত্তিতে রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে অভাবনীয় এর উপযোগ। এই পদ্ধতিতে একটি নির্দ্দিষ্ট অনুনাদস্থানের ওপর তীব্রতা (volume) কমিয়ে বাড়িয়ে যে ধ্বনিসৃষ্টি হয়, তাকে অনেকেই হয়তো প্রথম শ্রবণে আবৃত্তি বলে মানতে গররাজী হবেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত অনুনাদ স্থলগুলির ওপর নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ধাক্কা লাগার ফলে, সেই অনুনাদ-দেওয়াল ও স্বররজ্জুর ওই নির্দ্দিষ্ট কম্পাঙ্কের পৌনপুনিক ব্যায়াম স্বরকে

পরিষ্কার করে। দৃঢ় করে তোলে। আবার কল্পনাশক্তির যোগ্য উন্মোচনে এই রীতিই যখন দৃশ্য বা অনুভব রচনা করে, তখন অতি বড় তার্কিকও সেই আবৃত্তির প্রশংসা করেন।

ব্যাঙের আওয়াজটা ভাবুন। একটি বড় ব্যাঙে যে মোটা ভারী আওয়াজ হয়, সেটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘুরে ঘুরে আসে। বাকি সময় সমস্ত ধ্বনিতরঙ্গ যেন অপেক্ষাকৃত মিইয়ে থাকে। কিন্তু সেটিই হচ্ছে সমান্তরাল ধ্বনিতরঙ্গ। তার ওপর যেন বড় ব্যাঙের শব্দটি একটু করে ঢেউয়ের ধাক্কা দিয়ে যায়। আবর্তিত স্বরের প্রয়োগটা এইরকম—

আবর্তিত স্বর

ড্যারাড্যা ড্যাড্‌ ড্যা/ড্যারাড্যা ড্যা
ড্যারাড্যা ড্যাড্‌ ড্যা/ড্যারাড্যা ড্যা

accent চিহ্নিত স্থানে শুধু যে ঝোঁক পড়বে তাই নয়, কণ্ঠস্বর ওইখানে সর্বাধিক ঘন হবে। এই ঘনত্ব কিছুটা তীব্রতা (volume) ও কিছুটা অনুনাদের (resonance) বৃদ্ধিজনিত। বাকি সব অংশেই স্বর তরল ও সমান্তরাল। একটি পংক্তিতে স্বর একটাই পর্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, একই স্তরে। A_4 হলে গোটাটাই হবে A_4, L_1 হলে গোটা পংক্তিতেই L_1। অনুনাদ ও তীব্রতা মিলে স্বর ঘন হবে accent এর স্থানে, তেমনি অন্যত্র স্বরের ঘনত্ব কমিয়ে নেওয়া হবে অনুনাদ ও তীব্রতা কমিয়ে। এর ফলে যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হবে তা একেবারেই ব্যাঙ এর সমতুল্য। সবটাই করতে হবে ঋজু স্বরপ্রয়োগে, যেন গান গাওয়া না হয়ে যায়।

বজ্রকণ্ঠে/তোলো আওয়াজ

রুখব দস্যু/দলকে আজ

দেবে না জাপানী/উড়োজাহাজ

ভাবতে ছুঁড়ে স্ব/রাজ। ....

(জনযুদ্ধের গান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

accent এর স্থানগুলোই স্বরেরও ঘনত্বের স্থান। সমস্ত পদবন্ধটুকুই A_4 স্বরে করা যাক্। এইভাবে, এই কবিতাটি গোটাটাই কণ্ঠস্বরে বাজিয়ে তোলা

যায়। অনুরূপভাবে, নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' বা সুকান্তের 'উদ্যোগ' কবিতা নিয়ে এ প্রয়োগ চলে।

কেউ যেন মনে না করেন, আবৃত্তিতে আবর্তিত স্বরের প্রয়োগ মানেই ব্যাঙের আওয়াজ। স্বরে আবর্তনের রকমফেরে নানা দৃশ্য বা ধ্বনির ইঙ্গিত সৃষ্টি করা যায়। যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'ধায় গাড়ী ধূম ছাড়ি ধায় শত পায়/ঝড় গতি দ্রুত অতি দুনিয়া কাঁপায়'। দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে এই কবিতা বললে, ট্রেনের গতির যে আভাস আনা সম্ভব, তাই-তে, কবিতার ছন্দবিভাগ করে প্রতি পর্ব্বের মাথায় স্বরের ঘনত্ব আবর্তিত আকারে ঝোঁকসহ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে থাকলে, ট্রেনের গতির সঙ্গে তার ঝাঁকানির অনুভবও চলে আসে। তখন সমগ্র কবিতার বক্তব্য, চিত্রবর্ণনা ইত্যাদি ওই লয় ও ঝোঁক বজায় রেখে করে গেলে, আবৃত্তি অত্যন্ত চিত্ররূপময় হয়ে ওঠে।

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা 'নাগর দোলা'তে-ও স্বরের আবর্তিত প্রয়োগে কবিতার বক্তব্যসহ নাগর দোলার ঘূর্ণনের দৃশ্যকল্পটি কণ্ঠস্বরে তৈরী হয়ে যায়। এরকম আরো ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগস্থল খুঁজে নেওয়া যেতে পারে।

আবৃত্তিতে স্বরের এইসব প্রয়োগবৈচিত্র্য সংক্রান্ত বিশ্লেষণগুলি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পুস্তকলব্ধ নয়। স্বরের বোধ, প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ও অনুভব থেকে এগুলি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, এই পুস্তকে বর্ণিত সমগ্র শিক্ষা-ধারার অন্তর্গত, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ক্রমপ্রস্তুতির দ্বারা পরীক্ষিত ও ফলপ্রসূও বটে। এ নিয়ে নানা তর্ক চলতে পারে, কিন্তু কান ও কণ্ঠের মিলন ছাড়া সে তর্ক জমানো মুস্কিল। এইভাবে আরও কতরকম বিন্যাসের মধ্য দিয়ে স্বরে, শুধু বাচনিক স্বরেই, কত রকম আদল আনা যায়, কত কী সৃষ্টি করা যায়, তার কোন সীমা বাঁধা নেই। আমাদের কণ্ঠের সমগ্র স্বরক্ষেপণ সীমাকে সময় সময়মতো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়েও কাজ করতে হয়। সমস্ত রেঞ্জ্‌কে কাজে না লাগিয়ে এক-এক সীমায় কাজ করলে স্বরের চরিত্র ও সৃষ্ট পরিবেশ বদলে যায়।

সমগ্র সীমাকে দুটি ভাগে ভাগ করলে নাম দেওয়া হয় আপার্‌ ও লোয়ার্‌ রেজিষ্টার। লিপ্‌টাং-এর উচ্চতর পর্য্যায় থেকে হেড্‌ রেজিষ্টার্‌ পর্য্যন্ত আপার্‌ ও লিপ্‌টাং এর মধ্যপর্য্যায় থেকে অ্যাব্‌ডোমেনের শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত লোয়ার্‌ রেজিষ্টার্‌।

আপার্ রেজিষ্টার্ আশ্রয় করে যখন কোনো আবৃত্তির উপস্থাপন করা হয়, তখন লিপ্ টাং-ই তার নিম্নতম স্বর। সমগ্র নিবেদনটি অত্যন্ত তীব্র ও চীৎকৃত হয়। তাকে কিছুটা যাত্রার স্বরপ্রয়োগের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই উর্দ্ধভাগ প্রয়োগের পদ্ধতিতে মীড়যুক্ত, কম্পনযুক্ত, বা সাদাসিদে ঋজু স্বরে যেভাবেই হোক্ আবৃত্তি করা যায়। এটা স্বরের প্রয়োগের কোনো নতুন ধরন বা প্যাটার্ণ নয়, কেবল স্কেল বা রেঞ্জ-এর নির্দিষ্ট নির্ধারণ। নজর রাখতে হবে, এক্ষেত্রে স্বর যেন নীচে থেকে ঠেলে তোলা না হয়। হাল্কাভাবে উঁচুর দিকেই স্বরকে তুলে রাখতে হবে। এই প্রয়োগের সময় অ্যাব্ডোমেনের অনুনাদস্থলগুলি একদমই যেন ব্যবহৃত না হয়। তাই বলে স্বর নির্জীব বা ম্রিয়মান হবে না। সবিতাব্রত দত্তের আবৃত্তি যারা শুনেছেন, তাঁরা এ প্রয়োগ কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন।

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর

N_2 ....

ছুতোরের মুটে মজুরের

... .

আমি কবি যত ইতরের।

N_1 ... .

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের

N_2 ... ...

এই বিলাসবিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই

N_3 ... ...

সময় যে হায়, নাই।

L_3 ... .

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত সাগর মাগিছে হাল,

N_2 ... ...

পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল

N_3 ....

দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়

N_4 ... .

নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী সময় নাহি যে হায়।
N_5—— N_4—— N_3—— L_2—— L_4 ....

(কবি, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

তেমনি যখন লোয়ার্ রেজিষ্টার্-কে কবিতার স্কেল হিসাবে নির্ব্বাচন করা হয়, সমগ্র নিবেদনে একটি গম্ভীর ও শুদ্ধ পরিবেশ গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে effect এমন, যেন সবটাই অ্যাব্‌ডোমেনের স্বরে বলা হচ্ছে, আসলে কিন্তু অ্যাব্‌ডোমেন্ থেকে লিপ্‌টাং-এর মধ্যস্তর পর্য্যন্ত এবং ন্যাজাল্-এরও কিছু কিছু স্বর এখানে ব্যবহার করা হয়। উচ্চস্তরের অর্থাৎ ন্যাজাল্ বা লিপটাং-এর স্বরগুলি হয় কোমল, নতুবা অ্যাবডোমেনের কোনো স্বরের সঙ্গে যুগ্ম-পদ্ধতিতে (কর্ড করে) ব্যবহার করা হয়। ফলে effectটা গম্ভীর হয় অথচ স্বরবৈচিত্র্যের অভাব হয় না। রসসৃষ্টিও যথাযথ হয়।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে/সবচেয়ে সুন্দর, করুণ
A_4 .... A_4 .... A_3 .... A_2 ..
সেখানে সবুজ ডাঙা/ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল
(A_2+l_3) .. .. (A_2+l_3)—— (A_2+l_1)— A_3— A_2 —
সেখানে গাছের নাম/কাঁঠাল অশ্বত্থ বট/ জারুল, হিজল
n_1 .... L_4— L_3— L_1— A_4— A_5—
সেখানে ভোরের মেঘে/নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ
n_3 .... n_2.... n_2— n_1— l_4— l_3— A_4—
সেখানে বারুণী থাকে/গঙ্গা সাগরের বুকে/সেখানে বরুণ
A_4 .... A_4 .... l_2 ....
কর্ণফুলি ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল
l_3 ..... l_4........ l_3.... l_1... a_5.... a_4.... ....
সেইখানে শঙ্খচিল / পানের বনের মত হাওয়ায় চঞ্চল
n_3 ... . $(n_4+a_4)-(n_3+a_3)$— a_3— a_2—
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা / ধানের গন্ধের মত / অস্ফুট তরুণ
A_2 .... $(n_2+a_5)-(n_1+a_5)$—(l_4+a_5) a_5

(জীবনানন্দ দাশ)

দেখা যায়, আধুনিক কালের অধিকাংশ কবিতাতেই কতকটা সুরবর্জিত ভাবে এই লোয়ার্ রেজিষ্টারের ব্যবহারই আবৃত্তির পক্ষে সহায়ক। জীবনানন্দের এই কবিতাটি দিয়ে পদ্ধতিটি আয়ত্ত করার পর রূপসী বাংলারই অন্যান্য কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের কলিকা, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, নজরুলের 'দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি' ইত্যাদি কবিতায় এর প্রয়োগ করা যায়।

এ পর্য্যন্ত সব ক'টি কণ্ঠচালন পদ্ধতিই অভ্যাস করা হ'ল সুরেলা কণ্ঠে। কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই সুর কমিয়ে এনে কথার ভঙ্গিতে বা সুরবর্জিত বর্ণনার মতো করে কণ্ঠের প্রয়োগ করতে হয়। এই প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেকেই কাঠ-কাঠ করে অনুনাদহীন স্বরপ্রয়োগ করে ফেলেন। ফলে সেই আবৃত্তি কখনো বা আকর্ষণহীন হয়, কখনো তার কাব্যরস সরে গিয়ে একটা তীক্ষ্ণ বা আড়ষ্ট নাটকীয়তা জেগে ওঠে। মনে রাখতে হবে, আবৃত্তি করার সময় তা সুরেলা করে প্রায় গানের মতই বলা হোক্ বা ঋজুভাবে কথা বলার মত করেই বলা হোক্ বা নাটকীয় ভঙ্গিতে কি বক্তৃতার ঢঙেই বলা হোক্, সর্ব্বত্রই যে স্বরে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে তার স্বাভাবিক অনুনাদ থাকতেই হবে। ঋজুতা আনার জন্য অনুনাদের মাত্রা সামান্য কমানো যেতে পারে, শব্দগুলির প্রসার ও সেই প্রসারিত স্থানের শূন্যতাগুলিতে স্বরের বিস্তার যথাসম্ভব কমিয়ে আনা যেতে পারে। লয়ও সেই অনুযায়ী হবে। তাইতেই কথা বলার মতো সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আবৃত্তি। স্বর ঠিকঠাক অনুনাদ হারালে, কথ্য ভঙ্গিতে বলা আবৃত্তিতে এ তাবৎ আলোচিত কোনো স্বরবৈচিত্র্যের প্রক্রিয়াই আর ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। এরকম ঋজু কথ্যভঙ্গিতে আবৃত্তি করার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'ছুটির আয়োজন' কবিতাটি নেওয়া যাক্।

কাছে এল পূজার ছুটি
L_2··· L_2— L_1······
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ।
L_2 .... l_3.... . l_2
হাওয়া উঠছে শিশিরে শির্ শিরিয়ে,
a_5 ... . l_2´.... ....
শিউলির গন্ধ এসে লাগে, যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা
L_2———— l_1——— l_2 ... . l_1 ....

আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘের আলস্য

N_2 ....

দেখে, মন লাগে না কাজে।

N_1.... L_4— L_2.... L_1....

'কাছে এল' কথা দুটি কাটা কাটা স্বরে L_2 স্বরস্থানে, 'এল' ও 'পূজা'র মধ্যে মীড়, 'পূজার ছুটি' অংশটি L_1 স্বরে। 'রোদ্দুরে লেগেছে' L_2 স্বরস্থানে দাঁড়িয়ে, 'চাঁপা ফুলের' অংশ l_2 কোমল স্বরে। 'শিশিরে শিরশিরিয়ে' l_2 কোমল স্বরে ঈষৎ কম্পনসহ। স্থির শুদ্ধ স্বর L_2 দিয়ে শিউলির গন্ধ শুরু হবে মীড় সহ 'এসে লাগে' অংশে l_1 কোমল স্বরে পৌঁছবে। 'যেন—হাতের' পর্য্যন্ত l_2 কোমল স্বরে। 'কোমল সেবা' অংশটি l_1 কোমল স্বরে। স্বরে এই সমস্ত পরিক্রমণ হবে স্বরের যথাসম্ভব কম বিস্তার করে, ঋজু কথ্যভঙ্গিতে। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন অনুশীলনের সময় কাব্যপংক্তিকে বিস্তার করে বড় আকারে যে সব স্বরসঞ্চালন অভ্যাস করা হয়েছে, তাই এখানে করতে হবে খুব ছোট জায়গার মধ্যে, চকিতে, অথচ তার যাথার্থ্য ও স্পষ্টতা ক্ষুণ্ণ হবে না।

উপরের অনুশীলনীতে ছুটির ও শরৎ ঋতুর আমেজের অনুভব ফুটিয়ে তোলা গেল। এরপর একটি অনুশীলনী দিয়ে এই একই অনুভব তিনটি ভিন্ন স্তরে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যে রূপটি ওপরে দেওয়া হ'ল, তা কোনো মাঝারী আকারের ঘরে, কিছু লোকের সামনে খালি গলায় আবৃত্তি করলে যথাযথ হবে।

যদি ভালো মাইক্রোফোন ব্যবস্থা ও আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত প্রেক্ষাগৃহে এই কবিতা বলতে হয়—তবে সামগ্রিকভাবে স্তরটিকে একটু নিম্নগ্রামে নিয়ে গেলে ভালো। সেখানে, অনুভব একই রেখে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করলে চেহারাটা হয়তো এরকম দাঁড়াবে,

কাছে এল পূজার ছুটি

A_3.... A_3 ....

রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ

A_2 .... A_4 .. ... A_2 ...

হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে

(A_1+A_2)... $a_5{}'$ ... .

শিউলির গন্ধ এসে লাগে, যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা

A_2 .... l_1 .... a_4 ....

আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘের আলস্য
(A_5+n_1) ... ...
দেখে, মন লাগে না কাজে
A_2 ....

দেখা যাচ্ছে, শুধু যে স্বরস্থানগুলি বদলে গেছে, তা-ই নয়। কোনো স্থানে মীড় আর দরকার করছে না। কোনো স্থানে, একক স্বরের বদলে যুগ্মস্বর ব্যবহার করতে হয়েছে। এই স্বরলিপিটা সবার কণ্ঠের জন্য হুবহু একরকম না-ও হতে পারে। একটা সম্ভাব্য চেহারার বর্ণনা করা গেল।

কাছে এল পূজার ছুটি।
N_1 .. N_1— L_4 ...
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ
N_2 .... n_2' ... ...
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে
একই অনুভব (l_2+n_1') $(L_2'+n_2')$ ... ...
ভিন্ন স্বর-স্তরে শিউলির গন্ধ এসে লাগে, যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা
L_4 .... N_1 ... ... $(l_4+n_1)-l_1$
আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘের আলস্য
N_3 ... ...
দেখে, মন লাগে না কাজে।
N_3 .... n_3 .... . N_1 ...

এই রূপটি, ধরা যাক্, আবৃত্তি হবে খোলা মাঠে। একটু জোরে হাওয়া বইছে। মঞ্চ আছে। ভালো মাইক্রোফোনও আছে। আগের অনুভব ঠিক রেখে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করলে অনেকটা এইরকমই দাঁড়াবে।

এক্ষেত্রেও, স্বরস্থান ও প্রয়োগরীতির অনেক রদ্‌বদল ঘটলো। সমগ্র কবিতাটিতেই এরকম অনুশীলন করা যায়। অন্যান্য কবিতা নিয়ে এরকমভাবে, আগে একটি স্তরে একরকম অনুভবসহ আবৃত্তিরূপ গড়ে নিয়ে, তারপর অন্য দুই স্তরে, অন্য পরিবেশে একই অনুভব প্রকাশের চেষ্টা করে স্বরের গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে।

এ পর্যন্ত স্বরের যে সব প্রয়োগরীতির অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই পংক্তিগুলিকে একটু প্রলম্বিত করে সুরের বা স্বরের বিস্তারের অবকাশ রাখা হয়েছিল। ফলে রীতিগুলি প্রয়োগের সময় গলা খেলানোর একটা

পরিসর পাওয়া যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, যতীন বাগচী, সত্যেন্ দত্ত এমন কি প্রেমেন্দ্র মিত্র বা সুকান্তেরও কিছু কবিতায় এভাবে স্বরপ্রয়োগের অবকাশ আছে। কিন্তু আমরা সমসাময়িক কবিতার দিকে যতই এগোব, ততই কবিতার ভাষা আমাদের কথ্যভঙ্গির এত কাছাকাছি চলে আসবে যে সেখানে পংক্তিগুলি বিস্তার করে স্বর প্রয়োগের এইসব রীতি খাটানো নিতান্ত অসম্ভব।

তা হলে, তখন কি স্বরে আর কোনো রীতির প্রয়োগ চলবে না? সোজা এক স্বরে বলে যেতে হবে কবিতা?

তা নয়, তখন এইসব রীতিরই প্রয়োগ করতে হবে স্বল্প পরিসরে, চকিতে। সেই অভ্যাসে পৌঁছনোর জন্য কিছুদিন কিছু গদ্যরচনা—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ ও আধুনিক কথাশিল্পীদেরও, আবৃত্তি করা দরকার। গদ্যের ঋজুতার মধ্যে আবৃত্তির নানা রীতির স্বল্পপরিসর সূক্ষ্মপ্রয়োগ করতে হবে।

সাধারণভাবে, আবৃত্তির কণ্ঠানুশীলনের দিক্-নির্দেশ করা গেল। এই সব পদ্ধতির একটির সঙ্গে অপরটির পাশাপাশি সহাবস্থানে বা মিশ্রণে নানা জটিল স্বরস্থাপত্যের সৃষ্টি হয়, ততখানি কাগজে-কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর বাইরেও নানা প্যাটার্ণ থাকতে পারে। মনোযোগী চর্চাকারী ক্রমশঃ তা খুঁজে নেবেন। বিভিন্ন কবিতাকে কেন্দ্র করে যে অনুভব প্রকাশ করার ইচ্ছা, সেই অনুযায়ী এসব প্রয়োগের অভ্যাস করতে হবে। সেখানে মস্তিষ্কের পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন। প্রয়োজন নিরন্তর পরীক্ষণের, ভাঙা-গড়ার।

একথা মনে রাখা দরকার, কোনো শিক্ষাই ছক-বাঁধা পথে পূর্ণ সার্থকতা পায় না। শিক্ষাক্রম বা পদ্ধতির সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অক্ষমতারও বিচার থাকা চাই। তাই আলোচিত অনুশীলনীগুলি একবার পর পর অভ্যাস করলেই কণ্ঠ ত্রুটিহীনভাবে সচল হয়ে উঠবে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। যতদিন আবৃত্তি করতে হবে, ততদিনই স্বরের অনুশীলন করে যেতে হবে। যেমন গানে সরগম (যাকে গলা সাধা বলে) আজীবনই করতে হয়। যখন গলার গতি যেমন দেখা যাবে, সেই অনুযায়ী অনুশীলনী স্থির করতে হবে। যেমন, প্রথমে দেখা গেল কারো গলায় সুর একদম নেই, যে কোনো আবৃত্তিই কাটা-কাটা, কর্কশ, রেশহীন শোনায়। তখন তাকে প্রতিটি স্বরের বিভিন্ন স্বরে অনুনাদগুলি যথাযথ অভ্যাস করিয়ে, তারপর কোমল স্বর ও একাধিক মীড়ধর্মী অনুশীলনী অভ্যাস করানো দরকার। এই রাস্তা অতিক্রম করতে

বছর দেড়েক কেটে যাবার পর দেখা গেল, তার তৎকালীন আবৃত্তিতে এমন সুরেলা পেলবতা এসে পড়ল যে কোনো কিছুই আর ঋজুস্বরে বলতে পারে না। পরবর্তী দেড় বছর তার আবার বদল করার কাল। এই সময় সুরবর্জিত ঋজু স্থির স্বরের অনুশীলনী, মীড়হীন গমকধর্মী উত্থান পতন সহ অনুশীলনী, স্বরের রোলিং ইত্যাদি অভ্যাস করা দরকার। এইভাবে চর্চার প্রতি স্তরে স্বরের তৎকালীন গতিবিধি অনুযায়ী স্বরে ব্যালান্স আনার চেষ্টা করতে হবে।

স্বর শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই, অর্থাৎ যখন থেকে আবডোমেন, লিপটাং, ন্যাজাল্ ইত্যাদি চেনা শুরু হ'ল, বিভিন্ন কথোপকথন, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি শুনে স্বরগুলি ও স্বরের গতিবিধি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

নিরীক্ষণ

দরকার মতো গলায় নকল করে স্বরস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করতে হবে। আবার প্যাটার্ণগুলি (মীড়, কম্পন, যুগ্মস্বর ইত্যাদি) যখন শিক্ষা করা হতে থাকবে, তখনও বিভিন্ন অভিনয় আবৃত্তি শুনে তার কোথায় কতটুকু কোন্ প্যাটার্ণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, দেখতে হবে।

কয়েকজন অনুশীলনকারী একত্রে বসে, একজন গলায় এক ধরণের প্যাটার্ণ প্রকাশ করবে, অন্যরা তার যথাযথ রূপ নির্ধারণ করবে, পালাক্রমে। এই ভাবে দলগত আলোচনার ধরনে চর্চা চালানো খুব উৎসাহব্যঞ্জক। এমন কি একই কবিতায় কিছু অংশ একজন স্বরের একটা বিন্যাসে বা স্তরে এনে ছেড়ে দেওয়ার পর পরবর্তী অংশ অন্যজন সেই স্বর থেকে শুরু করে অন্যত্র নিয়ে ছেড়ে দেওয়া বা সেই স্বর থেকে শুরু না করে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোনো স্বর থেকে শুরু করে অন্যত্র ছেড়ে দেওয়া—এইভাবে খুব আগ্রহজনক স্বরের অনুশীলন হতে পারে। এতে একই সঙ্গে স্বর চেনার ও রূপায়ণের অভ্যাস হয়। সমবেত আবৃত্তি রূপ দেওয়ার জন্য এই অনুশীলন খুব ফলপ্রসূ।

সবশেষে, আবৃত্তিতে স্বর নামক আঙ্গিকটিকে অনুভবের সঙ্গে সংযুক্ত করার একান্ত ধ্যানময় আনন্দ উপভোগের জগৎটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করব।

আমাদের একথা জানা আছে যে, সংগীতে একটি পর্দার ওপর আর একটি পর্দা ছুঁইয়ে দিলে বা এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় যাওয়ার ধরনে এক একরকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আবৃত্তিতেও যে কথাটি বলা হচ্ছে,

স্বরের অনুভব

স্বরান্তরের ফলে তার অনুভব বদলে যায়। যিনি আবৃত্তি করবেন, তাঁর নিজ কণ্ঠের এই স্বরান্তর তাঁকেই ভিন্ন ভিন্ন অনুভব দেবে।

অনুশীলনের এই অংশে নিজ কণ্ঠস্বরের কোন্ অবস্থান ও কীরূপ গতিবিধি নিজেকে কী অনুভব দেয়, তা-ই উপলব্ধি করার। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা এই সংযোগ স্থাপিত হলে, যে-কোন জটিল অনুভব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণ্ঠে প্রকাশিত হওয়ার রাস্তা তৈরী হ'ল।

আলোচনা প্রসঙ্গে আগের অধ্যায়ে যে বলেছি, কৌশলই আবৃত্তি করার সময়ে অনুভবে ফিরে যেতে সাহায্য করবে, এ তারই অনুশীলন। ধরা যাক্,

'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'

পংক্তিটি নেওয়া হ'ল। এই পংক্তিতে ইচ্ছেমত নানা স্তরের, নানা রঙের ও নানা সঞ্চালন পদ্ধতির স্বর ব্যবহার করা হবে, খানিকটা স্বর নিয়ে খেলা করার মতো। পংক্তিটিতে সাধারণভাবে রয়েছে একটা বর্ষার বর্ণনা। কিন্তু স্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে তা আর বর্ণনামাত্র থাকে না। নানা পরিবেশ নানা অনুভব ফুটে উঠতে থাকে। কিন্তু কোনো অনুভব (শঙ্কা, আনন্দ, হতাশা, উদ্দীপনা ইত্যাদি) আগে থেকে ভেবে নিয়ে স্বরপ্রয়োগ করা হবে না। বরং করা হবে ঠিক উল্টোটা। স্বরের রকম রকম প্রয়োগ করে লক্ষ্য করতে হবে— কী আবেদন তৈরী হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্বরের ঠিক কী প্রয়োগ হচ্ছে, তা-ও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যে রাখতে হবে। ধরা যাক্,

(১) পংক্তিটি অ্যাবডোমেনের একটি স্থির স্বরে বলা হ'ল।

(২) ওই স্বরেরই সংলগ্ন কোমল স্বর ব্যবহার করা হ'ল।

(৩) অ্যাবডোমেনের স্তরেই শুদ্ধ স্বরে একটু কম্পন লাগানো হ'ল।

(৪) ন্যাজালের একটি কোমল স্বরে বলা হ'ল।

(৫) ন্যাজালে শুদ্ধ স্বরে শুরু করে, শুদ্ধ কোমল নানা স্তর ছুঁয়ে মীড়সহ গড়িয়ে অ্যাব্ডোমেনে নামা হ'ল।

(৬) ৫নং পদ্ধতিতে একটু কম্পনও দেওয়া হ'ল।

(৭) অ্যাবডোমেনের কোনো স্বরকে কর্ড করে, কম্পনসহ, নীচে থেকে ন্যাজাল্ পর্য্যন্ত গিয়ে 'গগনে গরজে মেঘ' পর্য্যন্ত বলে, 'ঘন বরষা' অংশে সেখান থেকে অ্যাবডোমেনে ফিরে আসা হ'ল, একই পদ্ধতিতে এই সমস্ত সঞ্চালনটাতেই স্বরের তীব্রতা হ্রাসবৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে রোলিং আনার চেষ্টা হ'ল।

এর প্রত্যেকটি প্রয়োগের জন্য একই পংক্তির নানা অনুভব, দৃশ্যকল্প, ইত্যাদি ফুটে উঠবে। এখানে কতকগুলি পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই

অনুশীলনের সময় সবরকম স্বরের গতিভঙ্গির জন্যই, যে কোনো পংক্তিতে, অনুভব পাওয়া যাবেই—এমন নাও হতে পারে। পঁচিশ রকম চেষ্টা করে হয়তো মাত্র পাঁচ-ছ' রকম সঞ্চালন থেকে পাঁচ-ছ'টি ভিন্ন ভিন্ন অনুভব পাওয়া গেল।

সেই ক'টি সঞ্চালনের নিখুঁত প্রয়োগকে রপ্ত করতে হবে। যতবারই সেই প্রয়োগ করা হোক্‌ প্রয়োগকর্তার নিজের কাছে একই অনুভব ফিরে আসছে কি না, সেটা তাঁকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অনুভব না যদি ফেরে, তবে,

হয় (১) প্রথম বিচারে অনুভব-টা বুঝতে ভুল হয়েছিল।

নতুবা (২) প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতিটি নির্ণয় করে ওঠা যায় নি, অর্থাৎ স্বরের ঠিক কী রকম সঞ্চালন থেকে অনুভবটা এসেছিল, তা ঠিকমত লক্ষ্য করা হয় নি।

স্বরের প্রয়োগে যদি কোনো অনুভব সত্যিই গড়ে ওঠে, তবে তার পুনঃ-প্রয়োগে সেই দিন তা আবার গড়ে তোলা সম্ভব তো বটেই, অনুশীলনের লক্ষ্য হ'ল, সপ্তাহখানেক কি মাসখানেক পরেও ওই একই স্বরপ্রয়োগ করলে, সেই পংক্তিতে সেই অনুভব আবার যেন ফিরে পাওয়া যায়।

এই জন্যই এই অনুশীলনকে ধ্যানের সঙ্গে তুলনা করা হ'ল। এই সংযোগ সত্যই সাধনার ব্যাপার। আর যিনি এই রহস্যকে ছুঁতে পেরেছেন, তিনি যে কোনো মঞ্চে, যে কোনো স্থানে, স্বরক্ষেপণ দিয়ে পরিবেশ তৈরী করে নিতে পারবেন, সেই সঙ্গে নিজেও অনুভবের কেন্দ্রে ফিরে যেতে পারবেন। জনতার মাঝে বসেও, জনতাকে লক্ষ্যে রেখেও, শিল্পসৃষ্টিতে মগ্ন হতে পারবেন।

আর নিভৃতে, তাঁর প্রতিদিনের অনুশীলনও, হয়ে উঠবে তাঁর শিল্পের সঙ্গে তাঁর একান্ত খেলার তৃপ্তি ও আনন্দে ভরপুর।

উচ্চারণ

এ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে বাগ্‌যন্ত্রের সেই সব অংশের ব্যবহারের কথা যার দ্বারা আবৃত্তিতে স্বরের নানা ধরন সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু ধরন-সৃষ্টির কৌশলও আয়ত্ত হয়েছে। আমাদের কথা বলার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে গেলে স্বরযন্ত্রের পরই আলোচ্য উচ্চারণ-যন্ত্রের কথা। উৎপন্ন স্বর মুখগহ্বর বা নাসিকাগহ্বরের মধ্য দিয়ে বাইরে আসার পথে মুখগহ্বরের যে সব আকৃতিগত পরিবর্তন এবং যে সব আংশিক ও সম্পূর্ণ বাধার সম্মুখীন হয়, তারই ফলে গড়ে ওঠে উচ্চারণ। স্বরযন্ত্রের মত উচ্চারণ যন্ত্রেরও ব্যবহার বহুবিধ। যে কোনো ভাষার বর্ণমালা ও বর্ণদ্বারা গঠিত বিভিন্ন শব্দাবলীর উচ্চারণ শেখার জন্য আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের দ্বারস্থ হতেই হবে। উচ্চারণ-তত্ত্ব তাঁদেরই বিদ্যার অঙ্গ। কাজেই, এ প্রসঙ্গে সাধারণ আলোচনা যে কোনো ভাষাতত্ত্বের বইতেই পাওয়া যাবে। বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌দের আলোচনাগুলি যে কোনো আবৃত্তি শিক্ষার্থীকেই সাহায্য করবে। তবু, আবৃত্তি-শিক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত এই আলোচনাটুকু নিতান্ত ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরেই করতে হ'ল। যদিও বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তার সংশোধন পদ্ধতি এবং উচ্চারণ ব্যঞ্জনা বিষয়ে আলোকপাত লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আহরিত।

স্বরসৃষ্টির যন্ত্র ও পদ্ধতি বলতে আমরা দেখেছি Exitor, Vibrator, Resonator এর ব্যবহার। উচ্চারণ মূলতঃ Articulator এর কাজ। স্বাভাবিকভাবেই, স্বরকে বাদ দিয়ে যেহেতু উচ্চারণ হতে পারে না, তাই উচ্চারণের ক্ষেত্রেও ওই যন্ত্রগুলি কাজ করছেই, তাছাড়া উচ্চারণের যন্ত্র বলতে যে যে অঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাদের কাজ অনুসারে দু ভাগে ভাগ করা যায়— সক্রিয় (Active) এবং সহায়ক (Passive)। জিভ, দাঁত, অধর বা নীচের ঠোঁট হ'ল সক্রিয়; অন্যান্য অঙ্গগুলি (ওষ্ঠ, দন্ত, দন্তমূল, মূর্ধা, কঠিনতালু, কোমলতালু) সহায়কের ভূমিকা নেয়। আলজিভ, কখনো সক্রিয় কখনো

সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সক্রিয় অঙ্গগুলি কখনো পরস্পর নানাভাবে সংযুক্ত হয়ে ধ্বনির নির্গমন পথে যথার্থ বাধার সৃষ্টি করে, কখনো বা নানা অবস্থানে উঠে নেমে পথটির আকার আয়তনের পরিবর্তন ঘটায়।

এই বাধা নানা রকমের হয়ে থাকে। ল্যারিংস্ থেকে শুরু করে অধরওষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত মুখগহ্বরের নানা স্থানে বাধার সৃষ্টি হয়। সেই অনুযায়ী ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics) শাস্ত্রে উচ্চারিত ধ্বনিগুলির নামকরণ করা হয়।

প্রথমে আমরা বাধার ধরনগুলি বুঝে নিই। একধরনের বাধা সৃষ্টি হয় স্বরতন্ত্রীতে (vocal cords)। এটা ঠিক বাধা নয়। স্বরতন্ত্রীদ্বয় পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে বায়ুর নির্গমনমুখে এসে দাঁড়ালে স্বরতন্ত্রীতে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তার ফলে ধ্বনি কিছুটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। এই ক্রিয়া যাদের ক্ষেত্রে হয়, সেই বর্ণগুলির ধ্বনিকে ঘোষধ্বনি বলে : গ জ ড দ ব, ঘ ঝ ঢ ধ ভ। যে সব বর্ণ উচ্চারণকালে এই ক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয় না, অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীরা পথ আগলাবার চেষ্টা করে না, সেই সব বর্ণের ধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে : ক চ ট ত প, খ ছ ঠ থ ফ। কানে আঙুল দিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলে স্বরতন্ত্রীর কম্পনের এই রহস্যটি অনুধাবন করা যাবে।

কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরস্থ স্বরতন্ত্রী ছেড়ে এবার মুখগহ্বরে প্রবেশ করা যাক্। এই মুখগহ্বরের উচ্চারক অঙ্গগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত না হয়ে, কেবল ধ্বনিপথের আকৃতিগত কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে নানা ধ্বনি সৃষ্টি করে, সেই সব ধ্বনিকে বলা হয় স্বরধ্বনি : অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

মুখগহ্বরে আসার পথে একটি ছোট্ট পথ রয়েছে নাসিকা গহ্বরে যাবার। যাকে আমরা velum বলে জেনেছি। এইখানে আল্‌জিভ রয়েছে। সে উঠে নেমে বা কোমলতালুকে উঠিয়ে নামিয়ে নাসিকা গহ্বরের পথ খোলা বা বন্ধ রাখার প্রহরীর কাজ করে। সেটাও আমরা জেনেই গেছি, ন্যাজাল্ স্বরপ্রয়োগ শেখার সময়। এই নাসাগহ্বর খোলা বা বন্ধ রাখা উচ্চারণ ক্রিয়ারও অঙ্গ। খোলা থাকলে যে ধ্বনি হয় তাকে বলে অনুনাসিক : ঙ, ন, ম। বন্ধ থাকলে হয় অননুনাসিক : ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, ঝ, জ, ট, ঠ, ড, ঢ ইত্যাদি।

মুখগহ্বরে উচ্চারক অঙ্গগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বাধা সৃষ্টির দ্বারা যে সব ধ্বনি উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। ক থেকে ম পর্যন্ত সব বর্ণ এবং য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য়, অন্তস্থ ব এর অন্তর্গত। ঘোষ বা অঘোষ, অনুনাসিক বা অননুনাসিক এই ব্যঞ্জনধ্বনিরই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য।

মুখগহ্বরে এই বাধা যখন পূর্ণ বাধা হয়, অর্থাৎ উচ্চারক অঙ্গ দুটি পরস্পর সবলে যুক্ত থাকে যতক্ষণ না পেছনে নির্গমনমুখী বায়ু বিস্ফোরণের উপযোগী চাপ সৃষ্টি করছে, এবং তারপর ওই বাধা বিস্ফোরণসহ অতিক্রম করে, তখন সৃষ্ট হয় স্পৃষ্টধ্বনি (plosive) : ক খ গ ঘ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ইত্যাদি। বাধা যখন এমন হয়, উচ্চারক অঙ্গ দুটি পরস্পর সংযুক্ত হয়েও কিছুটা বায়ু ও ধ্বনি নির্গমনের জায়গা রেখে দেয় তখন সৃষ্ট ধ্বনিকে বলা হয় উষ্মধ্বনি (fricative) : শ, হ ইত্যাদি। বাধা যখন এমন হয়, যে প্রথমে অঙ্গদ্বয় খুব দৃঢ়ভাবে পথরোধ করে, পরে কিছুটা আলগা হয়ে ঘেঁষটে সরে এসে নির্গমনের পথ করে দেয়, অর্থাৎ স্পৃষ্টধ্বনি ও উষ্মধ্বনির মিশ্রিত প্রক্রিয়ায় ধ্বনি উৎপন্ন করে, তাকে বলে ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate) : চ ছ জ ঝ।

এছাড়া, জিভ কম্পনসহ দন্তমূলে সংযুক্ত হয়ে পথরোধ করলে বলা হয় রণিত (trilled) : র। জিভ যখন মূর্ধায় ঘন ঘন তাড়না করে, বলা হয় তাড়িত ধ্বনি : ড়, ঢ়। ই-কার বা উ-কার উচ্চারণের সময় যদি জিহ্বাগ্র বেশী উঁচুতে ওঠে বা ওষ্ঠদ্বয় সংকীর্ণ হয়, বায়ুপথ আংশিকভাবে রুদ্ধ হয়, তবে semi-vowel বা অর্ধস্বর উচ্চারিত হয় : অন্তস্থ য় বা অন্তস্থ ব। যেমন : টিয়া বা খাওয়া শব্দে। জিভের ডগা দন্তমূলে সংলগ্ন, কিন্তু দুই পাশ দিয়ে বাতাস ও ধ্বনি নির্গত হলে, পার্শ্বিক ধ্বনি : ল।

এই তো গেল বাধার ধরন বা প্রকৃতি। এছাড়া রয়েছে বাধার স্থান। বাধা যখন কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে হয়, তা কণ্ঠ্যধ্বনি : হ ; বাধা যখন জিভের পেছনের অংশ ও কোমল তালুর সংযোগে হয়, তা হ'ল কোমল তালব্য। যদিও তাকেও সাধারণত কণ্ঠ্যধ্বনি-ই বলা হয় : ক খ গ ঘ।

বাধা যখন জিভের সামনের অংশ ও মূর্ধা সংযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করছে তখন তাকে বলা হচ্ছে মূর্ধাধ্বনি এবং যেহেতু এক্ষেত্রে জিভ একটু মুড়ে মূর্ধা স্পর্শ করছে, তাই একে প্রতিবেষ্টিতও বলা হচ্ছে ; ট ঠ ড ঢ ড় ঢ়। জিভের সামনের অংশ যখন দন্তমূল ও অগ্রতালুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাধার সৃষ্টি করছে তার নাম তালব্য। এক্ষেত্রে জিভের পৃষ্ঠভাগ তালুর কাছাকাছি আসে, আসলে তালু-দন্তমূলীয় : চ ছ জ ঝ শ য়। জিভের সামনের অংশ দাঁতের পেছনে সংযুক্ত হয়ে যে ধ্বনি উৎপন্ন করে তাকে বলে দন্ত্য : ত থ দ ধ। জিভ যখন দন্তমূলে সংযুক্ত হয় তাকে বলে দন্তমূলীয় : ন র ল। যখন অধর ও ওষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে পথরোধ করে, সে ধ্বনি হ'ল ওষ্ঠ্য : প ফ ব ভ ম, অন্তস্থ ব।

আমরা মোটের ওপর বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি নিয়েই আলোচনা করলাম। অন্যান্য ভাষার উচ্চারণে এই সক্রিয় ও সহায়ক অঙ্গগুলিই আরও অন্যান্য অংশে সংযুক্ত হয়ে নানা ধ্বনি সৃষ্টি করে: সংস্কৃত ণ। বাংলায় এই উচ্চারণ অনেকটা 'ড়'-এর মত শোনাবে। ইংরেজী full, vat ইত্যাদি উচ্চারণে নিম্নোষ্ঠ ও দাঁতের (পেছনের অংশ) সংযোগে দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি: ফ়, ভ় উচ্চারিত হয়।

স্বরধ্বনিগুলিতে, আগেই বলেছি, কোনো যথার্থ বাধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু জিভের অবস্থান (শোয়ানো, অর্ধেক ওঠানো বা সম্পূর্ণ ওঠানো, সামনে বা পেছনে), ঠোঁটের আকার (চ্যাপ্টাভাবে ছড়ানো বা গোল) এবং মুখগহ্বরের অবস্থান (সম্পূর্ণ খোলা বা অর্ধেক খোলা) এর ওপর সৃষ্টি হয়ে থাকে। জিভ যখন শোয়ানো থাকে (নিম্ন) এবং মুখগহ্বর সম্পূর্ণ খোলা থাকে (বিবৃত), 'আ' ধ্বনির উচ্চারণ হয়। যেহেতু জিভ সামনে বা পেছনে এগিয়ে যায় না, তাই একে কেন্দ্রীয় স্বর বলে। জিভ যখন শোয়াঅবস্থা থেকে ১/৪ অংশ উঠল (মধ্য নিম্ন মুখগহ্বরও একটু যেন কম ফাঁক হয়ে রইল (অর্ধবিবৃত), এ অবস্থায় জিভ যদি সামনে এগিয়ে থাকে (সম্মুখ) অ্যা ধ্বনি, ও জিভ উলটিয়ে পেছনে এলে (পশ্চাৎ) অ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। জিভ যদি আরও একটু অর্থাৎ ৩/৪ অংশ ওঠে (মধ্যোচ্চ) এবং মুখগহ্বর আরো বুজে আসে (অর্ধসংবৃত), জিভ সামনের দিকে থাকলে এ-ধ্বনি ও পেছনে থাকলে ও-ধ্বনি উচ্চারিত হয়। জিভ যখন সব থেকে উঁচুতে তোলা হ'ল (উচ্চ), মুখগহ্বর প্রায় বন্ধ হয়ে এলে (সংবৃত) জিভ সামনে দিকে থাকলে 'ই' এবং পেছনে থাকলে 'উ' উচ্চারিত হয়।
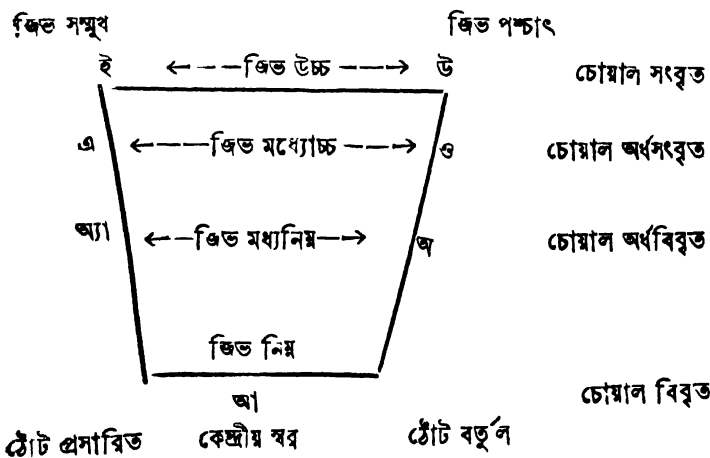
এই সব পদ্ধতি যথাযথ মেনে উচ্চারণ করলে তা শুদ্ধ, কোথাও ত্রুটি ঘটে গেলেই তা অশুদ্ধ হয়। জন্মসূত্রে বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও এবং ছেলেবেলা থেকে বাংলা ভাষা শেখা সত্ত্বেও অনেক শৈথিল্য আমাদের দৈনন্দিন উচ্চারণে থাকে। আবৃত্তিতে সেই সব ত্রুটি এসে পড়লে উচ্চারণজনিত যথার্থ ঝঙ্কার কণ্ঠে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। কেবল শুদ্ধতারই প্রশ্ন তো নয়, আবৃত্তির ক্ষেত্রে উচ্চারণ শিক্ষার আরেকটি যে পর্য্যায়—অর্থব্যঞ্জনা ও ধ্বনিব্যঞ্জনা, সেগুলিও ত্রুটিহীন উচ্চারণ ছাড়া সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।

একটি বর্ণের উচ্চারণগত যে প্রক্রিয়া, সেটির যথাযথ পালনেই তা সঠিক ধ্বনিত হতে পারে। যেমন ধরা যাক 'ধ'। বাধার প্রকৃতি অনুযায়ী এটি স্পৃষ্টধ্বনি এবং ঘোষ ধ্বনিও বটে। স্থান অনুযায়ী দন্ত্য। এবং এর আরো একটি পরিচয় হ'ল এ মহাপ্রাণ। অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর চাপ কিছু বেশী দরকার। কাজেই সামনের অংশ দাঁতের পেছনে পূর্ণবাধার সৃষ্টি করবে যতক্ষণ না বিস্ফোরণযোগ্য বায়ুচাপ সৃষ্টি হয়, একই সঙ্গে স্বরতন্ত্রীদ্বয় পরস্পর যুক্ত হয়ে ও মুক্ত হয়ে বাড়তি অনুরণন সৃষ্টি করবে, অতঃপর বাধার আকস্মিক মুক্তিতে সঠিকভাবে 'ধ' উচ্চারিত হবে।

ধরা যাক্ 'ও'। জিভ মধ্যোচ্চ পর্য্যায়ে উঠিয়ে রেখে, পশ্চাৎভাগে এনে, ঠোঁট দুটি গোল করে, মুখগহ্বর অর্ধসংবৃত অবস্থায় রাখলে তবে যথার্থ ও-ধ্বনি শোনা যাবে।

আবৃত্তি করার জন্য যেমন এই বিজ্ঞানকে নিজস্ব উচ্চারণ যন্ত্রটির যথাযথ ব্যবহার দিয়ে জেনে নেওয়া দরকার, তেমনি অন্যের আবৃত্তি শোনার সময় বা অন্যকে শেখানোর সময়ে এই প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকলে তার যথাযথ ত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধন সম্ভব নয়।

এখন চলিত কিছু ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা যাক্। সাধারণতঃ এই সব কারণে ত্রুটিগুলি আসে—

১। শিথিল অভ্যাসের জন্য। এক্ষেত্রে উচ্চারণকারী যথাযথ উচ্চারণে অক্ষম নয়, কিন্তু অভ্যাসবশে ভুল উচ্চারণ করে।

২। উচ্চারক অঙ্গদ্বয়ের যথাযথ ব্যবহার করতে না পারার জন্য।

৩। ভুল উচ্চারণ নিজের কানে ধরতে না পারার জন্য। হয়ত উচ্চারণ প্রক্রিয়াটি সে যথাযথ পালনে সক্ষম, কিন্তু কখন-সেটি সঠিক হচ্ছে কখন ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে। ধরতে পারে না।

প্রথম ধরনের ভুল শোধরানো অপেক্ষাকৃত সহজ। কেবল আবৃত্তিকারকে একটু পরিশ্রমী হতে হবে। প্রথম প্রথম সচেতনভাবে ধীরে, ক্রমশ দ্রুত ও অধিক অভ্যাসে শেষপর্যন্ত সতর্কতা ছাড়াই সাবলীল শুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়াস পেতে হবে। প্রথমে গদ্যপাঠ, পরে যুক্তাক্ষরবহুল কবিতা পাঠ, বিশেষতঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য' দ্রুত আবৃত্তির মধ্য দিয়ে এ প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে। শিথিল অভ্যাসের কয়েকটি সম্ভাব্য ত্রুটি: মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ বা ঘোষ-অঘোষ ধ্বনিতে গোলমাল, য-ফলা র-ফলার উচ্চারণে অযত্ন, যুক্তব্যঞ্জনে শৈথিল্য, শেষের বর্ণে অস্পষ্টতা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধরনের ভুল একটু কষ্ট দেয়। প্রথমতঃ সমগ্র উচ্চারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন্ উচ্চারণ স্থান বা বাধার প্রকৃতিতে অপটুতা সেটি সঠিক নির্ণয় করতে হবে। তারপর সেই প্রক্রিয়াটি উচ্চারণকারী নিজ উচ্চারক অঙ্গগুলি নিয়মমতন স্থানে স্থাপন করে উচিত মতো বাধার সৃষ্টি করে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। অঙ্গগুলি যেহেতু মুখগহ্বরে, তাই বাইরে তার একটা ছবি এঁকে সেটি অনুসরণ করে অনুভব দ্বারা অঙ্গগুলি সঞ্চালনের চেষ্টা করতে হবে। সেই সঙ্গে কানে সঠিক ধ্বনিটি বার বার উচ্চারণ করে পৌঁছে দিতে থাকলে, খুব ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অঙ্গগুলি উচিতরূপে ব্যবহারের জ্ঞানটি তিনি লাভ করতে পারবেন। কিন্তু জানা বা বোঝা এক কথা, আর কাজের সময় ত্বরিতে তার ব্যবহার অন্য কথা। সেটি অত্যন্ত অভ্যাসসাপেক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই কম বয়সের শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশী বয়সের শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে কষ্ট পেতে হয় বেশী। বর্ণটি সঠিকভাবে উচ্চারিত হলে পর, সেই বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের সংযোগে শব্দ এবং ওই বর্ণের অনুপ্রাসযুক্ত বাক্য বা কাব্যপংক্তি মন্থর থেকে দ্রুতলয়ে বলার অভ্যাস করতে থাকলে দিনে দিনে ত্রুটিমুক্ত হওয়া যায়। যেমন ধরা যাক, র এবং ড় এর উচ্চারণের কথা। এটি একটি অত্যন্ত প্রচলিত ত্রুটি।

'র' বর্ণটির উচ্চারণ স্থান হ'ল দন্তমূল। বাধার প্রকৃতি হ'ল রণিত (trilled)। ছবি এঁকে দন্তমূল স্থানটি বুঝিয়ে দিলে, সহজেই শিক্ষার্থী নিজ মুখগহ্বরে জিভের অগ্রভাগ দিয়ে সেটি স্পর্শ করে দেখতে পারেন। কম্পন বা রণন ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য প্রলম্বিত র্-র্-র্—উচ্চারণ, অনেকটা চানাচুর বিক্রেতার মত করে, বার বার করে দেখালে, শিক্ষার্থী প্রথমে কিছুটা আড়ষ্ট-ভাবে কিন্তু ক্রমে সহজভাবে অনুসরণ করতে পারবেন। তখন প্রলম্বিত

উচ্চারণটি কমিয়ে এনে একমাত্রিক 'র' তে দাঁড় করিয়ে দিলে এই বর্ণের উচ্চারণ ক্রিয়া তাঁর জানা হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে, 'ড়' উচ্চারণের স্থান হ'ল মূর্ধা। বাধার প্রকৃতি হ'ল জিহ্বার প্রতিবেষ্টিত অবস্থায় তাড়না। ছবিতে মূর্ধা ও প্রতিবেষ্টিত জিহ্বার অবস্থান বুঝিয়ে দিলে শিক্ষার্থী ওই স্থানে জিহ্বাস্থাপন করে দেখতে পারেন। এরপর তাঁকে 'ড' উচ্চারণ করতে বলা হ'ল। ফলে ওই স্থানে স্পৃষ্টধ্বনি সৃষ্টির ক্রিয়াটি তিনি উপলব্ধি করলেন। তখন প্রতিবেষ্টিত অবস্থায় ওই স্থানে জিহ্বার স্পর্শ একবার তুলে পুনরায় স্থানটিকে আঘাত করে 'ড' বলবার চেষ্টা করতে থাকলেই 'ড়' ধ্বনি সৃষ্টি হবে। এটি অত্যন্ত মন্থর পর্যায়ে উচ্চারণ করে তাঁকে শোনাতে থাকলে তিনি বুঝে নিতে পারবেন।

এরপর, র-এর জন্য

'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে'

ও ড়-এর জন্য

'বড় বাড় বেড়েছো হে, আর বেড়ো না'

জাতীয় অনুপ্রাসধর্মী পংক্তি মন্থর থেকে দ্রুত লয়ে অভ্যাস করতে থাকলে জিহ্বার সঞ্চালন দখলে আসবে।

যাঁদের এই দুটি বর্ণে উচ্চারণ গোলমাল হয়ে যায়, তাঁদের জন্য মিশ্র অনুশীলনী দরকার। প্রথম পর্যায়ে রণিত দন্তমূলাশ্রয়ী 'র' এবং তাড়িত প্রতিবেষ্টিত মূর্ধাশ্রয়ী 'ড়' পাশাপাশি দ্রুত উচ্চারণ করা দরকার। র-ড়, র-ড়, ড়-র, র-ড়। এইভাবে।

তারপর, 'গড়ের মাঠে গরুর গাড়ী গড়গড়িয়ে যায়'

জাতীয় ড়, র মিশ্রিত বাক্য নিয়ে মন্থর থেকে দ্রুত লয়ে অভ্যাস করতে হবে। এজন্য সুকুমার রায়ের খাই-খাই গ্রন্থে 'দাঁড়ের কবিতা' খুব উপযোগী।

এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল
কাক বলে রেগে মেগে, "বাড়াবাড়ি ওই ত।
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড় কাক হই ত' ?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি তবে রে
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে? ...ইত্যাদি।

আর একটি বহু আলোচিত ত্রুটি হ'ল 'শ' এর উচ্চারণ। তালব্য শ এর বদলে কেউ কেউ দন্ত্য স উচ্চারণ করেন। সেটাই মূল ত্রুটি। এছাড়া একরকম তীব্র শিস্‌ধ্বনি সহ তালব্য শ উচ্চারণও একরকম ত্রুটি।

বাংলায় শ, ষ, স তিনটি উচ্চারণই তালব্য। অনেকেই একথা সঠিক জানেন না। তাঁরা সংস্কৃতানুসারী উচ্চারণ করতে গিয়ে বা ওই রকম উচ্চারণ শিখিয়ে অনেক বিভ্রাট বাঁধান ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। বাংলায় কেবল অনুনাসিক দন্তবর্গীয় ব্যঞ্জনের সঙ্গে শ বা স যুক্ত হলে এবং দন্তমূলাশ্রয়ী রণিত বর্ণ র (ফলা হিসেবে) শ, স এর সঙ্গে যুক্ত হলে এদের দন্তাশ্রয়ী উচ্চারণ হয় (স্তন, স্থির, শ্রী, রাস্তা, কাস্তে)। তেমনি মূর্ধা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে কিছুটা 'ষ' ধ্বনি পাওয়া যায় (কষ্ট, কাষ্ঠ) বা পরে তাড়িত 'ড়' ধ্ব'ন থাকার ফলেও শ এর উচ্চারণ স্থানের পরিবর্তন হয় (ষাঁড়, আষাঢ়)। অর্থাৎ অন্য বর্ণের টানে জিভ যা একটু এগিয়ে পিছিয়ে যায়, অন্যথায় সবই তালব্য উচ্চারণ। চেষ্টা করলে তিনটি শ একক ভাবে উচ্চারণ করেও কিছু তারতম্য আনা যায়, কিন্তু তা ধ্বনিতাত্ত্বিক মতে বিজ্ঞানভিত্তিক বলে গ্রাহ্য নয়। তেমন গা-জোয়ারী কৌশল স্বচ্ছন্দ আবৃত্তির সময় টেঁকেও না।

সেজন্য 'শ' উচ্চারণে জিভের সম্মুখভাগ দিয়ে তালুতে বাধার সৃষ্টি হবে। এই বাধা কিছুটা আল্‌গা। কারণ বাধা থাকাকালীনই কিছুটা বাতাস ও ধ্বনি এই স্থান দিয়ে বার হতে পারবে। তারপরে বাধা অপসারিত হয়ে উচ্চারণ হবে। যারা পরিভাষাগত নাম উষ্মধ্বনি। এই প্রক্রিয়াটিও একইভাবে ছবি এঁকে বুঝিয়ে এবং উচ্চারণ করে দেখাতে থাকলে শিক্ষার্থী অনুসরণ করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে, দন্তমূলাশ্রয়ী সংস্কৃত 'স' উচ্চারণটিও শিক্ষার্থীর নিজ উচ্চারণ-অঙ্গের ব্যবহার দিয়ে চিনিয়ে নিলে, পাশাপাশি ওই দন্ত্য স ও তালব্য শ এর উচ্চারণ-অভ্যাস তার আপন ত্রুটি সম্বন্ধে অনেকটা সচেতনতার সৃষ্টি করে।

তারপর, 'সাতটি চাঁপা, সাতটি গাছে
সাতটি চাঁপা ভাই'

জাতীয় অনুপ্রাসধর্মী পংক্তি অভ্যাস করা দরকার।

প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের ভুল শোধরানো খুবই মুস্কিল হয়ে পড়ে যদি তৃতীয় ধরনের ভুলটি সঙ্গ দেয়। নিজের ভুল নিজের কানে ধরা না পড়লে শোধরানো খুবই সমস্যার ব্যাপার। দেখা গেছে, এ ধরনের ত্রুটিকর্তা সাধারণতঃ অপরের ভুল উচ্চারণও সঠিক বুঝতে পারেন না।

সেক্ষেত্রে, তাঁর সামনে ইচ্ছাকৃত ভুল উচ্চারণ করে, তাঁকে ধরবার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ তাঁর কান আগে তৈরী করতে হবে। হয়তো প্রথমদিকে একই ভুল সহ একটি বাক্য তাঁর সামনে বারবার উচ্চারণ করে যেতে থাকলে তবে তিনি ভুলটি উদ্ধার করতে পারবেন। এরই পাশাপাশি তাঁর নিজের উচ্চারণের সময় ভুলগুলির দিকে নিজেই নজর দিতে থাকলে, দেখা যায়, এই বিপরীত প্রক্রিয়ায় খুব তাড়াতাড়ি ফল লাভ হয়।

তবে, নিজের দোষত্রুটির দিকে নজরই পড়ে না কিন্তু অন্যের সমালোচনায় সজাগ—এমন লোকের তো কান তৈরীর প্রশ্ন নেই। কেবল উচ্চারক অঙ্গদ্বয়ের সঞ্চালন-অভ্যাস ও নিজের উচ্চারণে যত্ন ও মনোযোগ দেওয়াই একমাত্র পথ। এক্ষেত্রে চিকিৎসা যত না উচ্চারক অঙ্গ ও প্রক্রিয়ার, তার চেয়ে বেশী মানসিকতা ও স্বভাবের।

এ পর্য্যন্ত আলোচিত সকল প্রক্রিয়াই স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাঁদের বাগাঙ্গে কোনো অসুস্থতা আছে, সেক্ষেত্রে এই সব প্রক্রিয়ার যথার্থ উপযোগ স্বভাবতই নেই, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

প্রাথমিকভাবে, যে কোন আবৃত্তি-শিক্ষার্থীর জিভের সকল পর্য্যায়ে দ্রুত সঞ্চালনের জন্য,

ই	←	উ	ই	→	উ
↓		↑	↑		↓
এ		ও	এ		ও
↓		↑	↑		↓
অ্যা		অ	অ্যা		অ
→	আ	→	←	আ	←
ই	→	উ	ই	←	উ
↑					↑
এ	←	ও	এ	→	ও
		↑	↑		
অ্যা	→	অ	অ্যা	←	অ
↑					↑
আ					আ

স্বরবর্ণের এই উচ্চারণগুলি যথাবিধি মুখগহ্বর ও ওষ্ঠদ্বয়ের অবস্থান সহ দ্রুত

পরিক্রমা (তীর চিহ্নিত নানা পথে) করণীয়। আ অ ও উ ই এ অ্যা অ্য,আ অ্যা এ ই উ ও অ আ, আ অ্যা অ ও এ ই উ, আ অ অ্যা এ ও উ ই এইরকম ভাবে। কণ্ঠের তীব্রতা বাড়িয়ে এবং না বাড়িয়ে এবং স্বরক্ষেপণের বিভিন্ন পর্য্যায়ে দাঁড়িয়ে (লিপটাং, অ্যাবডোমেন্, ন্যাজাল্) নানা স্বরে নানা গতিতে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলিয়ে ঠোঁট মুখগহ্বর জিভের নানা অবস্থানের ব্যায়াম চালানো উচিত।

অনুরূপভাবে, বাধার বিভিন্ন প্রকৃতি ও স্থান পরিক্রমার জন্য

ক খ গ ঘ

চ ছ জ ঝ

ট ঠ ড ঢ

ত থ দ ধ

প ফ ব ভ

প্রথমে আনুভূমিক ভাবে ও পরে উলম্বভাবে দ্রুত উচ্চারণ করা উচিত। উলম্বভাবে উচ্চারণকালে ক চ ট ত প, খ ছ ঠ থ ফ'র তুলনায় গ জ ড দ ব, ঘ ঝ ঢ ধ ভ তীক্ষ্ণতার দিক থেকে নিম্নস্তরে থাকবে। তার দ্বারা যে কেবল ঘোষ-অঘোষের পার্থক্য সূচিত হবে তাই নয়, স্বর বা ধ্বনির বৈচিত্র্যও যথাযথ কণ্ঠে উঠে আসবে। তেমনি ক চ ট ত প'র তুলনায় খ ছ ঠ থ ফ এবং গ জ ঢ দ ব'র তুলনায় ঘ ঝ ঢ ভ'র উচ্চারণে প্রাণবায়ু একটু বেশী জোরালভাবে প্রকাশিত হবে। অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণের এই তারতম্যও কণ্ঠে যথাযথ অভ্যাস করা দরকার। কেবল পুঁথিগত বা অনুশীলনগত বিষয় হিসেবে এসব জানলেই চলবে না। পৌনপুনিক অভ্যাসে এই সব ধ্বনির বৈচিত্র্যও যথার্থ উপলব্ধি করতে হবে নিজ কণ্ঠ ও কানের মিলন ঘটিয়ে। তারই জন্য বিভিন্ন স্বরক্ষেপণ স্তরে ও বিভিন্ন পর্দায় উপরোক্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি বেশ আনন্দদায়ক খেলার মতো অভ্যাস করতে হবে যাতে স্বরের যে কোনো স্তরে এই ধ্বনিবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা যায়।

আমাদের উদ্দেশ্য তো ব্যাকরণ পড়া নয়। আবৃত্তি নামক একটা সুচারু শিল্পসৃষ্টি করা। এইসব আপাতনীরস তত্ত্বের পথ ধরে সেই রমণীয়তার দিকেই আমাদের যাত্রা।

ধ্বনিবিজ্ঞান নির্দ্দেশিত পথে বর্ণগুলির যথাযথ উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে হবে। সেই অনুযায়ী যার যে উচ্চারণে দুর্ব্বলতা সেটি সঠিকভাবে নির্ণয় করে, তার শুদ্ধরূপের পৌনপুনিক অভ্যাসের দ্বারা ত্রুটি

সংশোধন করতে হবে। ধ্বনিবিজ্ঞানের নানা গবেষণা হয়ে চলেছে এ জাতীয় ত্রুটি সংশোধনের সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সন্ধানে। সে সবের খোঁজ রাখতে পারলে আবৃত্তি শিখতে ও শেখাতে কিছু সুবিধে নিশ্চয়ই হবে। তেমনি একটি পদ্ধতি এই রকম,

যার যে বর্ণটি উচ্চারণে ত্রুটি রয়েছে, প্রথমে তাকে সেই বর্ণটির উচ্চারক অঙ্গগুলির ব্যবহার প্রাথমিকভাবে শিখিয়ে নেওয়ার পর ওই বর্ণটি মৌলিক স্বরগুলির আগে-পরে বসিয়ে অভ্যাস করালে দ্রুত ও নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ কারো যদি 'ধ' উচ্চারণে ত্রুটি থাকে, তবে

ধ্ + অ = ধ   এবং অ + ধ্ = অধ্

ধ্ + ই = ধি   এবং ই + ধ্ = ইধ্ ইত্যাদি।

ধী → ধু			ইধ্ → উধ্	
↑	↓		↑	↓
ধে	ধো	এবং	এধ্	ওধ্
↑	↓		↑	↓
ধ্যা	ধ		অ্যাধ্	অধ্
↑	↓		↑	↑
← ধা —			← আধ্ —	

এইভাবে বিভিন্ন আবর্তনে অভ্যাস করতে হবে।

বর্ণের উচ্চারণ-শুদ্ধতার পরেই আসে শব্দ উচ্চারণে শুদ্ধতা অশুদ্ধতার প্রশ্ন। এই পর্য্যায়টি সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত করে বেশী কথা বলবার উপায় নেই। কারণ, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাকরণের অকুণ্ঠ নির্দেশ পাওয়া যায়, বাকি ক্ষেত্রে এখনও পর্য্যন্ত বৈয়াকরণরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি, যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রচলিত, এমন কি একই অঞ্চলে শিষ্টজনের উচ্চারণও সমতা রাখে না। যেমন, স-ম-য়্ হবে, না সোময়্ হবে? বোনানী হবে, না ব-নানী হবে?

এক একজন এক-এক উচ্চারণে অভ্যস্ত, অন্যরকম উচ্চারণ শুনলেই তাঁর অস্বস্তি হয়, তখন যে যার পক্ষ সমর্থনে একটা যুক্তি খাড়া করতে সচেষ্ট হন, যার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণের নির্দেশ প্রায় কিছুই থাকে না। যথার্থ বিবর্তন ও ব্যাপ্তি মেনে নিয়ে উচ্চারণের কোনো সম্পূর্ণ ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় আজও প্রকাশিত হয় নি। উচ্চারণের শুদ্ধতার চর্চা নিঃসন্দেহে

আবৃত্তি-চর্চার অন্যতম অঙ্গ, কিন্তু যেখানে শুদ্ধতার প্রশ্নে সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোনো সমাধান নেই, সেখানে প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অভ্যাসের এলার্মে শ্রবণযন্ত্রটি দম দিয়ে রেখে আবৃত্তি শুনতে ও শেখাতে বসেন তাতে কেবল রসগ্রহণে বাধা ও বৃথা তর্কে সময়ের অপচয়ই হবে। যেখানে এরকম নির্দ্দিষ্টতার অভাব, সেক্ষেত্রে প্রচলিত সকল উচ্চারণই মেনে নেওয়া সমীচীন। তেমনি আবার যে ক্ষেত্রে বৈয়াকরণরা নির্দ্দিষ্ট সূত্র খুঁজে বার করেছেন বা করছেন সেগুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যেমন, অ' ধ্বনির 'ও' রূপান্তরের সূত্রগুলি। সম্প্রতি এসব বিষয়ে কিছু সূত্রবদ্ধ উপস্থাপন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে, সেগুলি সংগ্রহ করা উচিত।

উচ্চারণের শুদ্ধতার অভ্যাসের পরেও আরও একটা পর্য্যায় আছে। সেটিই প্রকৃতপক্ষে আবৃত্তিতে উচ্চারণ-শিক্ষা। তাকে আমরা 'উচ্চারণ ব্যঞ্জনা' বলে অভিহিত করবো।

আমরা জানি, শব্দের একটা নিজস্ব অভিধানগত অর্থ আছে। কোনো কোনো শব্দের একাধিক অর্থও আছে। আবার কবিতা সম্পর্কিত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ-ও জেনেছি যে ভাষার মধ্যে বিভিন্ন বিন্যাসের ফলে শব্দ তার নিজস্ব অর্থকে ছাপিয়ে কিংবা কখনো নিজস্ব অর্থ বদলে নিয়ে ভিন্নতর, ব্যাপকতর অনুভবে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। শব্দ বা বাক্যমধ্যে তার বিন্যাসের যে প্রক্রিয়ায় এরকম ঘটনা ঘটে, সেটা কবির হৃদয়ে বা মেধায় জন্ম নিয়ে লেখার অক্ষরে কাগজে প্রকাশ পায়। এবং একটি শব্দ বা কোনো শব্দসমষ্টি যখন এই প্রকার দ্যুতি বা গতি পায়, সেটা পাঠক হিসেবে আমরা চোখ দিয়ে দেখি এবং আমাদের হৃদয় বা বুদ্ধির কাছে কোনো না কোনো আকার-প্রকারে পৌঁছয়।

কবি মাত্রেই কবিতায় শব্দবিন্যাসের সময় মনে মনে কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, পাঠক মাত্রেই নয়নেন্দ্রিয় ব্যবহারে কবিতা পড়লেও মনে মনে কণ্ঠ ও কর্ণেরও মিলন ঘটিয়ে নেন,—এই সব বহুশ্রুত জনমত মেনে নিয়েও, উপরের আলোচনা থেকে একটা কথা নিশ্চয় স্পষ্ট ধরা পড়বে যে, শব্দের এই যে কারিগরীর কথাটা বলা হ'ল, সেটার সৃষ্টি বা সঞ্চারণের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আমাদের বাগাঙ্গগুলির ব্যবহারের ও সেই ব্যবহারজাত শ্রুতিলব্ধ অভিজ্ঞতার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এই সব কথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল, ভাষার মধ্যে শব্দকে ব্যবহার বা বিন্যস্ত করার যে কৌশলে একজন কবি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন বা কবির গভীরতর

মনন ও অনুভব বা কল্পনায় জারিত হলে যে কৌশলে শব্দ দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হয় ব্যঞ্জনা, সেই দক্ষতা কিংবা প্রতিভা, তা শব্দের ব্যবহার বিষয়ে হলেও, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার। আবৃত্তির ক্ষেত্রে উচ্চারণ-ব্যঞ্জনা ব্যাপারটা পরিপূর্ণরূপে আবৃত্তিকারের উচ্চারক অঙ্গগুলির সঞ্চালন ও স্বরের বিন্যাস দিয়ে গড়তে হয়। এবং সে কৌশলেরও জন্মদাতা আবৃত্তিকারের হৃদয় ও মগজ বা আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে তার কল্পনাপ্রতিভা ও মননশক্তি।

তাই, কবিকৃত কোনো সার্থকতম ব্যঞ্জনাময় শব্দজোড় বা পংক্তিকেও কেবল শুদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণে বলে গেলেই আবৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় না। যাঁরা মনে করেন, কবিকৃতির মধ্যে শব্দ যদি যথার্থ ব্যঞ্জনা পেয়ে থাকে তবে কেবল নিষ্কম্প্র সুচারুকণ্ঠে শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ে গেলেই আবৃত্তি ত আপনি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠবে, তাঁদেরই কবিতা-উচ্চারণ নিতান্ত একমাত্রিক পাঠে পরিণত হয়। আবৃত্তি বলতে যে বর্ণময় বহুমাত্রিক শ্রুতিরূপ বোঝায়, তা সম্ভব হয় না। বলাবাহুল্য, এঁদের সাহিত্যবোধ যথেষ্ট উন্নত হলেও, আবৃত্তিবোধ একেবারেই নেই।

উচ্চারণব্যঞ্জনা যে সার্থক আবৃত্তির অন্যতম গুণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এই প্রক্রিয়া কিন্তু মোটেই কাব্যপংক্তির মধ্যস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দটিকে অধোরেখ করার মত কেবল কিছুটা চাপ দিয়ে বা শ্বাসাঘাত দিয়ে কড়া করে উচ্চারণ করা নয় বা একটি পংক্তির সাবলীল গতিময় প্রক্ষেপণের মধ্যে কেবল ওই শব্দটিকে উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন ইচ্ছাকৃত স্বল্পতম ছেদ সৃষ্টি করাও নয়। উচ্চারণের এরকম প্রবণতায় কোনো ব্যঞ্জনা সৃষ্টি তো হয়ই না বরং স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দের ধ্বনিরূপটিতে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। উচ্চারণব্যঞ্জনা ব্যাপকতর অনুশীলন ও গভীরতর মনন ও কল্পনার ফসল।

উচ্চারণব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য কবিতা বা কাব্যপংক্তির বাইরেও, শব্দ সম্বন্ধে আবৃত্তিকারের অনুভব ও মনন থাকা দরকার। এবং সেই শব্দই আবার বিভিন্ন বাক্যে বিন্যস্ত হলে যে দ্যুতি বা গতি পায় সেই নব্যচ্ছটার অনুভবেও বিদ্ধ হতে পারা চাই। তারপর সেই অনুভবকে রূপান্তরিত করতে হবে নিজস্বমাধ্যমে। অনুশীলিত উচ্চারণ-যন্ত্র ও স্বরক্ষেপণ-যন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগে যথার্থ মেপে ধরতে হবে অনুভব।

শিল্পশিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই, বিভিন্ন পর্যায়ে অনুভব আর কলাকৌশলকে মেলাতে পারাটাই হ'ল অনুশীলনের বিষয়। কিন্তু একজনের সংবেদনশীলতা পুরোপুরি বাইরে থেকে গড়ে দেওয়া যায় না। অনেকটাই থাকে তার নিজের

মধ্যে এবং সে ব্যাপারটা কার মধ্যে কী ভাবে বিকাশ লাভ করে, কতটা তার রক্তের ব্যাপার কতটা ব্যক্তিগত মানসিক গঠনের—এসব ব্যাপারে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা হচ্ছে বা হবে। শিল্পের শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন কিছুটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে আমাদের এগোতে হয়। লক্ষ্যণীয় এই যে, সেই রাস্তায় যেন প্রার্থিত কলানৈপুণ্য ও অনুভবশক্তির প্রসার হাত ধরাধরি করে এগোয়।

এবার দেখা যাক, উচ্চারণব্যঞ্জনা বলতে আমাদের এই কণ্ঠস্বর এবং জিভ, দাঁত, ঠোঁট ইত্যাদি দিয়ে আমরা শ্রুতিমাধ্যমে কী উপহার দিতে চাই শ্রোতাদের।

একটি শব্দকে উচ্চারণের মাধ্যমে যখন আমরা তার অর্থকে ছুঁতে চাই বা কোনো অনুভব জাগিয়ে দিতে চাই বা কোন চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চাই, তখনই বলা চলে সাদামাটাভাবে শব্দটির কেবল শুদ্ধ উচ্চারণ করার বদলে উচ্চারণে একটা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেষ্টা করছি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'দূর' শব্দটি।

১। লোকটা যাচ্ছে দূরের থেকে দূরে

২। দূরে গেলে দূরে থাকা হয়/কাছে এলে কাছে

৩। দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন

৪। ওরা তো সব দূরের মানুষ তুমি আপনজন

৫। দূর হোক্ গে বালাই

এই সব ক'টি ক্ষেত্রেই কি 'দ' ও 'র' এর বর্ণানুগ শুদ্ধ উচ্চারণ করে গেলেই শব্দগুলির যথার্থ ব্যঞ্জনা শ্রুতিমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে? না কি সেভাবে উচ্চারণ করলেও বাক্যের অর্থানুযায়ী 'দূর' শব্দের বিভিন্ন দ্যোতনা আপনি প্রকাশ পাবে? অথবা কি স্বভাবগত স্বাচ্ছন্দ্যে যে কোনো বাঙালীই এর যথাযথ উচ্চারণ করবেন?

স্বাভাবিকতার প্রশ্নকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা না করেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, আবৃত্তিকারের কাজ অত্যন্ত চকিতে সারতে হয় এবং অত্যন্ত শিল্পিত চেহারায় তাঁর প্রকাশকে দাঁড় করাতে হয় সেই স্বল্প অবকাশে। যেমন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা বলেই আমরা দৈনন্দিন ভাব প্রকাশ করি বটে, তবু আমাদের দৈনন্দিন স্বরগ্রাম ও স্বরের স্থানগুলিকে কাজে লাগিয়েই আমরা আবৃত্তিতে স্বরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারি না। তার জন্য স্বরের উন্নততর অনুনাদ, স্বরগ্রামের আরও বিস্তার ও স্বরের অধিকতর সূক্ষ্মতার দিকে আমাদের যেতে

হয়। উচ্চারণের সময়ও আমরা সেই স্বাভাবিকতাকেই কখনো বিস্তার করবো, কখনো তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মতর করে তুলবো, কখনো সাধারণের তুলনায় বাড়তি যে অনুভব আমরা শিল্পী হিসেবে পেয়ে যাই শব্দ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার সময়, তাই হবে আমাদের কৌশলের ভিত্তি।

উপরের বাক্যগুলিতে 'দূর'কে দূরত্ববোধক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র প্রথম ও তৃতীয় বাক্যে। কিন্তু প্রথম বাক্যের দুটি 'দূর' যেন একটি ছবি আঁকতে চাইছে। একটা লোকের ক্রমাগত অপস্রিয়মানতার ছবি। সে ক্ষেত্রে, প্রথম দূর-কে একটু উঁচু পর্দায় কোমল স্বরে উচ্চারণ করে একটা স্বল্প গতিময়তার মধ্যে আর একটু ওপরের কোমল ছুঁয়ে মীড়সহ ফিরে এসে পরবর্তী 'দূর'-টিতে গিয়ে পড়া এবং একই কোমল স্বর ব্যবহার করে পরবর্তী দূরটি উচ্চারণ করা— এই ভাবে অপস্রিয়মান মানুষটির ছবি ফুটে ওঠে চকিতে। অথচ একই অর্থবোধক তৃতীয় বাক্যের 'দূর' অপেক্ষাকৃত স্থির। কেবল মধ্য পর্য্যায়ের কোনো পর্দায় স্থির ও বিস্তৃতভাবে উচ্চারণ করলেই সেখানে তফাতে থাকার প্রসঙ্গটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অর্থটি স্পষ্ট হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতজনিত চাপ একেবারেই নেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আছে, বাক্যের প্রথম শব্দের ওপরে যতটুকু থাকতে হয়, ততটুকুই।

দ্বিতীয় বাক্যে 'দূর' অর্থে মানসিক নৈকট্যের অভাব। এটা শুধুই অর্থবোধক নয় বরং একটা অভিমানী অনুভবে সংবেদনময়! সে অনুভব বোঝানোর জন্য অপেক্ষাকৃত নীচু পর্দায় কোমল স্বর ব্যবহারই উচিত 'দূর' শব্দের উচ্চারণে। এবং দূ ও র-এর ফাঁকের স্বরটুকু যেন নিম্নগামী হয়ে দূ এর তুলনায় র-তে স্বর আরো খাদে নেমে আসে। বাক্যের প্রথমে থাকা সত্ত্বেও 'দ' এর ওপর শ্বাসাঘাতজনিত কোনোই চাপ চলবে না। এখানে উচ্চারণের এই কৌশল দিয়ে একটা অনুভব জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা গেল।

চতুর্থ বাক্যে 'দূর' অনাত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'দূর' শব্দে তার নিজের অর্থ না বুঝিয়ে এই অনাত্মীয়তা বোঝাতে চাইলে প্রথমেই বাক্য মধ্যে থাকা সত্ত্বেও 'দূ' এর ওপর শ্বাসাঘাতজনিত একটা চাপ আসবে। সেই চাপেই 'দূরের' উচ্চারণে স্বল্প দ্রুততার আভাসও আসবে। এই উচ্চারণ লিপ্ট্রাং-এর উপরের দিকের পর্দায় এইভাবে করলে, 'অনাত্মীয় অতএব তুলনায় কম আদরণীয়' এই ভাবটি অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশ পাবে।

পঞ্চম বাক্যে 'দূর' শব্দে এ পর্যন্ত আলোচিত উদাহরণ কয়টির মধ্যে সবচেয়ে

বেশী শ্বাসাঘাত পড়বে। তা কেবল বাক্যের প্রথমে বলেই নয় 'দূর' শব্দে অনুভবের তীব্রতা বোঝাতেও। এখানে 'দূর' পরিত্যাগ করার প্রবল অনুভবে বিধৃত। মধ্য, নিম্ন বা উচ্চ যে কোনো পর্দাতেই ক্ষেত্রবিশেষে এর উচ্চারণ হতে পারে। শ্বাসাঘাতের চাপ্‌টি কিন্তু হসন্ত র্‌ তে এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী একটা ছেদের সৃষ্টি করবে। 'দূ'-এর 'উ'র দীর্ঘত্বটি এখানে বেশ কাজে লাগবে।

এইরকম সূক্ষ্ম কৌশলের মধ্যে দিয়ে শব্দের উচ্চারণে অর্থ, অনুভব বা ছবি ফোটানোর যে খেলা তাকে আমরা উচ্চারণের অর্থ বা ভাবব্যঞ্জনা বলবো। কারণ অর্থ বা ভাবের দিক দিয়ে এক একটি শব্দ উজ্জ্বল করে তোলা এর উদ্দেশ্য।

উচ্চারণে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির আর একটি ভূমিকা আছে, তা সর্বদা একটি শব্দে ঘটে না বরং শব্দসমষ্টি বা শব্দসমবায়ে তাকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়। তাকে আমরা উচ্চারণের ধ্বনিব্যঞ্জনা বলবো। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে ভাব-ব্যঞ্জনার অনুশীলন বিষয়ে আরও দু একটি কথা বলা দরকার।

শব্দ বিষয়ে যে যার নিজস্ব অনুভব দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ধরা যাক্, 'সুন্দর' শব্দটি। একজন অনুশীলনকারী শব্দটির নানা অনুষঙ্গ ভেবে নিতে পারেন। যেমন (১) একটি সুন্দরীর আবির্ভাবে মন বলে উঠল, (২) গোলাপের গন্ধ নাকে আসা মাত্র, (৩) কোনো একটি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে দেখে, ইত্যাদি যার মাথায় যে রকম আসে। যে কোন একটা অনুভব থেকে বা ভিন্ন ভিন্ন অনুভব থেকে বা কোনো অনুষঙ্গ ছাড়াই শব্দটি সম্বন্ধে স্বাভাবিক ধারণা থেকে শব্দটির উচ্চারণ করে দেখতে হবে এবং যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা যাতে বারে বারে উচ্চারণ করলে প্রতিবারই হয়, সে চেষ্টা থাকবে। যখন একটা অনুভবজাত উচ্চারণ বারবার অভ্যাসে নির্দিষ্টতায় পৌছল, তখন প্রথমে দেখতে হবে শব্দটিতে কয়টি সিলেব্‌ল্‌? সেইভাবে ভেঙে,

(১) উচ্চারণকালে কোন্‌খান্‌ থেকে স্বর কোন্‌খানে যাচ্ছে, তা দেখতে হবে।

(২) সিলেব্‌ল্‌ গুলির কোন্‌খানে কখন্‌ স্বরাঘাত (stress) পড়ছে বা পড়ছে না, তা নির্ণয় করতে হবে।

স্বরের গতিবিধি ও উচ্চারণের ঝোঁক-এর তারতম্য এই দুইয়ের সমবায়েই গড়ে উঠছে ওই উচ্চারণরূপ। এই করণকৌশল ঠিকভাবে বুঝে নিতে পারলে

যে কোন সময় শব্দটি উচ্চারণ করে একই ব্যঞ্জনা প্রকাশ অনিবার্য্যভাবেই সম্ভব হবে। এখানেও গ্রুপ-ওয়ার্ক খুব ফলপ্রসূ। একজন একটা অনুভব থেকে শব্দকে উচ্চারণ করলেন। যদি তিনি প্রকৃত কোনো অনুভব থেকে উচ্চারণ করে থাকেন তবে তার দরুণ একটা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হবেই। অন্যেরা কেবল শুনে বলবেন, কোনোরকম 'ব্যঞ্জনা' হল কি না। যদি তা না হয়, তবে বুঝতে হবে উচ্চারণকারী তাঁর অনুভবের উপযোগী উচ্চারণ-প্রকরণ খুঁজে পান নি। তাঁকে আরো চেষ্টা করতে হবে। এরপর উচ্চারণকারী স্বরের গতিবিধি ও উচ্চারণের ঝোঁক ব্যাখ্যা করবেন এবং বারংবার সেই মতো উচ্চারণ করে দেখাবেন—একই রকম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হচ্ছে কি না। অন্যেরা কানে শুনে বর্ণিত করণকৌশল ও শ্রুতিরূপের সমতা যাচাই করবেন।

এই প্রক্রিয়াটি কণ্ঠে করে না দেখালে বোঝানো প্রায় অসম্ভব। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক্। 'সুন্দর' শব্দটি কোনো শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্চারণ করলাম্। এই শব্দে দুটি সিলেব্‌ল্ সুন্+দর্।

সুন্ · দ—র্

ন্যাজালের একটি কোমল পর্দা থেকে স্বর শুরু হয়। তার ঠিক নীচের কোমল-পর্দায় নেমেই 'ন্' উচ্চারণকালে অ্যাব্‌ডোমেনের একটি পর্দাকে 'কড' হিসেবে ছোঁয়া হয়। তারপর দর্—এই সিলেব্‌ল্টিতে গলা কেবল অ্যাবডোমেনের ওই স্বর থেকে বা তার নীচের একটি স্বর থেকে মীড়সহ আরো একটু গড়িয়ে নামে। প্রথম সিলেব্‌ল্টি একেবারেই ঘাত ছাড়া উচ্চারিত হয়, দ্বিতীয় সিলেব্‌ল্ এর শুরুতে অ্যাব্‌ডোমেনের স্বরে মৃদু ঘাত পড়ে; সেটা যেন ঠিক ঘাত নয়, স্বরটিরই ঘনতর অনুনাদ।

এইভাবে। আবার 'সুন্দর' শব্দটিই অন্য কোনো অনুভব থেকে উচ্চারিত হলে তার শ্রুতিরূপ বদলে যাবে।

কমপক্ষে হাজারখানেক শব্দ নিয়ে একের পর এক এরকম অনুশীলন দীর্ঘদিন ধরে চালালে আবৃত্তিকার উচ্চারণ প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করবেন, পাশাপাশি শব্দ ও তার ধ্বনিরূপ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা বাড়বে।

উচ্চারণে ব্যঞ্জনাসৃষ্টির এই অনুশীলন অত্যন্ত আনন্দদায়ক অনুভবলব্ধ ও স্বাধীন একটি খেলা। ব্যক্তিগত মনন, রুচি, অনুভব, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি অনুযায়ী শব্দের নানা অনুভব নানা ব্যক্তির থাকতে পারে। এমন কি কাব্যের পংক্তিমধ্যস্থ নানা শব্দও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন অনুভব বা একই অনুভবের

ভিন্ন মাত্রা আনতে পারে। তাই এ বিষয়ে চর্চার সময় কারো কৌশল অন্য কারো ওপর চাপিয়ে না দিয়ে তার অনুভবজাত কৌশলটির উপযুক্ততা বিচারই তাকে সহায়তা করার যথার্থ পথ। শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক কখনো আপন অনুভব ও কৌশল অন্যের ওপরে চাপাবেন না। একই বাক্য বা কাব্যপংক্তিতে একাধিক শব্দে ব্যঞ্জনা করা যায়। পংক্তিমধ্যস্থ কোন্ কোন্ শব্দে ব্যঞ্জনা হবে তা যে যার রুচিমতো স্থির করতে পারেন। আবার ভিন্ন ভিন্ন জন পংক্তিটির নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দাবলীতে ব্যঞ্জনাসৃষ্টির কাজ করলে তাদের ক্রিয়াকৌশল আলাদা আলাদা হতে পারে। কেবল চর্চার সময় আলোচ্য বা শ্রোতব্য এই যে, শব্দটির প্রতি প্রযুক্ত কৌশলের ফলে সেটি যেন সমগ্র বাক্য থেকে, ভাবপ্রবাহ থেকে, ছন্দপ্রবাহ থেকে ছিঁড়ে না বেরিয়ে আসে—সামগ্রিক বক্তব্য বা রস ইত্যাদির সঙ্গেও সংগতি রেখে যেন অলঙ্করণটি করা হয়। তাছাড়াও, লক্ষণীয় যে ব্যঞ্জনা সত্যিই সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। একজন কেবল পংক্তিটি কণ্ঠে উচ্চারণ করলেই অন্যেরা ধরতে পারছেন কি না যে তিনি কোন্ কোন্ শব্দে ব্যঞ্জনা করছেন।

এই অনুশীলনের জন্য বাক্য বা কাব্যপংক্তি খাতায় লিখে যে যার বোধবুদ্ধি মতো শব্দগুলি অধোরেখ করে সেই সেই শব্দে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত। গ্রুপ-ওয়ার্ক হিসেবে এ কাজের অভ্যাস কিছুটা সুবিধাজনক।

এই অনুশীলনের সময় আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে যে একটি বাক্যের সামগ্রিক অভিব্যক্তি ও একটি শব্দে উচ্চারণব্যঞ্জনায় পার্থক্য আছে। উচ্চারণ-ব্যঞ্জনা করতে গিয়ে তা যেন বাক্যের সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে পরিণত না হয়। অর্থাৎ যে যে শব্দে ব্যঞ্জনা করা হচ্ছে, তার ছাপ যেন তারই গায়ে লাগে, পংক্তির সব ক'টি শব্দ যেন সেই একই রঙে একাকার না হয়ে যায়। যেমন,

আকাশ তবু **সুনীল** থাকে
মধুর ঠেকে ভোরের আলো

(রবীন্দ্রনাথ)

পংক্তিটিতে নিশ্চয় সামগ্রিক অভিব্যক্তি হিসেবে আত্মতৃপ্তির চিরানন্দময়তার প্রকাশ থাকবে, কিন্তু অধোরেখাঙ্কিত শব্দদুটিতে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সময় 'সুনীল'এর মধ্য দিয়ে নীলের নিবিড় অনুভব ও 'মধুর' এর উচ্চারণে ভালোলাগার যে

অনুভূতি তা যেন ছড়িয়ে থাকা ওই আনন্দমূর্তির ওপরে দুটি স্বতন্ত্র অলঙ্কার বলে আলাদা করে শোনা যায়, বোঝা যায়। তবেই উচ্চারণ-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হ'ল, নচেৎ নয়।

এই অনুশীলন অনিঃশেষ। প্রতিদিন নতুন নতুন কবিতার, বিভিন্ন কবিদের রচিত নানা পংক্তি তুলে নিয়ে তন্মধ্যস্থ বিশেষ বিশেষ শব্দ নির্বাচন ও অধোরেখ করে এই চর্চা অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে। ক্রমে চর্চাকারী শব্দ উচ্চারণের নব নব কৌশল আবিষ্কার বা সৃষ্টি করতে পারবেন ও কৌশলগুলির সঙ্গে সামগ্রিক কাব্যের সামঞ্জস্যবিধানের সম্পর্কটি বুঝে নিতে পারবেন। অন্য-দিকে কবিতায় আধারিত শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে এই সচেতনতার ফলে আবৃত্তিকারের (ব্যক্তিগত) কবিতা আস্বাদনের চলিত অভ্যাসেরও কিছু পরিবর্তন ঘটবে। সে আস্বাদনেরও প্রতিটি মুহূর্তই আরো সৃষ্টিমনস্ক হয়ে উঠবে।

অনুশীলনের উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিভিন্ন তাল-লয় ও ভাবের কাব্যপংক্তি উদ্ধৃত করছি। অধোরেখাঙ্কিত শব্দগুলি আমার বিবেচনায় ব্যঞ্জনাসম্ভব। চর্চাকারী নিজের অনুভব ও বোধবুদ্ধি অনুযায়ী এগুলির বদল ঘটিয়েও নিতে পারেন।

কাছে এল পূজার ছুটি,
রোদ্দুরে লেগেছে **চাঁপাফুলের** রং।
(ছুটির আয়োজন, রবীন্দ্রনাথ)

হিজলের **ক্লান্ত** পাতা বটের **অজস্র** ফল **ঝরে** বারে বারে
তাহাদের **শ্যাম** বুকে ;…
(রূপসী বাংলা, জীবনানন্দ দাশ)

এল ওরা লোহার **হাতকড়ি** নিয়ে
নখ যাদের **তীক্ষ্ণ** তোমার নেকড়ের চেয়ে
(আফ্রিকা, রবীন্দ্রনাথ)

ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে **আকাশ** মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের **সব** রাত্রিকে ওরা কিনেছে **অল্প** দামে,…
(রাণার, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য)

আমি পরশুরামের **কঠোর** কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব
আনিব **শান্তি শুভ্রা** উদার।
(বিদ্রোহী, নজরুল ইসলাম)

ওরে **শাওনমেঘের ছায়া** পড়ে **কালো** তমাল মূলে
ওরে এপার ওপার **আঁধার** হল কালিন্দীরই কূলে।
(জন্মান্তর, রবীন্দ্রনাথ)

গোটা পৃথিবীকে **গিলে** খেতে চায় সেই যে **ন্যাংটো** ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার
লড়াই চলছে চলবে।
(রাজা আসে যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বহুকালের **সাধ** ছিলো, তাই কইতে কথা **বাধছিলো**
(একটি পরমাদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

প্রাথমিক অনুশীলনের সময় একটি রেখাঙ্কিত শব্দের উচ্চারণব্যঞ্জনা এক রকমের করলেই চলবে। পরে পরে, একটি শব্দেই একাধিকরকম উচ্চারণ-কৌশল সম্ভব কিনা চিন্তা করে ও প্রয়োগ করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠটি নির্বাচন করতে হবে। তবে সাধারণভাবে উচ্চারণের অর্থ বা ভাব-ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি এইরূপ হওয়া উচিত :

প্রথমে কবিতা বা কাব্যপংক্তি বার বার নিবিষ্ট হয়ে পড়তে থাকতে হবে। বার বার। পনের, কুড়ি, পঁচিশবার। পংক্তিমধ্যস্থ কোনো কোনো শব্দ আলাদাভাবে অনুভবে আসছে কি না দেখতে হবে। না কি সব ক'টি শব্দই একইরকম ঢেউ তুলছে? সমান্তরাল? তা যদি হয়, তবে কোনো শব্দের উচ্চারণে অর্থব্যঞ্জনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যদি কোনো শব্দ অনুভবে অন্যভাবে ধরা দেয়, তবে পংক্তিটি উচ্চারণ করতে থাকতে হবে পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে। যে যে শব্দে অনুভব ঘন হয়ে রয়েছে, স্বভাবতই উচ্চারণে সেগুলি আলাদা করে জেগে উঠবে অনুভবসহ। সেই শব্দের উচ্চারণে আপনি একটা বৈশিষ্ট্য আসবে। এবার কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের ঠিক কী কৌশল সেখানে কাজ করছে খুঁজে দেখতে হবে। শব্দটির সিলেবলগুলি ভাগ করে ফেলে, কোন্

সিলেব্‌ল্-এ কতটা চাপ পড়ছে, কেমনভাবে পড়ছে, কোথায় সিলেব্‌ল্‌গুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে কোথায় সংশ্লিষ্ট থাকছে, শব্দটির উচ্চারণে স্বরের গতিবিধি — কোথায় কোন্ স্বর থেকে কোন্ স্বরে গড়িয়ে নামছে বা কোথায় কম্পন লাগছে কোথায় কোমল পর্দা বা মীড়, গমক, কোথায় একাধিক পর্দাকে কণ্ঠ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি কৌশল ঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে। তখন, এই অনুভবজাত কৌশলটিকেই বার বার অনুশীলনের দ্বারা পাকাপাকি গেঁথে ফেলতে হবে। অন্যসময় ওই পংক্তি আবৃত্তি করতে হলে, ওই শব্দে শব্দে এই কৌশলগুলি প্রয়োগ করেই আবার অনুভবের সামীপ্যে ফিরে আসতে হবে।

আবার কখনো-বা এই শ্রমলব্ধ উচ্চারণস্থাপত্য ভেঙে ফেলে, শব্দটি অন্য কোনোভাবে উচ্চারণ করে অনুভবের গাঢ়তা বা তরলতা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আবার হয়তো নতুন কোনো কৌশল ধরা দেবে। এইভাবেই উচ্চারণের অর্থ-ব্যঞ্জনার দিক থেকে কবিতা বা কাব্যপংক্তির আবৃত্তি ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর সুন্দরতর হয়ে উঠবে মনন ও অনুশীলনের পাথরে শাণিত হতে হতে। কেবল নিজের উচ্চারণ কৌশলের এইরূপ অনুশীলনই যথেষ্ট নয়, বড় আবৃত্তিকারদের আবৃত্তি শোনার সময়ে, দক্ষ ও সুশিক্ষিত অভিনেতাদের সংলাপ শোনার সময়ে, এমন কি চারপাশের মানুষজনের কথাবার্তার ভেতরেও উচ্চারণে অনায়াস যে ব্যঞ্জনা ঘটে যায় সে বিষয়ে কান ও মনকে সজাগ রাখলে, এবং সেই ব্যঞ্জনাগুলিকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার অভ্যাস করলে, তা এই চর্চায় একটা বাড়তি অধ্যয়নের কাজ করে এবং নিঃসন্দেহে উচ্চারণ চর্চাকারীর মনন ও কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে। অবশ্য এই সব পরামর্শকে কেবল পুঁথিগত ভাবনা হিসেবে ধরে নিলে চর্চাকারীর আবৃত্তিতে কোনোই প্রভাব পড়বে না বা উন্নতি লক্ষ্য করা যাবে না। এর প্রতিটি ধাপ একান্ত বাস্তবভাবে পালন করতে পারলেই কেবল, আবৃত্তিতে প্রার্থিত নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যাবে। এবং যাবেই। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে অন্যের আবৃত্তি উপভোগেও এই শিক্ষা অন্য মাত্রা আনবে

এবার উচ্চারণের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কাজের পরবর্তী ধাপ—ধ্বনিব্যঞ্জনার কথায় আসা যাক্।

কিছু কিছু কাব্যপংক্তি এমন থাকে যার মধ্যে কোনো শব্দই আলাদাভাবে অনুভব বা অর্থের দিক থেকে তেমন বিশিষ্ট মনে হচ্ছে না। তখন গোটা পংক্তির সব ক'টি শব্দ কেবল বাক্যগত সংহতির দিকে খেয়াল রেখে বলে গেলেই যথেষ্ট

হবে। যখন কোনো শব্দ তেমন বিশেষ অনুভবে রঞ্জিত হয়ে উঠবে, তার জন্য অর্থ বা ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির যত্ন নিতে হবে।

কিন্তু এছাড়াও আর একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে একটি বা দু'টি শব্দ পৃথকভাবে কোনো অনুভব জাগায় না বা সৃষ্টির প্রেরণা দেয় না, কিন্তু শব্দগুচ্ছ অর্থাৎ কয়েকটি শব্দ একত্রে উচ্চারিত হলে তার সম্মিলিত অনুরণনে বা সংবেদনে একটা অনুভব বা ছবি বা অর্থ গড়ে তোলে। সেখানে একক শব্দের অনুভব বা শব্দগুলির বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থটাই কেবল ব্যঞ্জনাসৃষ্টির ভিত্তি নয়, শব্দপুঞ্জে বেজে ওঠা ধ্বনিঝঙ্কার বা অন্যতর কোনো সংবেদনই তার প্রধান প্রেরণা। ধরা যাক,

গুরুগুরু মেঘ/গুমরি গুমরি/গরজে গগনে/গগনে

প্রতিটি শব্দকে কেটে কেটে বা পড়া মুখস্থ করার মতো সুর করে টেনে টেনে না বলে, ছন্দের তালগুলি যথাযথ মেনে, গুর্ গুর্ শব্দ করতে করতে চলে যাওয়া মেঘের ধ্বনি ও আসন্ন বৃষ্টির অনুভব মাথায় রেখে, 'গ' ধ্বনিটিকে তার যথাযথ গাম্ভীর্য্যে বাজিয়ে তুলে, সমগ্র পংক্তিটি একসঙ্গে আবৃত্তি করে দেখুন তো! এখানে কোনো শব্দের উচ্চারণে অর্থব্যঞ্জনা প্রয়োগ করা হচ্ছে না। না 'গরজে'র মানে বোঝাতে চেষ্টা করা হচ্ছে, না 'গগনে'র বর্ণনাত্মক ব্যাপ্তি আনা হচ্ছে, অথচ ঘনায়মান বর্ষার আমেজ আর মেঘডম্বরু শ্রুতিপথে চকিত অনুভবে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু আবৃত্তিকারের যথাযথ প্রতিভান (intuition) থাকা চাই বর্ষার ওই পরিবেশ বিষয়ে এবং আবৃত্তির লয় আর গ-ধ্বনির অনুপ্রাসে ঠিকমত সেটি বেজে ওঠা চাই কণ্ঠে, তবেই তা ধরা দেবে। এই হচ্ছে ধ্বনিব্যঞ্জনা।

ধ্বনিব্যঞ্জনার আগে পর্য্যন্ত যত প্রকরণের শিক্ষা বর্ণিত হ'ল, তার অনেকটাই প্রত্যক্ষ মিস্ত্রীগিরি। কেবল ধ্বনিব্যঞ্জনায় এসে একজন চর্চাকারীর শিল্পপ্রতিভার যাচাই হয়। প্রকৃতি, পরিপার্শ্ব, জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে গভীর অভিনিবেশ ও তার নানা অনুপুঙ্খকে অনুভব করার মতো সংবেদনশীল মন না থাকলে ধ্বনিব্যঞ্জনার রূপসৃষ্টির কাজ একদমই উতরোয় না। নিতান্ত সাধারণ মানের চর্চাকারী এই পর্য্যন্ত এসে থমকে যান।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। আবৃত্তি ও অভিনয়ের তুলনা করে নানা কথা বলা হয়ে থাকে। প্রশ্ন তোলা হয়, আবৃত্তির আলাদা বৈশিষ্ট্য কোথায়? অনেক অভিনেতার ধারণা, তাঁরা যেহেতু অভিনয় শেখার পথে আবৃত্তির কিছুটা চর্চা করেছেন বা দীর্ঘসংলাপের বাচিক অভিনয়

করে থাকেন, আবৃত্তিতে তাঁদের আলাদা করে শেখার বা ভাবার কিছু নেই। অনেকে আবার আবৃত্তিতে প্রতিভার যথেষ্ট বিকাশ ঘটানোর উপায় নেই ভেবে অভিনয় করতে চলে যান। বলাবাহুল্য, তাঁরা আবৃত্তির এই অসীমাকাশের সন্ধান রাখেন না, এই অরূপলোকের চাবিটি খুঁজে পান না। তাই মাঝেমধ্যে আবৃত্তি করলেও অধিকাংশ অভিনেতার আবৃত্তি নাট্যসংলাপ উচ্চারণেরই নামান্তর হয়ে ওঠে। তাঁদের সেই শ্রুতিরূপে বাক্যের অভিব্যক্তিই হয়ে ওঠে গুরুত্বের বিষয়। কাব্যপংক্তি যে বাক্যমাত্র নয়, তাতে সন্নিবিষ্ট শব্দসমূহকে যে বাজিয়ে তোলা যায় নানা অনুভবে, অনুষঙ্গে, এমন করে এমন বিচিত্র রঙে, কেবল কবিতার মূল ভাবটা বা ভাবের আবেগটুকু তুলে ধরাই নয়, আবৃত্তিতে যে এত ডিটেল্‌স্‌-এর কাজ করার থাকে, তা তাঁদের অভিনিবেশের বাইরেই থেকে যায়। অভিনয় ও আবৃত্তির মধ্যে ভেদরেখার আরও অনেক দিক্‌ হয়তো আছে। কিন্তু এইটি যে প্রধানতম, তাতে সন্দেহ নেই।

আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে

(নীলমণিলতা, রবীন্দ্রনাথ)

হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি

(শাশ্বতী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

নামিছে নীরব ছায়া ঘনবনশয়নে

(দিনশেষ, রবীন্দ্রনাথ)

মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারী আওয়াজে

(ঝর্ণা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

নীচে চাও যদি
হিজিবিজি হিজিবিজি
নদী নৌকো নদী নৌকো নদী

(কাল মধুমাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ
তোমার নগ্ন নির্জন হাত

(নগ্ন নির্জন হাত, জীবনানন্দ)

বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জেছে কে আবার

(খেয়া পারের তরণী, নজরুল ইসলাম)

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে নিবিড় নিশীথ টুটে

(বন্দীবীর, রবীন্দ্রনাথ)

আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রাণে হিম মাঘে

(পঁচিশে বৈশাখ, বিষ্ণু দে)

বলে নাম, বলে নাম অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া

(নাম, অমিয় চক্রবর্তী)

এই পংক্তিগুলির শব্দে শব্দে শব্দপুঞ্জে বেজে ওঠা ধ্বনি যদি ঠিকভাবে অনুভব করা যায়, তবে দেখা যাবে সেই মায়াচ্ছন্ন লোকে কখনো আমের গন্ধে বিহ্বল বাতাসে মৌমাছির গুণগুণানি, কখনো মৃদঙ্গের চাঁটিতে সুরে ভরে ওঠা পরিবেশ, কখনো ঘনায়মান সন্ধ্যার ম্লান আলো আর নিস্তব্ধতা, কখনো ব্রীজের ওপর থেকে দেখা জটিলরেখাময় চড়া ও নদীর চিত্র, কখনো বেজে ওঠে যুদ্ধভেরী, কখনো নরম অনুভূতিময় ঋতু থেকে ঋতু পরিক্রমার স্বাদ, কখনো অবিরত বৃষ্টিপতন আর ভিজে হাওয়ায় জেগে ওঠা বিরহব্যথিত হৃদয়ের হাহাকার। আর এসবই ফুটে উঠবে শব্দপুঞ্জের একত্র ঘনীভূত উচ্চারণে, কখনো মীড়ে শুদ্ধ বা কোমল স্বরে, কখনো গড়িয়ে নামা বা ওঠায়, কখনো গমকে প্রতি পর্বে ঘন স্বরে ঘোষবর্ণের উচ্চারণে, কখনো অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণের যথার্থ অনুনাদে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ শব্দকে অর্থ বা ভাবের দিকে উজ্জ্বল করার দরকার বিশেষ নেই। কেবল পংক্তির সামগ্রিক ধ্বনিপুঞ্জকে নিরবচ্ছিন্ন গায়ে-গায়ে-লেগে-থাকা উচ্চারণের দ্বারা উপরোক্ত বিভিন্ন অনুভবরাজির আশ্রয়ে সঠিক স্বরে বাজিয়ে তোলা দরকার। উপরের উদাহরণগুলি থেকে হয়তো কারো এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে কেবল অনুপ্রাসধর্মী কাব্যপংক্তিই ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টির উপযোগী উপাদান। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে অনুপ্রাসধর্মী রচনাকে ঝংকৃত করে তোলার সুযোগই সর্বাধিক। কিন্তু এছাড়াও ধ্বনিব্যঞ্জনার সুযোগ অন্যত্র রয়েছে। যেমন ধ্বন্যাত্মক শব্দসমন্বিত কাব্যপংক্তি। এমনিতেই, আমরা জানি, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, অথচ তাদের দ্বারা একরকমের অনুভব বা অর্থ আমরা পেয়ে যাই। যখনই আমরা 'টিপ্ টিপ্'

কথাটি উচ্চারণ করি, তখনই খুব অল্প অল্প করে জল পড়ার কথাই অনুভবে আসে। সে বৃষ্টিই হোক্ বা কলের জলই হোক্। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দটিকে কখনো কি উচ্চকিত স্বরে বা ঊর্দ্ধগামী স্বরে দ্রুতবেগে উচ্চারণ করে ওই বারিপতনের অনুভব আনা সম্ভব? ওই শব্দটিকে আমরা সর্ব্বদাই অপেক্ষাকৃত ধীর লয়ে ও স্বাভাবিক কিংবা মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে থাকি—স্বাভাবিক কথাবার্তা বলার সময়েও। তার মানে অবশ্য এই নয় যে কথা বলতে বলতে কোথাও এই শব্দটি উচ্চারণ করতে হলে অমনি একটা সুর করে ফিস্‌ফিসিয়ে টেনে টেনে 'টি-প্ টি-প্ করে বৃষ্টি পড়ছিল' বলি। তা নয়। কথা বলার স্বাভাবিক লয়ের মধ্যেই এই মন্থরতা ও মৃদুতার আভাস এসে যায়। এর পাশাপাশি 'ঝর্‌ঝর্' শব্দটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে, এই ধ্বন্যাত্মক শব্দটি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ স্বরে অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে উচ্চারণের দ্বারাই আমরা জল পড়ার অবিরাম গতির কথা বোঝাতে চাই। কবিতায় যখন এই সব শব্দ আশ্রয় পায়, উচ্চারণে ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টির অবকাশ থাকে।

> নিশুতি জোৎস্নার রাতে 'টুপ্ টুপ্ টুপ্ টুপ্' সারারাত ঝরে
> শুনেছি শিশিরগুলো;
>
> (রূপসী বাংলা, জীবনানন্দ)

> 'হুড়মুড় ধুপ্‌ধাপ্' ওকি শুনি ভাই রে।
> দেখছ না হিম পড়ে যেয়োনাক' বাইরে।
>
> (শব্দকল্পদ্রুম্, সুকুমার রায়)

> আকাশমুখর ছিল যে তখন
> 'ঝর ঝর' বারিধারা
>
> (গীতবিতান রবীন্দ্রনাথ)

> ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে
> ঢাল তলোয়ার 'ঝন্‌ঝনিয়ে' বাজে
>
> (বীরপুরুষ, রবীন্দ্রনাথ)

> 'ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝির্' পূবে হাওয়া বইছে
>
> (শিশির ঝরার গান, বিমলচন্দ্র ঘোষ)

আমি চলচঞ্চল

'চমকি চমকি' পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি

'ফিং দিয়া দিই' তিন্ দোল্।

(বিদ্রোহী, নজরুল ইস্‌লাম)

এই পংক্তিগুলির ধ্বন্যাত্মক শব্দে কোনো বৈশিষ্ট্য আনার চেষ্টা না করে সাদামাটা উচ্চারণ করুন। আবার আবৃত্তির স্বাভাবিক লয়ের ভেতরেই ঐ শব্দগুলির বিশেষ অনুভবকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন। পার্থক্যটুকু আপনিই বোঝা যাবে। বর্ণের অনুপ্রাস বা বর্ণে বর্ণে বেজে ওঠা ঝঙ্কার ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে যথেষ্টই সহায়তা করে। এ ছাড়াও অনিবার্য্য ভাবে প্রয়োজন আবৃত্তি-শিল্পীর কল্পনা ও অনুভবশক্তি। শ্রীশম্ভু মিত্রের 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তিতে আমরা একটি পংক্তি পাই, 'চলে যায় ট্রেন, দ্রুতচক্রকঙ্কনঝঙ্কারে'। এখানে দ্রুতচক্রকঙ্কন ঝঙ্কারে শব্দে অনুপ্রাসের প্রশ্রয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এই শব্দটি উচ্চারণের দ্রুততায় সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বরক্ষেপণে যেভাবে বাজিয়ে তোলেন শিল্পী, তাতে যেন রেলগাড়ীর চাকার ক্রমঅপস্রয়মান ঘর্ঘর ধ্বনিটি শ্রুতির অভিঘাতে দৃশ্যপট গড়ে তোলে।

অনেক ক্ষেত্রে, বর্ণের অনুপ্রাস ছাড়াও ধ্বনিব্যঞ্জনা সম্ভব হয়,

তোমার দুখানি কালো আঁখি পরে

শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে ···

কালো আঁখির পটে আষাঢ়ের ছায়া দেখার এই কল্পনা ও এই বিশেষভাবে বিন্যস্ত শব্দের সংযোগে এখানে যা সৃষ্টি হয়েছে কাব্যতত্ত্ববিদ্‌রা তাকেই চিত্রকল্প বলে থাকেন। কিন্তু সেটা 'কবির সৃষ্টি'।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে 'শ্যাম' এর তুলনায় 'আষাঢ়ের' অংশে স্বরকে গড়িয়ে ঘন করে এনে আবার 'ছায়াখানি পড়ে'তে স্বরকে সমান্তরাল করে দিলে ও সমগ্র পংক্তিটি নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করলে, এবং শ্যাম বা আষাঢ় বা 'ছায়া পড়ে' কিছুই আলাদাভাবে বোঝানোর চেষ্টা না করলে, ইতিমধ্যে 'ঢ়' বর্ণের গাঢ়ত্ব যথাযথ দক্ষতায় ছুঁয়ে যেতে পারলে, এই পংক্তিটির ধ্বনি কালো চোখের আর বর্ষার ঘন কালো অনুভব মিলিয়ে একটা বিশেষ আমেজ আনে, কোনো নির্দ্দিষ্ট বর্ণের অনুপ্রাস ছাড়াই।

সেই বিশেষ আমেজ কণ্ঠস্বরে ফুটিয়ে তুলতে পারার মধ্যেই 'আবৃত্তিকারের সৃষ্টি'। এইরকম সৃষ্টির ইশারা যদি তাঁর অন্তরে না আসে, তবে শত শত কবির এমন শত শত পংক্তি তাঁর কণ্ঠে বোবা নিস্পন্দ শো-কেসের পুতুলের মত হাজির থাকবে।

যাই হোক, এখন আমরা আবৃত্তি চর্চা প্রসঙ্গে উচ্চারণের ভাষাতত্ত্বগত বিশুদ্ধতা ছাড়াও গভীরতর উচ্চারণ চর্চার কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি, যাকে উচ্চারণ-ব্যঞ্জনা বলছি।

এখন একটি কাব্যপংক্তির উচ্চারণ নিয়ে চিন্তা করতে বসলে, ব্যঞ্জনাসৃষ্টির এই দুটি দিক্-এর টানা-পোড়েনে পড়তে হবে আমাদের। কোনো কোনো বিশেষ শব্দে অর্থ বা ভাব ব্যঞ্জনার চেষ্টা করবো অথবা কোনো শব্দকে স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট করে না তুলে, শব্দপুঞ্জে বেজে ওঠা ধ্বনি দিয়ে কোনো অনুভব, ছবি বা আমেজ ফুটিয়ে তুলবো? অবশ্য এমন ক্ষেত্রও বিরল নয়, যেখানে ধ্বনি-ব্যঞ্জনার আমেজ সৃষ্টিকারী প্রবহমানতার মধ্যেই অর্থ বা ভাবব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতর স্পর্শও আবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে।

সুতরাং, আপনাদের এই দ্বিধাজাগর চিত্তের সামনে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য আরো কয়েকটি পংক্তি সাজিয়ে দিয়ে, সৃষ্টির উদ্বেল প্রেরণার ঢেউয়ে আপনাদের আলোড়িত রেখে, উচ্চারণ-ব্যঞ্জনার আলোচনা এখানেই শেষ করি।

পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত

(পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ)

স্নিগ্ধনীল ঝামরে নামে
দুপুর ভরে গুণগুণানি

(একটি রূপকথা, বুদ্ধদেব বসু)

এ কী রণ বাজা বাজে ঘন ঘন
ঝন রণ রণ রণ ঝনঝন

(আগমনী, নজরুল)

পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে; সুর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।

(অবরোধ, জীবনানন্দ)

বীণা বাজে, সমস্ত জীবন জুড়ে বীণা বেজে যায়

(রৌদ্রে বাজে বীণা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

জল পড়ে বুকের ভিতরে
দুরন্ত বাদল পোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে
জল পড়ে, শুধু জল পড়ে

(দুরন্ত বাদল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

কবিতা আমার বর্ষার ভরা নদী
কবিতা আমার ভোরের শেফালি জুঁই

(কবিতা আমার, মৃণালকান্তি দাশ)

উচ্চারণের কলাকৌশলের কথা আলোচিত হয়েছে।

এরপরই আসে ছন্দের কথা। বস্তুতঃপক্ষে, একটা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কোন্‌টি প্রাথমিক—স্বর ব্যবহারের জ্ঞান, না ছন্দবিচার শক্তি—এটা তর্কের বিষয়।

একটা কবিতাকে গদ্য পড়ার ভঙ্গিতে বলে যাওয়া হবে, না কি কথোপকথনের ভঙ্গিতে যেমন খুশী কবিতার বাক্যগুলি কাটা-কাটা ভাবে বলা হবে, অথবা কোনো তাল লয় থাকবে বলার ভেতরে, এ সব ব্যাপার বুঝতে সাহায্য করে ছন্দজ্ঞান।

অবশ্য প্রথমেই আমরা ছন্দশাস্ত্র খুলে বসবো না। প্রথমেই যতি, ছেদ, মাত্রা অক্ষর ইত্যাদি নিয়ে ও তার নানা মত নানা পথের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবো না, বরং আমাদের পরিপার্শ্ব থেকে ছন্দ সম্বন্ধে কিছুটা চেতনা আহরণ করতে চেষ্টা করবো। ছন্দ যদিও একটা শাস্ত্রগত, পুঁথিগত ব্যাপার, সেটা ব্যাকরণ হিসেবে। আবৃত্তিকারকে ছন্দ বুঝে নিতে হবে শিল্পপ্রকরণ হিসেবে ; শিল্পসৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে। সেখানে প্রকৃতি ও পরিপার্শ্বও যদি পুঁথির পাশাপাশি তার শিক্ষক না হয়, তবে ছন্দকে ঘিরে তার সৃষ্টিশীল মন, তার কল্পনাশক্তি বিস্তারের অবকাশ পাবে না কখনো।

সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যে ছন্দে বাঁধা, এটা অবশ্য প্রকৃতি ও পরিপার্শ্বকে ছাড়িয়ে মহাজাগতিক একটা বোধের ব্যাপার। অতদূর না গিয়েও একবার চলমান জীবনের দিকে তাকালে ছন্দের বিচিত্র বিভঙ্গ দৃশ্যে শব্দে গতিতে স্থিতিতে আমাদের নজরে আসে।

নিস্তব্ধ দুপুরে কোথাও ঢেঁকির পাড় পড়ছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়,...... অষ্টম নবম বার পর্য্যন্ত কান, মন অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপরই, সেই কাজের ফাঁকেই কখন তারা অপেক্ষা করতে থাকল পরবর্তী পতনশব্দের জন্য। অন্যমনেও ছন্দ স্থান করে নেয় এইভাবে। এবং এই আবর্তন প্রত্যাশাই

ছন্দের মূল ব্যাপার। একটি চলন্ত ট্রেনে বসে আমরা টের পাই দোদুল্যমান যন্ত্রাংশ-সমূহ থেকে উত্থিত এমনি এক আবর্তিত ধ্বনি। সমগ্র ভ্রাম্যমান সময় জুড়ে, এমন কি রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেও, সমগ্র চেতনা এই ধ্বনির আবর্তন-প্রত্যাশায় থাকে।

একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বয়ে যাচ্ছে একটা তরঙ্গ। প্রতি পদক্ষেপে সেই তরঙ্গের আবর্তন। এখন আর কান নয়, চোখ প্রতীক্ষমান আবর্তন প্রত্যাশায়।

একটি কাপড় শুকোচ্ছে তারে। তার ঊর্দ্ধাংশ স্থির, নিম্নাংশ বাতাসের ঘায়ে তরঙ্গ তুলছে। আয়তাকার লম্বমান বস্ত্রখণ্ড নানা বক্ররেখার ত্রৈমাত্রিক আকার পাচ্ছে, আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। চোখ সচেতনে বা অবচেতনে আটকে যাচ্ছে এই ছন্দের খেলায়।

কিংবা, নির্জন বাগানে একটা ঘুঘু ডাকছে। বেশ কিছু সময়ের ফাঁক আছে দুটি ডাকের মধ্যে, অথচ ক্রমশই জেগে উঠছে প্রত্যাশা-বোধ।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে শোনা গেল বৃষ্টিশেষে পাতা থেকে পাতান্তরে জল পড়ার শব্দ। ধীরে, বহুসময়ের ব্যবধানে। কিন্তু কান উৎকর্ণ হয়ে পড়ছে। পার্থক্য কেবল প্রতীক্ষার সময়ের। একেই বলে লয়। আগের সব ক'টি উদাহরণে আবর্তন ছিল ঘন ঘন। প্রতীক্ষার অবসর কম। সেগুলি দ্রুত লয়ের ছন্দ। শেষ দুটি উদাহরণে আবর্তনের জন্য অপেক্ষা বেশী। এ হচ্ছে বিলম্বিত লয়ের ছন্দ।

এই সবই হ'ল গতিচ্ছন্দের উদাহরণ। স্থিতিচ্ছন্দও রয়েছে পাশাপাশি। বিশেষতঃ দৃশ্যে। একটি মানুষ দাঁড়িয়েছিল সোজা হয়ে। হঠাৎ একটা পা উঁচু পৈঠায় রেখে, উরুতে হাত দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। সমস্ত শরীরের রেখায় একটা টান টান ছন্দ দেখা দিল। এর ভেতরেও উঁকি দিচ্ছে একটা আবর্তন-প্রত্যাশা। কিন্তু সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যাবে না। সেটা অনুভবের।

সরল একটি রেখাকে দু এক স্থানে মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিলে তার মধ্যে একটা গতি জেগে ওঠে। যেন এখনি নৃত্যপরায়ণ হয়ে উঠবে সেই অঙ্কন। এই গতির আবেশই দৃশ্যপটে ছন্দের অনুভব গড়ে তোলে।

ঠিক একইরকমভাবে তাল লয় ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে বা গাণিতিক হিসাবে দেখানো না গেলেও কোনো কোনো বাক্য শব্দবিন্যাসের ঈষৎ মোচড়ে একটা অন্তর্নিহিত গতির বেগে বলীয়ান হয়ে ওঠে। ছন্দের একটা স্পন্দন অনুভব করা যায় তার উচ্চারণে। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ অনুযায়ীই,

'তার চেহারাটা সুন্দর' এই সরলরৈখিক বাক্যটিকে কেবল ওই রেখার মতোই একটু মুচড়ে ধরলে, ছন্দের স্পন্দনটা অনুভবে আসে।

'কী সুন্দর তার চেহারাটি।'

ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রাব্য ছন্দের অজস্রতা, নৃত্যশিল্পীর দেহের রেখায় রেখায়, স্থিতিতে গতিতে দৃশ্যগত ছন্দের সম্ভার। সেই সঙ্গে সঙ্গতকারী যন্ত্র বা কণ্ঠে শ্রাব্য ছন্দের নানা বিন্যাস।

ব্যাকরণের নিয়ম কানুন হিসেবে ছন্দ শেখার আগে, এইরকম আমাদের চারপাশের জীবনে, শিল্পে, ছড়িয়ে থাকা ছন্দকে চিনতে শেখা, উপলব্ধি করতে শেখা খুব দরকার। আবৃত্তি করবার সময়ে পুঁথিগত ছন্দজ্ঞান যেমন আমাদের কাব্যপংক্তিগুলিকে সঠিকভাবে পড়তে বা বলতে সাহায্য করবে, ছন্দ সম্বন্ধে এই সব গভীরতর বোধ আমাদের কেবল সঠিকভাবে পড়ার দরজা পেরিয়ে পংক্তিগুলির মধ্যে অন্যতর ব্যঞ্জনা আনতে উদ্বুদ্ধ করবে।

ট্রেনে চড়ার কথাই ধরা যাক্। এ ধ্বনির দোদুল্যমান ছন্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই গাঢ়।

ঘটাং ঘট্/ঘটাং ঘট্/ঘটাং ঘট্ ঘট
ঘট্ ঘটাং/ঘটাং ঘট্/ঘট্ ঘটাং/ঘট্

ট্রেনে চড়েছেন অথচ এই ছন্দের সঙ্গে পরিচিত নন, এমন বোধ হয় কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অথচ, ছুট্ছে ট্রেন পেরিয়ে পথ পেরিয়ে মাঠ বন
দুলছি আমি, দুলছো তুমি, কাঁপছে তোমার চুল।
ছোট্ট নদী এই পালালো এ কোন্ ইস্টেশান্?
দুলছি আমি দুলছো তুমি দুলছে তোমার দুল্।

আসরাফ সিদ্দিকীর এই কবিতার আবৃত্তি-রূপায়ণ করতে গিয়ে সেই চির পরিচিত ধ্বনির কথা ক'জনই বা ভাবতে পারেন? আর ক'জনই বা সেই ধ্বনির আভাস ফুটিয়ে তুলে কবিতার বর্ণনাত্মক বাক্যগুলির ভেতরে চলমান ট্রেনের গতিময়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন? আবৃত্তিকারের কাছে ছন্দ বলতে তো এই উত্তরণের পথনির্দেশিকা।

আরও একটি কবিতার কথা মনে আসে এই প্রসঙ্গে। সেখানে হুবহু ট্রেনের ধ্বনির সামঞ্জস্যে ছন্দটি বিন্যস্ত নয়। কিন্তু দ্রুত ধাবমান ট্রেনের গতির আবেগ খুঁজে পাওয়া যায় তারও ছন্দে। এবং সেটি প্রতিষ্ঠিত না করে কেবল কবিতার

প্রতিটি বাক্যের অর্থ ও ভাব প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ব্যঞ্জনা অনেক ম্লান হয়ে আসে। মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তর কবিতা—

মনে করুন মধ্যরাতের ট্রেন চলেছে দ্রুত তালে
দম নেওয়াটা হয়তো হবে একশো কি.মি.
মধ্যরাতের গতিরাগে দ্রিমি দ্রিমি
ট্রেন চলেছে দ্রুত তালে মনে করুন
মনে করুন চুলগুলি তার উড়ছে ঝড়ে
পাশে বসা নিদ্রাতুরা সেই কিশোরীর
শরৎরাতের আলোর জোয়ার বিছায় শরীর
উথাল পাথাল ঢেউগুলি সব দিচ্ছে উঁকি
জান্‌লা জুড়ে
আলোছায়ার কাটাকুটি আঁকিবুকি
কামরা জুড়ে···   ইত্যাদি

তারপর ধরুন, সেই একটি মেয়ের হেঁটে যাওয়ার কথা। মৃদু চালে, মিত পদক্ষেপে যতই সে পা ফেলে চলেছে, দুলে উঠছে তার বেণী, মুখশ্রীতে আলো-ছায়া, কটি, নিতম্ব, বাহু প্রতি পদক্ষেপে লীলায়িত হচ্ছে তরঙ্গে তরঙ্গে। প্রতিদিন রকে বা রাস্তার মোড়ে এই সব দৃশ্যের মুগ্ধ দর্শক কত না নবীন যুবক। তাদেরই কাউকে আবৃত্তির জন্য সামনে ধরে দিন না নজরুলের এই কবিতাটি—

দোদুল্ দুল্
দোদুল্ দুল্,
বেণীর্ বাঁধ্,
আলগ্ ছাঁদ্
আলগ্ ছাঁদ্
খোঁপার্ ফুল্

কানের্ দুল্
দোদুল্ দুল্
দোদুল্ দুল্······   ইত্যাদি।

পুঁথিগত জ্ঞান থেকে বলা যায়, এ হ'ল আরবী মোতাহারিক্ ছন্দ। কিন্তু কেবল ওইটুকু ছন্দজ্ঞান-এ কাজ চলে না আবৃত্তিকারের। তার কণ্ঠে উঠে আসা

চাই উক্ত দৃশ্যের অন্তর্গত নির্যাস। তবেই কবিতাটির আবৃত্তি নিছক বর্ণনাধর্ম পেরিয়ে জীবন্ত প্রতিমার চলচ্ছবির অনুভব আনতে পারে।

পাতা থেকে পাতান্তরে ঝরে যায় শিশির। ভোরের ভৈঁরো আলাপের মতো কোমল পরিবেশে সেই অন্তর্গত নিঃস্তব্ধতার পরিমাপ কী রকম জেগে থাকে বিমলচন্দ্র ঘোষের এই কবিতায়—

টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্,
শিশিরের শব্দের
রাত প্রায় শেষ হতে
দেরি নেই।
গাছে গাছে কুয়াশার
হিমঝরা থম্‌থম্
পল্লবে পল্লবে টুপ্ টাপ্।
চুপ্ চাপ্ নিঃঝুম নির্মেঘ কুয়াশায়
ভোর হোলো পাখি ডাকা ছন্দে··· ইত্যাদি।

তা যদি অনুভবে না আসে, তবে একে দ্রুতগতি তাল ঠুকে বলে যেতেই পারেন আবৃত্তিকার।

সুকান্ত, যদিও অন্য উদ্দেশ্যে, লিখেছিলেন, 'আর মনে করো/নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ, অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা ···'

সত্যিই, নদী তার গতিপথে কতরকমের ছন্দ আর লয় বদল করে তার ঠিকানা নেই। কোথাও তরঙ্গসঙ্কুল দ্রুত গর্জমান তার ছন্দ, কোথাও দুই তীরে বাঁধা নিস্তরঙ্গ মন্থর তার চলা। নদী-ই তো শেখাবে ছন্দ।

তখন কলকল ছুটে জল
কাঁপে টলমল ধরাতল
কোথাও নীচে পড়ে ঝরঝর
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে
নদী চলে পথ কেটে কুটে
ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো
সদাই হয়ে পড়ে পড়ো পড়ো

কত   বড় পাথরের চাপ
জলে   খসে পড়ে ঝুপ্ ঝাপ্
তখন   মাটি গোলা ঘোলা জলে
ফেনা   ভেসে যায় দলে দলে
জলে   পাক্ ঘুরে ঘুরে ওঠে
যেন   পাগলের মতো ছোটে।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশটির সাহায্যে নদীর তরঙ্গসঙ্কুল কলনাদী গতি ধ্বনিত করা তখনই যাবে, যখন প্রকৃতির কাছ থেকে সেই ছন্দের শিক্ষা নিয়ে থাকবেন আবৃত্তিকার। আবার বিপরীতভাবে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় অপ্রচারিত এই রচনাটিতে,

যে নদীতে প্রতিদিন ভেসে যেতো ভোরের শিমূল
ঝুরু ঝুরু বালি নিয়ে ঝিরি ঝিরি ছায়া ভরা কূল
যেখানে উদাস হ'ত বধূদের সকালে-বিকেলে ;
দূরযানী পালে হাওয়া দূরচারী সুর নিয়ে এলে
ঘনালে তারার ছায়া—সাড়া দিলে হিজলের বন
প্রদীপ ভাসাতে এসে কে যেন ভাসিয়ে যেতো মন।
সে নদী আমারো ছিল ;   স্রোতে ভাসা ভোরের শিমূল
কখনো পুজার মালা—জবা-চাঁপা-শেফালী বকুল ;
বলেছি ভাসিয়ে দিয়ে আমারো সে কাগজের নাও,
কোথা আছে মধুমালা, সেই দেশে—সেই ঘাটে যাও।
রাঙা শিমূলের সাথে—জবা চাঁপা বকুলের দলে
আমারো ময়ূরপঙ্খী সেই কথা নিয়ে গেল চলে।···   ইত্যাদি

দুই কূলে বাঁধা শান্ত স্থির নদীর ছন্দ বিছিয়ে রয়েছে। যেমন শৈশবের স্মৃতি-গন্ধটুকু এ কবিতার আত্মা, তেমনি নদীর ধীর প্রবহমান ছন্দের অনুভব এ কবিতার আবৃত্তিকে অন্য মাত্রা দিতে পারে।

মানুষের ছুটে চলার কথাই ধরুন না কেন! দুর্দম বেগে একটা লোক ছুটে যাচ্ছে বন-বাদাড় টপ্‌কে। এমন প্রবল গতিচ্ছন্দ—বলিষ্ঠ, বাঘের মতো—যেমন মৃণাল সেন দেখিয়েছিলেন 'মৃগয়া'তে, তাঁর নায়কের ছুটে যাওয়া—মনে

আছে নিশ্চয় সেই চলার ছন্দের কথা, সেটা একটা আলাদা স্বাদের ব্যাপার ছিল, কিন্তু যে কোনো মানুষেরই দৌড়টা—তার দৌড়ের ধীর থেকে দ্রুত লয় একটা উপভোগ্য ছন্দের ব্যাপার নয় কি ?

রাণার চলেছে। রাণার।
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রাণার,
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রাণার। রাণার।
জানা অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রাণার চলেছে চিঠি আর সংবাদে।
রাণার চলেছে বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে আরো জোরে এ রাণার দুর্বার দুর্জয়।

সুকান্তের এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় এর ভাব, বক্তব্য ইত্যাদি খুব প্রখর হয়ে উঠতে শুনেছি অনেকের গলায়। অথচ ছ-মাত্রার পদক্ষেপে ক্রমবর্দ্ধমান দ্রুত লয়ে রাণারের পদচারণার অনুভবটি কখনো কারো গলায় চিত্রিত হতে শুনলাম না। এই কবিতার ছন্দে নেই কি সেই পদপাতের ধ্বনি ?

নাগরদোলার আবর্তন তো স্পষ্টতই দৃশ্য। তার ছন্দকে তাই প্রচ্ছন্ন বলা যায় না। কয়েকটি ছেলেমেয়ে উল্লাসে চীৎকার করছে। আর নাগরদোলার ঘূর্ণমান দৃশ্যের সঙ্গে সেই ধ্বনি দূরে যাচ্ছে, কাছে আসছে বলম্বিত ছন্দে—এরকম অভিজ্ঞতা বিরল নয়।

দেখতে পেলেই ঘুরে বলব নেই তো তুমি এখানে নেই
ওখানে নেই সেখানে নেই তুমি এখন নাগরদোলায় এখন তোমার
বাঁদিকের হাত ডান দিকের পা বাঁদিকের চোখ ডানদিকের কান
উঠছে নামছে হৃদয় টিদয় এখন তোমার
ছায়া উঠছে ছায়া নামছে
ছায়া উঠবে ছায়া নামবে
নামতে নামতে উঠে গিয়েই

বলে উঠবে　　এই যে আমি এই যে আমি এই যে আমি-ই-ই-া-া

ওখানে নেই

ওখানে নেই

ওখানে না-া-া-া

কবি বত্নেশ্বর হাজরার এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় ছন্দের ওই বোধই পারে যথার্থ মাত্রা আনতে।

উপরের উদাহরণগুলি খুব প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিপার্শ্বের কয়েকটি ছন্দ-অভিজ্ঞতা সরাসরি আবৃত্তির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর দৃষ্টান্ত। সর্ব্বদা এরকম হয়না। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো কবিতাটির কোনো একটি অংশ বা দু-একটি পংক্তিতে তার বাঁধা মাপের ছন্দে কোনো অন্তর ব্যঞ্জনা আরোপ সম্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা সেভাবে কাজে লাগে না কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকে। গভীরতায় লীন হয়ে থাকে কোনো স্বকীয় অনুভব কবিতার ছন্দকে ঘিরে।

ছন্দশাস্ত্র অনুসারী ব্যাকরণ বুঝতে বসার আগে এইভাবে ছন্দ অনুভবের মন তৈরী করতে হবে আবৃত্তিকারকে।

তারপর আমরা আমাদের নিজস্ব এক পদ্ধতিতে এ তাবৎ রচিত বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে সচেষ্ট হ'ব। সেটা কোনো ছন্দশাস্ত্রীরই প্রদর্শিত পথে সম্পূর্ণভাবে মিলবে না। সেই আলোচনার ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকরণগত বিরুদ্ধ যুক্তি ফণা তুলে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সে সকল তর্কে না গিয়ে আমরা আমাদের মতো করে ছন্দের ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত বুঝে নেবো। তারপর সেই সব যুক্তি-তর্কের সঙ্গে আমাদের মতের মিল বা অমিল নিয়ে ভাবতে বসবো।

আবৃত্তি করার জন্য যেমনভাবে শেখার সুবিধে, তেমন করে কবিতার ছন্দ জিনিষটা শেখার চেষ্টা চালানো যাক্ তবে।

ঠিক সরল নয় এমন জিনিষ সরল করে বুঝতে গেলে যা হয়—প্রথমে পা ফেলার জন্য একটা সরল রাস্তা বের করে নিতে হয়। তাতে অনেক মুস্কিল দেখা দেয়। ছন্দ নিয়ে তো ছন্দশাস্ত্রীদের মধ্যেই তর্কযুদ্ধের শেষ নেই, আর সে তুলনায় আমরা তো ভিন্নরাজ্যের বাসিন্দা, পথঘাট একেবারেই অচেনা আমাদের। তার ওপর আমাদের এই শেখার চেষ্টা খাতায়-কলমে, ছাপার অক্ষরে। অথচ ছন্দ জিনিষটা আবৃত্তির ক্ষেত্রে একান্তই ধ্বনির ব্যাপার।

ধ্বনির বণ্টন, ধ্বনির তরঙ্গ—এই সব। কাজেই, সে-ও আর একটা অসুবিধে। কান আর কণ্ঠের মিলন না ঘটিয়ে ছন্দ শিখতে যাওয়া, বর্ণনার মাধ্যমে সন্দেশের স্বাদ বোঝানোর মতো।

এই যে এতক্ষণ শুধু অসুবিধের গীত গাইতে হ'ল, তার কারণ এগুলি আমাদের এই চর্চার সময় প্রতি পদে স্মরণে রাখতে হবে।

ছন্দপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত সমস্ত বাসিন্দাদের কীর্তি শ্রদ্ধাভরে অবলোকন ও অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে সকলেরই ছন্দোবিশ্লেষণ বা আলোচনার লক্ষ্য হ'ল সূক্ষ্মতর, নতুনতর ছন্দ রচনা করা বা করতে সাহায্য করা। যদিও সমস্ত আলোচনার সূত্রেই কান ও কণ্ঠের মিলনের কথা এবং ফলতঃ 'আবৃত্তি' শব্দটিও বার বার আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু আবৃত্তি করার দৃষ্টিকোণ থেকে ছন্দ আলোচনা নেই বললেই হয়। এদিক দিয়ে শ্রদ্ধেয় কবি মোহিতলাল মজুমদারের বিশ্লেষণের প্রাথমিক স্তরগুলি একটু অন্যভাবে সাজিয়ে নিলে, আমাদের ছন্দ শেখার ক্ষেত্রে প্রথম পা ফেলার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারপর, ক্রমে আমরা অন্যদের আলোচনা থেকেও নানা সাহায্য পেতে পারি।

মোহিতলাল অবশ্য সমস্ত বাংলা কবিতাকে যে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—সাধু ভাষার ছন্দ ও কথ্যভাষার ছন্দ—সেই নাম-পরিচয় ধরে এগোনো আজকের দিনে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি যাকে সাধুভাষার ছন্দ বলতে চেয়েছেন, সেই প্রকৃতির ছন্দে লেখা কবিতাতে এখন কথ্য ভাষার ছড়াছড়ি, আবার উল্টোটাও। কিন্তু তিনি সাধুভাষার ছন্দের রকমফের বোঝাতে গিয়ে যে দুটি ভাগে তাদের ভাগ করেছেন—পদ-ভাগের ছন্দ ও পর্ব্ব-ভাগের ছন্দ সেইটা আমাদের কাজে লাগে খুবই। যদিও, বাংলা কবিতার ছন্দ বলতে এ পর্যন্ত যা যা নির্ধারিত হয়েছে, তাদের সবগুলির মধ্যেই পর্ব্ব ও পদ দুটি উপাদানই আছে। অর্থাৎ যাকে আমরা পদ-ভাগের ছন্দ বলছি, তার ভেতরেও পর্ব্ব রয়েছে, আবার পর্ব্ব-ভাগের ছন্দের মধ্যেও রয়েছে পদ। কিন্তু একথা সত্যি যে, কোনো ছন্দে পর্ব্বভাগগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পদের অস্তিত্ব আড়াল হয়ে যায়, আবার কোনো ছন্দে পদ-ভাগটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পর্ব্বভাগগুলিকে আত্মসাৎ করে নেয়। এই ধর্ম অত্যন্ত পাকাপাকি ভাবে বাংলা কবিতার সর্ব্বত্র বজায় না থাকতেই পারে, তবু এই ধর্মের উপর লক্ষ্য রেখেই আমরা আবৃত্তির জন্য ছন্দ শিখতে শুরু করব।

আমরা সাধুভাষা ও কথ্যভাষার ছন্দকে আলাদা করবো না। বাংলায় এ

পর্য্যন্ত যত কবিতা লেখা হয়েছে সবগুলিকে আমরা দু-ভাগে ভাগ করি।
(১) গদ্যে লেখা বা গদ্যছন্দে লেখা (২) পদ্যে লেখা।

যে কবিতার মধ্যে আমরা কোনোরকম নির্দ্দিষ্ট চাল পাই না, মাপ পাই না, কেবল মানে অনুযায়ী পড়ে গেলেই চলে, তাকে গদ্য ভেবে এক পাশে সরিয়ে রাখা যাক্। যে সব কবিতা পড়তে বসে একটুখানি দোলা লাগে, যেন একটা নির্দ্দিষ্ট মাপে পা ফেলছি বলে মনে হয়, তাকে নিয়েই ছন্দ-বিচার।

সেই পদ্য ছন্দে লেখা বাংলা কবিতাকে এবার আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নেবো।

কিছু কিছু কবিতা ঘন ঘন হাতে তালি দিয়ে পড়া যায়। একেবারে গানের মত একটানা ও সমমাপের তাল।

দিনের আলো / নিভে এল / সুয্যি ডোবে / ডোবে
আকাশ ঘিরে / মেঘ জুটেছে / চাঁদের লোভে / লোভে

(রবীন্দ্রনাথ)

হৃদয় আমার / নাচেরে আজিকে / ময়ূরের মত / নাচেরে,
হৃদয় / নাচেরে
শত বরণের / ভাব উচ্ছ্বাস /
কলাপের মত / করেছে বিকাশ /
আকুল পরাণ / আকাশে চাহিয়া / উল্লাসে কারে / যাচে রে

(রবীন্দ্রনাথ)

খাঁচার পাখি ছিল / সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল / বনে

(রবীন্দ্রনাথ)

মারাঠা দস্যু / আসিছে রে ওই / করো করো সবে / সাজ
আজমীর গড়ে / কহিলা হাঁকিয়া / দুর্গেশ দুম / রাজ

(রবীন্দ্রনাথ)

ছিলাম যবে / মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো / শিখাবে বলে
চোরাই করে / এনেছো মোরে / তুমি

(রবীন্দ্রনাথ)

পথের বাঁশি / পায়ে পায়ে / তারে যে আজ / করেছে চন্ / চলা
আনন্দে তাই / এক হ'ল তার / পৌছনো আর / চলা

(রবীন্দ্রনাথ)

কুহেলীর দোলায় চড়ে
এল ঐ কে এল রে
মকরের কেতন ওড়ে
শিঙুলের হিঙুল বনে

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

একবার / পাখিদের / ভাষাটা য / দি
শেখাতেন / সোলেমান্ / পয়গম্ / বর
দেখতাম / পাতাদের / আড়ালে তা / রা
খড় দিয়ে / কেন গড়ে / ঘর সুন্ / দর

(আল্ মাহমুদ্)

ভোলো না কেন / ভুলতে পার / যদি
চাঁদের সাথে / হাঁটার রাত / গুলি
নিয়াজ মাঠে / শিশির লাগা / ঘাস
পকেটে কার / ঠাণ্ডা অং / গুলি
ঢুকিয়ে হেসে / বলতে অভ্ / ভ্যাস্
বকুল ডালে / হাসতো বুল্ / বুলি

(আল্ মাহমুদ্)

এই সব কাব্যপংক্তি পড়তে গেলেই একটা তাল রেখে চলার অনুভব আসে না কি? পংক্তিগুলিকে যেভাবে কাটা হয়েছে তার মাথায় মাথায় তাল রেখে আমরা অনায়াসে বলতে পারি। এবং পংক্তির শুরু থেকে সেই তালটা চলতেই

থাকে। থামে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা পংক্তি শেষের বা পরবর্তী পংক্তির একটি ছোট টুক্‌রোতে গিয়ে পৌছই।

আর একটু বুঝিয়ে বলি। প্রথম উদাহরণটিই ধরা যাক্। 'দিনের আলোর' দি থেকে তাল রেখে পড়তে শুরু করলে তালের ঝোঁকে চলতে চলতে একেবারে 'ডোবে' তে পৌছলে তবে যেন থামবার অবকাশ পাওয়া যায়।

আবার, পঞ্চম উদাহরণটি নেওয়া যাক্। 'ছিলাম যবে'র ছি থেকে শুরু করলে ওই রকম তালের ঝোঁকে গড়াতে গড়াতে আমরা পৌছে যাই 'তুমি'তে। তার আগে যেন ছন্দ আমাদের থামতে দেয় না।

এই তাল রেখে পড়বার সময়ে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পংক্তিগুলি ওইভাবে অনেকগুলো টুকরো হয়ে যায়। প্রত্যেক টুকরোর মাথায় তালটা পড়ে। এই টুকরো গুলোকেই ছন্দের পরিভাষায় বলে 'পর্ব্ব'। যে ছোট টুকরোটা পংক্তি-প্রান্তে পাওয়া গেল, তাকে বলে খণ্ড-পর্ব্ব বা ভাঙা পর্ব্ব। পর্ব্বগুলো সব সমান মাপের হয় অর্থাৎ তাদের উচ্চারণ করতে সমান সময় লাগে। তা তো লাগতেই হবে। না-হলে তালটা সমানভাবে পড়বে কী করে?

তাল রেখে রেখে পড়ার ফলে টুকরোগুলো অর্থাৎ পর্ব্বগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই এ ছন্দকে কবি মোহিতলাল নাম দিয়েছিলেন পর্ব্বভাগের ছন্দ। এই পর্ব্বগুলোর গুণই বলা যাক্, দোষই বলা যাক্, সে হচ্ছে এই যে, এরা যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে শেখে নি। একটা সব সময়ই আর একটার গায়ে গড়িয়ে পড়ে ঠেলা দিচ্ছে। তাই ছন্দের স্বাভাবিক গতিতে কোনো একটি পর্ব্ব উচ্চারণ করে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। যদি মানে বোঝানোর জন্য তেমন দাঁড়াইও কখনো, মাথার মধ্যে গড়িয়ে চলার ঝোঁকটা ঠিকই থেকে যায়। তেমন দাঁড়ানোর জন্য যতটুকু শক্ত করে মাটি আঁকড়ে গতি আটকাই, একটু আল্‌গা দিলেই আবার পরবর্তী তালটি ধরবার জন্য যেন গড়িয়ে যাই পরের পর্ব্ব'টার গায়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ একে বলেছিলেন, এ যেন গোলচাকার মতো গড়িয়ে চলে, যতক্ষণ না একটা ছোটো টুক্‌রোতে ঠেস্ দিয়ে তাকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভাঙা বা খণ্ড-পর্ব্ব যেন সেই ঠেস্-এর কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য যে ছন্দ সম্বন্ধে এ-কথা বলেছেন, আমাদের আলোচনায় আমরা তার সঙ্গে অন্য জাতের ছন্দও মিশিয়ে ফেলেছি। তা-হোক্, আমাদের প্রথম পদক্ষেপের পক্ষে এরকম ব্যতিক্রম কোনো অসুবিধা করবে না।

আবৃত্তি করার জন্য ছন্দ চিনতে বসে, তা হলে, এই হল আমাদের একটা

নির্ণয়। যে সব কবিতা পড়ার বা বলার জন্য আমাদের এই পদ্ধতি কাজে লাগবে, তাকে আমরা পর্বভাগের ছন্দ বলবো।

আর এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ কবিতা আমরা পাবো। যেগুলো এরকম ঘন ঘন তাল ফেলে পড়তে আমাদের অস্বস্তি বোধ হবে। সে সব ছন্দ পড়বার জন্য যেন একটি পংক্তিকে মাত্র দুটি বা তিনটি ভাগে ভাগ করতে হয়। সে ভাগগুলি ওরকম সমান মাপের নয়। এবং সে রকম এক-একটি ভাগের পরে আমরা বেশ দাঁড়িয়ে পড়তে পারি। দাঁড়িয়ে স্বরকে একটু বিস্তার দিতে পারি। উদাত্ত করে ডাক দেওয়ার মতো বিস্তার। এক একটা ভাগে দাঁড়িয়ে, গলা ছেড়ে স্বরকে একটু সময় ছড়িয়ে পড়তে দিয়ে, পরবর্তী ভাগ থেকে নতুন করে চলা শুরু করতে পারি।

মরিতে চাহি না আমি / সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি / বাঁচিবারে চাই

(রবীন্দ্রনাথ)

ধূসর পাংশুল মাঠ / ধেনুগণ ধায় উর্দ্ধমুখে
ছুটে চলে চাষী

(রবীন্দ্রনাথ)

এই ছন্দে যেন 'মরিতে চাহিনা আমি' পর্য্যন্ত একটানে বলে একবার দাঁড়াতে হয়, এবং স্বরটাকে খানিকটা অনুরণিত হতে দেওয়া হয়। তারপর আবার পরবর্তী অংশটিকে একেবারে বলে আবার স্বরটিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তেমনি, দ্বিতীয় উদাহরণেও 'ধূসর পাংশুল মাঠ' পর্য্যন্ত একটানা বলে, থেমে, স্বর বিস্তার করে, 'ধেনুগণ ধায় উর্দ্ধমুখে' একটানে বলে, থেমে, তারপর 'ছুটে চলে চাষী'ও একই ভাবে বলতে হয়। আবৃত্তির লয় অনুযায়ী অবশ্য এই মধ্যবর্তী দাঁড়ানোর সময় ও স্বরের বিস্তার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই ছন্দে আগেরটির মতো,

মরিতে চা / হিনা আমি / সুন্দর ভু / বনে
মানবের / মাঝে আমি / বাঁচিবারে / চাই

বা ধূসর পাং / শুল মাঠ / ধেনুগণ / ধায় উর্দ্ধ / মুখে
ছুটে চলে / চাষী

এইভাবে খণ্ড খণ্ড করে, প্রতি খণ্ডের মাথায় তাল রেখে গড়িয়ে চলার ব্যাপার নেই। সেরকম ঠ্যাং ঠ্যাং করে তাল বাজিয়ে এ ছন্দ পড়তে গেলে আমাদের অস্বস্তি হবেই।

এই ছন্দে আমরা একটানে কিছুদূর বলে, যে দাঁড়াই, এবং এরকম দাঁড়াবার ফলে পংক্তিগুলি যে কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়, সেই ভাগগুলি মাপে বেশ বড়, লম্বা। পর্ব্বের মতো ছোটো নয়। ওই ভাগ-গুলিকে বলে 'পদ'। তাই মোহিতলাল একে ডাকেন 'পদ-ভাগের ছন্দ' নামে। আমরাও আপাতত ওই নামেই ডাকবো।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি / তাই আমি / পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর / ------

(জীবনানন্দ)

হে দারিদ্র, তুমি মোরে / করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ / খ্রীষ্টের সম্মান

(নজরুল্ ইস্লাম্)

কিন্তু গোয়ালার গলি / দোতলা বাড়ির /
লোহার গরাদে দেওয়া /
একতলা ঘর /

(রবীন্দ্রনাথ)

বিদীর্ণ করেছি মাটি/দেখেছি আলোর আনাগোনা/
শিকড়ে আমার তাই/অরণ্যের বিশাল চেতনা/

(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

তবু তার দুই শঙ্খ স্তনে/
পূজার বন্দনা বাজে/আদিগন্ত রাত্রির নির্জনে।

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

ছন্দের চরিত্র অনুযায়ী আবৃত্তি করার দু' রকম রীতি বা পদ্ধতি আমরা জানলাম। একটিতে প্রায় গানের মতো নিয়মিত তাল রেখে বলতে হবে, তরঙ্গটা তুলতে হবে। অন্যটাতে পংক্তিগুলি বড় বড় ভাগে ভাগ করে, বেশ খানিকটা ছেড়ে ছেড়ে উদাত্ত করে বলতে হবে। কাছাকাছি তাল পড়ার

ফলে পর্ব্বভাগের ছন্দে যেন একটা নেচে চলার ব্যাপার, গড়িয়ে চলার তরলতা থাকে ; অবশ্য বিষয়ভেদে এ-ও কখনো দ্রুত-চটুল কখনো গম্ভীর-মন্থর হয়। কিন্তু পদ-ভাগের ছন্দ থেকে এর চরিত্র (অন্তত আবৃত্তিকালে যা ফুটে ওঠা উচিত) সম্পূর্ণ আলাদা। পদ-ভাগের ছন্দে যেহেতু ঘন-ঘন তাল ও তজ্জনিত তরঙ্গদোলা নেই, সে অত্যন্ত স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির। অনেক উদাত্ত তার ধ্বনি। নৃত্যপরায়ণ নয়।

ভবিষ্যতে যখন ছন্দের জটিল অরণ্যে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠবো, তখন দেখবো এই দুই চরিত্রের প্রতিবেশীর মধ্যেও বেশ গলাগলি আছে। কখনো এর বৈশিষ্ট্য ও আত্মসাৎ করছে, কখনো ওর ধরনধারণ এর মধ্যেও খানিকটা ফুটে উঠছে। তা হলেও, মূল চরিত্রটা বজায় থাকে ঠিকই।

কোথায় কার কতটা চরিত্রহানি ঘটছে আর সংকর পদ্ধতিতে কী জন্ম নিচ্ছে, সে-ও খুব মুখরোচক আলোচনা। সময়মতো করা যাবে।

প্রাথমিকভাবে আমরা ছন্দের সাধারণ নিয়ম (উপরিবর্ণিত) বজায় রেখে, কমা-সেমিকোলন ইত্যাদি কিছুটা অগ্রাহ্য করেই, ছন্দ চিনতে শিখবো এবং পড়বো। এরকমভাবে এগোলে ছন্দ চেনা ও পড়ার একটা সহজ রাস্তা পাওয়া গেল।

ভাব ও বিষয় অনুযায়ী ছন্দ পড়ার বা বলার গতি বা লয় পর্ব্ব-ভাগের ছন্দেও নিয়ন্ত্রিত হবে। এ ছন্দে তাল্ ঠুকে চলা হয় বলে যে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধশ্বাসে চলতে হবে এমন নয়।

আজ হৃদয়ের/জাম ধরা যত/কবাট ভাঙিয়া/দাও
রঙ করা ওই/চামড়ার যত আবরণ খুলে/নাও

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

আমার এ ঘর/ভাঙিয়াছে যেবা/আমি বাঁধি তার/ঘর
আপন করিতে/কাঁদিয়া বেড়াই/যে মোরে করেছে/পর

(জসীমউদ্দিন)

স্মৃতির বালুচরে/মুখেরা ভিড় করে/
কেন যে ভিড় করে/আমি তো ক্লান্ত।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

(আজি) রক্ত নিশি ভোরে/একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল/বন্দী শৃঙ্খলে…

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

বনের কাছে/এই মিনতি/ফিরিয়ে দেবে/ভাই
আমার মায়ের/গয়না নিয়ে/ঘরে ফিরতে/চাই

(আল্ মাহমুদ্)

সাজিয়ে নিয়ে/জাহাজখানি/বসিয়ে হাজার/দাঁড়ি
কোন্ নগরে/যাবো দিয়ে/কোন্ সাগরে/পাড়ি

(রবীন্দ্রনাথ)

ইহার চেয়ে/হতেম যদি/আরব বেদুইন্
চরণ তলে/বিশাল মরু/দিগন্তে বি/লীন

(রবীন্দ্রনাথ)

মিনতি মম/শুন হে সুন্/দরী
আরেকবার/সমুখে এস/প্রদীপখানি/ধরি

(রবীন্দ্রনাথ)

উদ্ধৃত উদাহরণ কয়টি যে একই লয়ে বলা হবে না, তা আবৃত্তি করে দেখলে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে।

এখন পাশাপাশি কয়েকটি কাব্যপংক্তি সাজিয়ে দেওয়া যাক্, যার কোনোটা উপর্যুপরি তাল ঠুকে পড়তে হবে, অর্থাৎ পর্ব্বভাগের ছন্দ, আর কোনোটা বড় বড় ভাগে ভাগ করে ছেড়ে ছেড়ে বলতে হবে, অর্থাৎ পদ-ভাগের ছন্দ।

আজি হতে শতবর্ষ পরে/
কে তুমি পড়িছ বসি/আমার কবিতাখানি/
কৌতুহল ভরে?

পদ (রবীন্দ্রনাথ)

বাঁশবাগানের/মাথার ওপর/চাঁদ উঠেছে/ওই
মাগো আমার/শোলোক্ বলা/কাজ্‌লা দিদি/কই

পর্ব্ব (যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

পাষাণের/স্নেহধারা/তুষারের/বিন্দু
ডাকে তোরে/চিতলোল্/উতরোল্/সিন্ধু

পর্ব্ব (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

সুদূর সীমান্ত, হায়/তারপর সরে গেছে/প্রতি পায়ে পায়ে
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে/মুছে দিয়ে গেছে সব পথ

পদ (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

নদীর বুকে/বৃষ্টি পড়ে/জোয়ার এল/জলে
লুকিয়ে থাকা/আশার মতো/
বাঁশের ফাঁকে/ইতস্তত:/
একটি দুটি/ম্লান জোনাক/ক্বচিৎ নেভে/জ্বলে

পর্ব্ব (বুদ্ধদেব বসু)

কিন্তু আমরা/দেশ দেখি না/অন্ধকারে
নৈশ বিদ্যা/লয়ের থেকে/চুপি চুপি
পালিয়ে আসি/জলের ধারে।

পর্ব্ব (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

যেতে পারি/
যে কোনো দিকেই আমি/চলে যেতে পারি।
কিন্তু কেন যাবো?
সন্তানের গাল ধরে/একটি চুমো খাবো।

পদ (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

আপাতত রবীন্দ্র, নজরুল, যতীন বাগচী, সত্যেন দত্ত, সুকান্ত, জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, নীরেন্দ্রনাথ, সুনীল, শক্তি প্রমুখ কবিদের বই ঘেঁটে এই দু'রীতির আবৃত্তির জন্য ছন্দ নির্ণয়ের অনুশীলন চালানো যেতে পারে।

কেবল একটাই প্রশ্ন এখন। কী ভাবে বলবো? পদ-ভাগ রীতিতে? না পর্ব্বভাগ?

এই নির্ণয় বিষয়ে প্রভূত অনুশীলন চালিয়ে আত্মপ্রত্যয়ে পৌঁছতে পারলে, ছন্দের প্রচলিত নাম বা পরিচয়ের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বিষয়ে ভাবা যাবে।

বাংলা ছন্দ হিসেবে যে তিনটি নাম এ পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিক পরিচিত ও আলোচিত, তা হ'ল অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। আমরাও আপাতত এই তিন নামেই এদের ডাকবো। এদের বয়স একটু বাড়ার পর এদের নামদাতাই এসব নাম পরিবর্তন করে যে নতুন ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে আমাদের কিছুদিন পরে পরিচয় ঘটাই সুবিধাজনক।

এই পর্য্যন্ত আসার পর, আমি যে পথে পা-টি বাড়াবো অর্থাৎ যে কথাটি বলবো, সঙ্গে সঙ্গে ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ সকলেই যে হাঁ-হাঁ করে উঠবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সকলেই মুঠো মুঠো ব্যতিক্রমের উদাহরণ এনেও হাজির করবেন। কিন্তু আমরা আপাতত তাতে কর্ণপাতও করবো না। তাঁদের যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে এবং এই সব সদুপদেশ অগ্রাহ্য করেই শিক্ষার্থী-সুলভ চপলতায় পরের পদক্ষেপটি করবো।

যে সব কবিতাকে আমরা পদ-ভাগের ছন্দ বলে চিনেছি (আগেই বলেছি, এই চেনার মধ্যে সংশয় থাকলে এই ধাপে পা রাখা ঠিক হবে না) তাদের বিনা দ্বিধায় অক্ষরবৃত্ত বলে ডাকবো। অক্ষরবৃত্ত বলতে কী বোঝায়, কেমন করে তাদের মাত্রা হিসেব করে, মাত্রা বলতেই বা কী বোঝায় এসব কথায় পরে আসছি। আপাতত, আমরা পদ-ভাগের ছন্দ বলে সনাক্ত করতে পারলেই তাকে অক্ষরবৃত্ত-এর দলে ঠেলে দিলুম।

তারপর আমাদের হাতে রইল পর্ব্ব-ভাগ। আর হাতে রইল দুটি নাম। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। মুশ্‌কিলটা হ'ল এই যে, যা আমাদের পর্ব্বভাগপ্রধান ছন্দ, অর্থাৎ কি না যা ঘন ঘন হাতে তাল রেখে পড়ার উপযোগী, তার মধ্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত দুটি ছন্দই পড়ে। শ্রদ্ধেয় মোহিতলালের ভাগ অনুযায়ী এই দুই মক্কেলকে সহজেই আলাদা করা যেতো এই বলে, যে একটা হ'ল সাধুভাষার ছন্দ, অন্যটা প্রাকৃত বা কথ্যভাষার। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, আজকাল নিপাট সাধু তো কেউ-ই নেই, শেষে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। আর সে ধাঁধায় পড়ে আমাদের ছন্দ শেখার সাধু উদ্দেশ্যটি শেষ পর্য্যন্ত অকালে প্রাণ হারাবে। তাই, ও রাস্তায় না গিয়ে আমরা বরং ধ্বনির দিক থেকে এই ছন্দ দুটোকে আলাদা

করে চেনার চেষ্টা করি। যখন মাত্রা-টাত্রা গুণতে শেখা হয়ে যাবে, তখন আঙ্কিক সেই সব প্রমাণ দিয়ে আমাদের নির্ণয়ের পরীক্ষা হতে পারবে।

(১) দিনের আলো / নিভে এল / সূর্যি ডোবে / ডোবে
আকাশ ঘিরে / মেঘ জুটেছে / চাঁদের লোভে / লোভে
(রবীন্দ্রনাথ)

এবং (২) দিন শেষ / হয়ে এল / আঁধারিল / ধরণী
আর বেয়ে / কাজ নাই / তরণী
(রবীন্দ্রনাথ)

বা (৩) বসন্ত বায় / সন্ন্যাসী হায় / চৈত্ ফসলের / শূন্য ক্ষেতে
মৌমাছিদের / ডাক দিয়ে যায় / বিদায় নিয়ে / যেতে যেতে
(রবীন্দ্রনাথ)

এবং (৪) নমো নমো নমো / সুন্দরী মম / জননী বঙ্গ / ভূমি
গঙ্গার তীর / স্নিগ্ধ সমীর / জীবন জুড়ালে / তুমি
(রবীন্দ্রনাথ)

পাশাপাশি আবৃত্তি করলে (১) ও (২) এবং (৩) ও (৪) এর মধ্যে ধ্বনির একটা তফাৎ কি কানে বাজে?

প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণে প্রতিটি পর্বের মাথায় যে তালটি পড়ছে, সেই ধ্বনি যেন অনেক বিস্ফোরক, ছিট্‌কে ছিট্‌কে উঠছে এবং পর্ব্বের মধ্যকার সমস্ত বর্ণগুলির উচ্চারণ যেন কেমন ঠাসা। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ও চতুর্থ উদাহরণে পর্ব্বের গোড়াতে ঝোঁক তত ছিট্‌কে উঠছে না, কেমন যেন একটা পেলব গীতলতা রয়েছে এই ছন্দের ধ্বনিতে। পর্ব্বমধ্যস্থ ধ্বনিও অত ঠাস্‌বুনট্‌ নয়, একটু প্রসারিত।

প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণ স্বরবৃত্তের। দ্বিতীয় ও চতুর্থ উদাহরণ মাত্রাবৃত্তের। এইভাবে ধ্বনির দিক্ থেকে বিচার করে পর্ব্বভাগে আবৃত্তিযোগ্য কবিতার মধ্য থেকে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তকে পৃথক করার চেষ্টা আমাদের অনুশীলনের একটা ধাপ। আরও কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক্।

বহুকালের / সাধ ছিল তাই / কইতে কথা / বাধছিলো
দুয়ার খুলে / দেখিনি ওই / একটি পর / মাদ ছিলো
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

পথের বাঁশি / পায়ে পায়ে / তারে যে আজ / করেছে চন্‌ / চলা
আনন্দে তাই / এক হ'ল তার / পৌছনো আর / চলা

(রবীন্দ্রনাথ)

দরজা ছিল / বন্ধ একটা / দরজা ছিল / খোলা
জান্‌লা ছিল / তিনটে চারটে / দরজা ছিল / বন্ধ

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

নোটন্‌ নোটন্‌ / পায়রাগুলি / খাঁচাতে বন্‌ / দী
একটুখানি / ভাত পেলে তা / ওড়াতে মন্‌ / দি

(শঙ্খ ঘোষ)

পারিস যদি / তাই হবে রে / সেই আশাতেই / আছি
লক্ষ্মী সোনা / মাণিক আমার / ভাতে পড়ছে / মাছি'

(অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়)

এখন আমি / সময় করে / ছি
তোমার এবার / সময় কখন / হবে ?

(রবীন্দ্রনাথ)

দিব্যি ছিলেন / খোশ্‌মেজাজে / চেয়ারখানি / চেপে
একলা বসে / ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ / গেলেন / খেপে

(সুকুমার রায়)

এইগুলি সবই স্বরবৃত্তের ধ্বনি। বারে বারে আবৃত্তি করে এর পর্ব্বাঙ্গ ঝোঁক ও পর্ব্বমধ্যস্থ ধ্বনির ঠাস্‌বুনট্‌ লক্ষ্য করুন। এ হ'ল কান দিয়ে চেনা।

এর পরবর্তী উদাহরণ লক্ষ্য করুন।

যুথী পরিমল / আসিছে সজল / সমীরে
ডাকিছে দাদুরী / তমাল কুঞ্জ / তিমিরে

(রবীন্দ্রনাথ)

নদীর কিনারে / বাড়িটি থাকবে / চৌকো
থাকবে শ্যাওলা- / রাঙানো একটি / নৌকো
ফিরে এসে খুব / আল্‌তো ডাকবো / বউ কই ?
রাজী ?

(মৃদুল দাশগুপ্ত)

তোমাকে চাই আমি / তোমাকে চাই
তোমাকে ছাড়া নেই, / শান্তি নেই,
রক্তকিংশুকে / জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী / রাত্রি দিন।

(অরুণকুমার সরকার)

এখন আর / কী আছে বাকি / বলো ?
শূন্য হাত / বুকের কাছে / খোলা,
কঠোর শ্রমে / জীবন ঘষে / ঘষে
নগ্ন নিজ / মূর্তি গড়ে / তোলা।

(আল্‌ মাহমুদ্‌)

এ মন ক / খনো যদি
হয় অমা / রাতে দিক্‌ / ভ্রান্ত,
পলকে সে / খুঁজে পাবে
আলোর নি / শানা, পাবে / স্বর্ণিস / সকালের / প্রান্ত

(কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত)

এ হচ্ছে মাত্রাবৃত্তের ধ্বনি। লক্ষ্য করুন, এখানে পর্বের গোড়ায় ঝোঁকগুলি তত প্রবল নয়, বিস্ফোরক নয়। ঝোঁক একটা আছে ঠিকই, কিন্তু তা অনেক মৃদু। দ্বিতীয়তঃ, পর্বমধ্যস্থ ধ্বনি তত ঠাস্‌ নয়, একটু তরল। একটু বেশী শীতল।

আর একটি কথায় এই দুই ছন্দের প্রভেদ উল্লেখ করা যায়। অনেকেই ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিষয়টির উল্লেখ করে থাকেন। তা হচ্ছে এই যে, স্বরবৃত্ত ছন্দের লয় হচ্ছে দ্রুত এবং মাত্রাবৃত্ত অপেক্ষাকৃত মন্থর। অর্থাৎ মধ্যলয়ের। এর মধ্যে সত্য আছে অনেকটাই, কিন্তু আবৃত্তিকারের কাছে এ

সত্য খুবই আপেক্ষিক। আবৃত্তির লয় মূলতঃ নির্ভর করে বিষয় ও ভাবের ওপর। তাই একই ছন্দের আবৃত্তিতে দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিত লয় হয়েই থাকে। কোনো নির্দিষ্ট ছন্দের জন্য লয়ের নির্দিষ্টতার তাই আবৃত্তিকারের কাছে কোনো মূল্যই নেই। যেমন দেখুন, স্বরবৃত্তকে বলা হয় মাত্রাবৃত্তের তুলনায় দ্রুততর ; অথচ,

ডাক্তারে যা / বলে বলুক্ / নাকো
রাখো রাখো / খুলে রাখো /
শিয়রের ঐ / জান্‌লাটাকে
গায়ে লাগুক্ / হাওয়া
ওষুধ ? আমার / ফুরিয়ে গেছে / ওষুধ খাওয়া।

(রবীন্দ্রনাথ)

এই স্বরবৃত্ত যে লয়ে আবৃত্তি হবে, তা কি

শৈলের / পৈঠায় / এসো তনু / গাত্রী
পাহাড়ের / বুকচেরা / এসো প্রেম / দাত্রী।
পান্নার / অঞ্জলি / দিতে দিতে / আয় গো
হরি চর / ণ চ্যুতা / গঙ্গার / প্রায় গো।

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই মাত্রাবৃত্তের চেয়ে দ্রুততর ?

সাধারণভাবে আবৃত্তি করলেই এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই, অর্থাৎ স্বরবৃত্তকেই মন্থরতর বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। আর যদি কোনো আবৃত্তিকার এতদূর কল্পনাশক্তির অধিকারী এবং দক্ষ হ'ন যে দ্বিতীয় কবিতাংশটিতে গড়িয়ে চলা ঝর্ণার গতিবেগ সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, তা হ'লে তো স্পষ্টতই, মাত্রাবৃত্তটিই ক্ষিপ্রতর হয়ে ধরা দিতে বাধ্য।

উদাহরণ আরো টানা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন দেখি না। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট হতে পারে যে ছন্দের লয়কে তার প্রকৃতি বিচারের সূত্র হিসেবে আবৃত্তিকারের সামনে তুলে ধরার কোনো যুক্তি নেই। বিষয়ের অনুভব ও আবৃত্তিকারের কল্পনাশক্তিই আবৃত্তির লয় নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা নেয়

ঘন ঘন তাল রেখে পড়ার পর্বভাগের ছন্দের মধ্যে থেকে আমরা ধ্বনির বিচার করে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত আলাদা করে চিনবো পর্বান্ত ঝোঁক- ও পর্বমধ্যস্থ ধ্বনির ঘনতা বা তরলতা দিয়ে। পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া এই দুই ধরনের ছন্দ-ধ্বনি বারবার আবৃত্তি করে দেখলে এই পার্থক্য ক্রমেই চেতনার গভীরে ঘা দেবে।

এখন আবার কয়েকটি কাব্যপংক্তি পাশাপাশি সাজানো যাক্। যার কোনোটা স্বরবৃত্ত, কোনোটা মাত্রাবৃত্ত।

মনে পড়িল কি / ঘনকালো এলো / চুলে
অগুরু ধূপের / গন্ধ,
শিখি-পুচ্ছের / পাখা সাথে দুলে / দুলে
কাঁকন দোলন/ছন্দ

(রবীন্দ্রনাথ)

সে মধুরাতে / আকাশে ধরা / তলে
কোথাও কিছু / ছিল না রূপ / গতা
চাঁদের আলো / সবার হয়ে / বলে
যত মনের / কথা

(রবীন্দ্রনাথ)

আসছে এবার / অনাগত / প্রলয় নেশার / নৃত্যপাগল
সিন্ধুপারের / সিংহদ্বারে / ধমক্ হেনে / ভাঙ্‌ল আগল।

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

মাটি, গাছ / তীর সব / একেবারে / ফেলে দিয়ে / আসা
সুবিশাল / ডানা মুড়ে / নোনা ঢেউয়ে / আল্‌গোছে / ভাসা

(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

শুদ্ধোধন / দাশগুপ্ত
শুদ্ধোধন / দাশগুপ্
ঘরের কোণে / বসে আছো
কেন অমন / চাপ্ চুপ্ ?

(অন্নদাশংকর রায়)

বুঝি না ঠিক / কিসের জন্যে / এতটা পথ /
এমন করে / ছুটে এলাম।
বুঝি না ঠিক / কার বিরুদ্ধে / এত যুঝি,
এই ধুলো জল / জালের মধ্যে / কাকে খুঁজি ?
উড়িয়ে দিয়ে / সকল পুঁজি
কাকে পেলাম ?

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

আমার লতার / একটি মুকুল / ভুলিয়া তুলিয়া /
রাখিয়ো- তোমার / অলক বন্ধ / নে
আমার স্মরণ / শুভ সিন্দুরে / একটি বিন্দু /
আঁকিয়ো—তোমার / ললাট চন্দ / নে

(রবীন্দ্রনাথ)

জড়ায়ে আছে বাধা / ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যাথা / বাজে
মুক্তি চাহিবারে / তোমার কাছে যাই /
চাহিতে গেলে মরি / লাজে

(রবীন্দ্রনাথ)

দোষ কি তাহার ? / ওই মেয়েটি / মিছিমিছি / এমনি হাসে
গাঁয়ের রাখাল / অমন রূপে / কেম্‌নে রাখে/পরাণটা সে ?

(জসীমউদ্দিন)

যা হোক্, এগুলির কোন্‌টা কী, তা নিয়ে বিচার বিবেচনা চলুক, কিছু পরে উত্তরটা জানিয়ে দেওয়া যাবে। ততক্ষণে অন্য আর একটা জরুরী কথা সেরে নিই।

ধ্বনির দিক থেকে এই ছন্দ চেনায় অনেক সময় কিছু ধন্দও লাগে। অনেক মাত্রাবৃত্তে ধ্বনিবিন্যাস এমন থাকে যে পর্বান্ত ঝোঁক খুব প্রবল হয়। যেমন,

যাত্রীরা / রাত্তিরে / হতে এল / খেয়া পার
বজ্রেরি / তূর্যে এ / গর্জেছে / কে আবার
প্রলয়েরি / আহ্বান / ধ্বনিল কে / বিষাণে
ঝঞ্ঝা ও / ঘন দেয়া / স্বনিল রে / ঈশানে

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

বা, পঞ্চশরে / দগ্ধ করে / করেছ এ কী / সন্ন্যাসী
বিশ্বময় / দিয়েছ তারে / ছড়ায়ে।

(রবীন্দ্রনাথ)

তখন ধ্বনির দিক থেকে কানে শুনে বিচার করতে গেলে পর্বাগ্ন ঝোঁকের জন্য একে স্বরবৃত্তই মনে হবে। কিন্তু ভালো করে কান পাতলে পর্বমধ্যস্থ ধ্বনির প্রসারিত চরিত্র থেকে এদের মাত্রাবৃত্ত বলে চিনে নিতে অসুবিধে হবে না। পরে যখন মাত্রা হিসেব করে ছন্দ মিলিয়ে নেবার কায়দাটা জানা হয়ে যাবে, তখন এ সব অসুবিধে আর থাকবে না।

এইরকম অসুবিধে হতে পারে স্বরবৃত্তের ক্ষেত্রেও,

ব্যথার সাঁতার / পানি ঘেরা /
চোরাবালির / চর,
ওরে পাগল / কে বেঁধেছিস্ /
সেই চরে তোর / ঘর ?

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

আমরা অভ্যাসবশতঃ এই কবিতা একটু টেনে টেনে বলি।

তেমনি,

আমাদের এই / গ্রামের নামটি / খঞ্জনা
আমাদের এই / নদীর নামটি / অঞ্জনা
আমার নাম তো / জানে গাঁয়ের / পাঁচজনে
আমাদের সেই / তাহার নামটি / রঞ্জনা

(রবীন্দ্রনাথ)

এ-ও আমাদের সুর করে টেনে টেনে বলা অভ্যেস।

সেই অভ্যেসের বশবর্তী হয়ে এর ধ্বনিকে মাত্রাবৃত্ত মনে করা অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে, ওই সুর করে বলার অভ্যাস ত্যাগ করে পংক্তিগুলিকে সঠিক ভাবে পড়তে চেষ্টা করলে যথাযথ ধ্বনি কানে ধরা দেবে।

এখন, ওপরে সাজিয়ে দেওয়া দৃষ্টান্তগুলির কোন্‌টি কোন্‌ ছন্দ বলে নিই। আপনারা যেমন নিরূপণ করেছেন, সেগুলি মিলিয়ে নিন। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম উদাহরণ মাত্রাবৃত্তের। বাকিগুলি স্বরবৃত্ত।

স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মাত্রাগুলির বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন রকম। তাই এদের চাল-চলন ও ধ্বনি ভিন্নরকম। একই শব্দের উচ্চারণও তিন ছন্দে তিনরকম হয়। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো কোন্‌ ছন্দে কী ভাবে উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেইটা বুঝে নিতে পারলেই ছন্দোজাত এই ধ্বনির তারতম্য ও ছন্দের চলনের এই পদভূমক ও পর্ব্বভূমক চরিত্র সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। কিন্তু আমরা এখনই সেই সূক্ষ্ম হিসেবে যাব না। তার আগে একটু মোটা দাগের একটা হিসেব শিখবো। যেটা স্থূল বটে, কিন্তু সহজবোধ্য। এই অভ্যাসে হাত পাকাতে পারলে তারপর চূড়ান্ত হিসেব শেখা যাবে।

মাত্রা বলতে কী বোঝায়, সেটা তার আগে বুঝে নেওয়া দরকার। মাত্রা হ'ল মাপার একক। অর্থাৎ ধরা যাক্‌, একটা কাঠের টুকরোর দৈর্ঘ্য মাপা হবে। হাতের কাছে কিছু নেই, কী দিয়ে বোঝাবো সেটা কত লম্বা? দুটি আঙুলের ফাঁকটিকে ব্যবহার করা হ'ল, যাকে বলে বিঘৎ। তাই দিয়ে মেপে বলা হ'ল, 'দু বিঘৎ লম্বা'। কাঠটিকে মাপার জন্য তাহ'লে এখানে বিঘৎ-কে মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করা হ'ল। ঠিক ভাবে বললে, 'বিঘৎ' পদ্ধতিতে কাঠের টুকরোটির মাত্রা হ'ল 'দুই'।

এবার হয়তো একটি স্কেল বা ফিতে পাওয়া গেল। তার ইঞ্চি-গজ-ফুট দিক্‌টি দিয়ে মেপে দেখা গেল, ঐ টুকরোটি ষোলো ইঞ্চি লম্বা। ঠিকভাবে বলতে গেলে ইঞ্চি পদ্ধতিতে টুকরোটির দৈর্ঘ্যমাত্রা হল 'ষোলো'। আবার ফিতাটির সেন্টিমিটার অঙ্কিত দিক দিয়ে মাপলে দেখা গেল, দৈর্ঘ্য দাঁড়াল ৩৯ সেন্টিমিটার। তা হলে সেন্টিমিটার পদ্ধতিতে ঐ একই কাঠের টুকরোর দৈর্ঘ্যমাত্রা হ'ল, ৩৯।

একই কাঠের টুকরো, অথচ এক এক পদ্ধতি অনুযায়ী মাপলে দৈর্ঘ্যমাত্রা দাঁড়াচ্ছে দুই, ষোল এবং উনচল্লিশ।

সেই ভাবে, একই শব্দকে ছন্দের এক এক পদ্ধতিতে এক এক রকম মাপে

ব্যবহার করা হয়। সেই হিসাব আবার উঠে এসেছে সেই ছন্দে শব্দটির যেভাবে উচ্চারণ হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়া থেকে। এই উচ্চারণ ও হিসেবের প্রত্যক্ষ যোগটা আমরা চূড়ান্ত হিসেব শেখার সময় শিখবো। আপাতত, সম্পূর্ণ নিখুঁত নয় কিন্তু প্রাথমিকভাবে শেখার সুবিধে এমন একটা হিসেব দিয়ে আমরা কাজ চালাবো।

ছন্দের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে বাংলায়। তাদের নাম যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বঃবৃত্ত আমরা জেনেছি আগেই। কোন্ পদ্ধতিতে শব্দকে কীভাবে মাপা হয়, সেটা বোঝার জন্য দু-একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। যেমন, 'নির্ঝর' শব্দটি।

অক্ষরবৃত্তে এর মাপ ৩ মাত্রা।

নি-১, ঝ´-১, র-১

এক একটি বর্ণ, সে যুক্ত বা অযুক্ত যাই হোক্, এক মাত্রা। এইরকম স্থূল বা প্রাথমিক হিসেব আমরা আপাতত শিখবো। এবং সেই অনুযায়ী 'বর্ণ' ও 'অক্ষর' একই অর্থে গ্রহণ করে 'অক্ষরবৃত্ত' নামটির সার্থকতা বুঝে নেব।

মাত্রাবৃত্তে নির্ঝর-এর মাপ ৪ মাত্রা। কী ভাবে? আমরা উচ্চারণ অনুযায়ী সব যুক্তাক্ষরগুলিকে ভেঙে ফেলবো। তারপর বর্ণগুলি গুণে নেবো। অর্থাৎ।

নির্ঝর = নির্ঝর্

চারটি বর্ণ পাওয়া গেল। তাই, চার মাত্রা। এও স্থূল বা অপ্রকৃত হিসেব। বারবারই উল্লেখ করতে হচ্ছে, এখন এরকমই শিখে, ছন্দ চেনার কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাবো। পরে বিশুদ্ধ হিসেব শেখা যাবে।

স্বরবৃত্তে এর মাপ দু'মাত্রা। একমাত্র এই হিসেবটাই আমরা সঠিক শিখছি এখন থেকেই। একটা শব্দে য'টা সিলেব্‌ল্, ত'টা মাত্রা। কাজেই,

নির্ঝর = নির্. ঝর্ = ২ মাত্রা

তাহ'লে 'নির্ঝর' শব্দটি অক্ষরবৃত্তে তিনমাত্রা, মাত্রাবৃত্তে চার মাত্রা, স্বরবৃত্তে দু'মাত্রা। অনুরূপভাবে, এই শব্দ কয়টিতে মাত্রার হিসেব দেখে নেওয়া যাক্।

	অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত
অনিরুদ্ধ	অ. নি. রু. দ্ধ	অ. নি. রু. দ্. ধ.	অ. নি. রুদ্. ধ
	৪ মাত্রা	৫ মাত্রা	৪ মাত্রা

	অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত
ছন্দ	ছ. ন্দ.	ছ. ন্. দ.	ছন্. দ
	২ মাত্রা	৩ মাত্রা	২ মাত্রা
পঞ্চতন্ত্র	প. ঞ্চ. ত. ন্ত্র.	প. ন্. চ. ত. ন্. ত্র.	পন্. চ. তন্. ত্র
	৪ মাত্রা	৬ মাত্রা	৪ মাত্রা
অনিন্দ্যসুন্দর	অ. নি. ন্দ্য. সু. ন্দ. র	অ.নি.ন্.দ. সু.ন্.দ.র্	অ. নিন্. দ.সুন্.দর্
	৬ মাত্রা	৮ মাত্রা	৫ মাত্রা

পর্ব-ভাগের ছন্দে আমরা যে প্রতি পর্বে তাল রেখে রেখে পড়ছি, এটা নিশ্চয় বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই যে প্রতি পর্বের উচ্চারণকাল সমান মাপের না হলে এটা সম্ভব হ'ত না।

আমরা মাত্রাগণনার যে পদ্ধতি শিখেছি সেই সব পদ্ধতি আরোপ করে প্রতি পর্বের মাত্রাগণনা করবো এবং দেখবো সেই মাপ প্রতি পর্বে সমান হবে। ধ্বনির দিক থেকে মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত চিনতে যদি কখনো কোনো সংশয় দেখা দেয়-ও, তখন আমরা যে পদ্ধতিতে হিসাব করে পর্বগুলির সমান মাত্রা পাবো, ছন্দটিকে সেই পদ্ধতির বলে নির্ণয় করতে আর কোনো অসুবিধা হবে না।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্ব ৪, ৫, ৬ বা ৭ মাত্রার হয়। এবং যে মাপে পর্ব গঠিত হচ্ছে, সমগ্র কবিতা জুড়ে প্রত্যেক পর্বের সেই মাপই চলবে। এক পর্বে চার, আর এক পর্বে ছয়, এরকম হবে না। কারণ, সমান সময়ের দূরত্বে তাল রেখে বলা হবে।

দু'টি মাত্রাবৃত্ত পংক্তির মাত্রা হিসেব করে দেখা যাক্।

| | | | | | | | | | | | | | | |

যদিও সন্ধা / আসিছে মন্দ্ / মন্থরে

৬ ৬ ৪

| | | | | | | | | | | | | | |

সব সংগীত/গেছে ইংগিতে/থামিয়া

৬ ৬ ৩

(রবীন্দ্রনাথ)

এইভাবে লেখা হয়। এই মাত্রাবৃত্তের গঠন হ'ল ৬,৬,৪, ৬,৬,৩ মাত্রার। পংক্তি শেষের টুকরোটির নাম যে ভাঙা বা খণ্ড পর্ব, তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে

যে এই অংশটি মূল পর্বের চেয়ে মাপে ছোট হবে। যেমন, এখানে মূল পর্ব বা পূর্ণপর্ব ৬ মাত্রার। ভাঙা পর্ব প্রথম পংক্তিতে চার মাত্রার, দ্বিতীয় পংক্তিতে তিন মাত্রার।

মাত্রাবৃত্তের আর একটি পংক্তি নেওয়া যাক্।

| | | | | | | | | | | | | |
ধ্বনিল গগনে/আকাশ বাণীর/বীণ
৬ ৬ ২

| | | | | | | | | | | | | | | | |
শিশির বাতাসে/দূরে দূরে ডাক/দিল কে
৬ ৬ ৩

(রবীন্দ্রনাথ)

এখানে পর্বগুলি ৬ মাত্রার, খণ্ডপর্ব প্রথম পংক্তিতে ২ মাত্রা, পরের পংক্তিতে ৩ মাত্রার। মাত্রাবৃত্তে মূল পর্ব বা পূর্ণ পর্বগুলি সর্বত্র সমান মাপের হবে। কিন্তু খণ্ডপর্বগুলি নানা মাপের হতে পারে।

এবার দেখা যাক্ অন্য আর একটি পংক্তি।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
আমার মায়ের/সোনার নোলক/হারিয়ে গেলো/শেষে
৬ ৬ ৫ ২

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
হেথায় খুঁজি/হোথায় খুঁজি/সারা বাংলা/দেশে
৫ ৫ ৫ ২

(আল্ মাহমুদ্)

মাত্রাবৃত্ত রীতিতে এর মাত্রা গুণে দেখা যাচ্ছে, পূর্ণপর্বগুলিই কোথাও ৬, কোথাও ৫ মাত্রার হচ্ছে। মাত্রাবৃত্তে এরকম চলতে পারে না, কাজেই এটা স্বরবৃত্ত। আমরা জানি, স্বরবৃত্ত রীতিতে মাত্রা গোণার পদ্ধতি হচ্ছে, এক একটি দল্ (syllable) এক একটি মাত্রা। সেইভাবে হিসেব করে দেখা যাক্।

| | | | | | | | | | | | | | |
আ. মার্. মা. য়ের্/সো. নার্. নো. লক্./হা. রি. য়ে. গে. লো./শে. ষে.
৪ ৪ ৪ ২

| | | | | | | | | | | | | | | |

হে. থায়্. খুঁ. জি/হো. থায়্. খুঁ. জি./সা. রা. বাং. লা./দে. শে.

৪ ৪ ৪ ২

দেখা যাচ্ছে, স্বরবৃত্ত পদ্ধতিতে হিসেব করে সব পূর্ণ পর্বই ৪ মাত্রা মাপের ও ভাঙা পর্ব দুটি দু' মাত্রার হচ্ছে। কেবল 'হারিয়ে গেল' পর্বটি পাঁচ মাত্রার। অনেকে বলেন, 'হারিয়ে' আসলে 'হায়্‌রে' উচ্চারণ হয় বলে ওটা ৪ মাত্রারই হবে। এ যুক্তিরও একটা মূল্য আছে। যেহেতু, হারিয়ে=হায়্+ইয়ে বলা যায়। এবং 'ইয়ে' ঠিক দ্বিস্বর (dipthong) এর মতো প্রলম্বিত উচ্চারণ না হয়ে অর্ধস্বর বা গড়ানো স্বর হিসেবে ye-র মতো সংক্ষিপ্ত, সংশ্লিষ্ট বা একমাত্রিক উচ্চারণ হয়। তেমন ভাবলে, 'হার্'=১ মাত্রা এবং ইয়ে=এক মাত্রা হিসেবে উচ্চারণ করা সম্ভব। এ যুক্তি মেনে নিলে, এই দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে একটা সমাধানে আসা গেল। কিন্তু, আসলে মাত্রাবৃত্তে যেমন সব কটা পর্বই নিখুঁত সমান মাপের হবে, স্বরবৃত্তে তত কড়াকড়ি নেই। মাত্রাবৃত্ত যত ফিটফাট, মসৃণ, স্বরবৃত্ত তুলনায় একটু এবড়ো-খেবড়ো, উস্কো-খুস্কো। তাই একটু উদারও। এর পূর্ণ পর্বে কম পড়তে পড়তে দুই মাত্রা পর্যন্ত নেমে গেলেও এ ঠিকই কাজ চালিয়ে নেয়। আবার বাড়তে বাড়তে ছ' মাত্রা পর্যন্ত ভারী হলেও নির্বিবাদে চলে। যেমন,

| | | | | | | | | | |

বাই. রে. কে. বল্./জ. লের্. শব্. দ/ঝুপ্. ঝুপ্/ঝুপ্.

৪ ৪ ২ ২

এখানে, 'ঝুপ্-ঝুপ্' পর্বটি দুই মাত্রার। কিন্তু ছন্দ টলে যাচ্ছে না।

তেমনি,

| | | | | | | | | | | | | | | |

কাজি ফুল্/কুড়োতে কুড়োতে/পে. য়ে গে. লাম্/মা. লা.

৩ ৬ ৪ ২

এখানে 'কুড়োতে কুড়োতে' ৬ মাত্রার ভার নিয়েও অক্লেশে চলেছে। এইমাত্র স্বরবৃত্তের যে এবড়ো-খেবড়ো ব্যাপারটার কথা বললাম, সেটা এই পংক্তিটিতে বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে। ৩, ৬, ৪ তিনটে বিভিন্ন মাত্রার পূর্ণ-পর্ব নিয়ে কেমন ছুট্‌ছে ছন্দ।

যা হোক, স্বরবৃত্তে তা হলে আমরা সিলেবল্ বা দল্ ধরে হিসেব করে যাবো। সাধারণতঃ, এর পূর্ণ পর্বগুলি ৪ মাত্রার হবে। দু' একটা পর্বে

কম বেশী হলেও ক্ষতি নেই। আমরা প্রথমতঃ ধ্বনির দিক্ থেকে তো চিনে নিচ্ছিই, তার পর হিসেব।

আর অক্ষরবৃত্ত যেহেতু পদ-ভাগের ছন্দ, দুটি বা তিনটি ভাগে বিভক্ত পংক্তির ভাগগুলি ভিন্ন মাপের হবে বটে, কিন্তু প্রতি 'পদে' মাত্রার পরিমাণ ২ এর গুণিতকে হবে—বিজোড় সংখ্যায় হবে না। সাধারণতঃ পদগুলি ৪, ৬, ৮, ১০ বা ১২ মাত্রার হয়।

ছন্দ নিরূপণ করে, কীভাবে বিশ্লেষণসহ লিখে অনুশীলন করা হবে, তাই উদ্ধৃত করি,

| | | | | | | | | | | | | |
কণ্টক মুকুট শোভা/দিয়াছ তাপস
৮ ৬

| | | | | | | | | | | | | |
অসঙ্কোচ প্রকাশের/দুরন্ত সাহস
৮ ৬

(নজরুল্ ইস্লাম্)

৮:৬ পদভূমক/অক্ষরবৃত্ত

| | | | | | | | | | | | | | |
আনো মৃদংগ /মুরজ মুরলী/মধুরা
৬ ৬ ৩

| | | | | | | | | | | | | | |
বাজাও শংখ / হুলুরব করো/বধূরা
৬ ৬ ৩

(রবীন্দ্রনাথ)

৬.৬.৩ পর্বভূমক/মাত্রাবৃত্ত

| | | | | | | | | | | | | | |
পু. কুস্ ম. রাই./ সব্. জি বা. গান্./ জং. লা ডু. রে / শা. ড়ী
৪ ৪ ৪ ২

| | | | | |

তার্ মা. নেই্. তো / বা. ড়ী

৪ ২

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

(৪।৪,৪।২, ৪ ২) পর্বভূমক/স্বরবৃত্ত

এইভাবে কিছুদিন অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। তারপর পরবর্তী ধাপ।

পদভাগ ও পর্বভাগের ধর্ম বুঝে, আমরা অক্ষরবৃত্তকে পৃথক ভাবে চিনে নিয়েছিলাম মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের থেকে। এই চেনা আবৃত্তি করবার রীতির দিক থেকে। পরবর্তী পর্য্যায়ে, পৃথকীকৃত পর্ব-ভাগের ছন্দের মধ্যে ধ্বনির দিক থেকে আমরা পৃথক করতে চেষ্টা করেছি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত-কে। আবৃত্তির সময় প্রতি পর্বে যে ঝোঁক পড়ে, তার ঠেস্ ও ধ্বনির শীতলতা ইত্যাদি এই বিচারের সূত্র। অতঃপর আমরা বর্ণ গুণে গুণে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এবং দল্ গুণে স্বরবৃত্ত ছন্দের মাত্রা হিসেব করার একটা শর্টকাট পদ্ধতিও বুঝে নিয়েছি। সেভাবে কিছুদিন ছন্দের অনুশীলন চলা আবশ্যক।

তারপর আমরা ছন্দ-বিচারের ও মাত্রা হিসেবের উন্নততর পদ্ধতির দিকে যাবো। যাবো, কেন না, কাজ চালাবার মতো হলেও আমাদের শেখা ঐ বর্ণ-গোণা পদ্ধতির সঙ্গে আমরা আবৃত্তিকালে যে ভাবে উচ্চারণ করি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মিল নেই। উন্নততর পদ্ধতিটি না শিখলে, আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি ঠিক সেইভাবে মাত্রা হিসেব করা যাবে না। তাছাড়া ছন্দোবিজ্ঞানও এখন এই উন্নততর সোপানটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বর্ণ-গোণা পদ্ধতিতে কোথায় গর্মিল্ ছিল, সেটা বুঝে নেওয়ার জন্য একটা উদাহরণের শরণাপন্ন হওয়া যাক্।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

অ. ন্ধ. ভূ. মি. গ. র্ভ. হ. তে/শু. নে. ছি. লে. সূ. র্যো. র্. আ. হ্বা. ন্

৮ ১০

অক্ষরবৃত্তে লেখা এই পংক্তিটিতে যে ভাবে মাথায় দাঁড়ি দিয়ে আমরা এক একটি মাত্রা দেখিয়েছি, উচ্চারণকালে সেই ভাবে কি আমরা উচ্চারণ করতে

পারবো ? অর্থাৎ, অ, ন্ধ, ভূ, মি, গ, র্ভ এগুলিকে আবৃত্তি করার সময় আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি মাত্রা হিসাবে উচ্চারণ করা কি সম্ভব হবে ?

উচ্চারণ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে আমরা আসলে উচ্চারণ করছি, এইভাবে,

∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ O O ∘ ∘ ∘ ∘

অন্ ধ. ভু. মি গর্ ভ. হ. তে/শু. নে. ছি. লে. স্বয়্. যেয়্. আও্. ভান্

অর্থাৎ উচ্চারণ করবার সময়ে কিন্তু আমরা এক-একটা দল্ এক একবার উচ্চারণ করছি। তা হলে, ওরকম এক একটি বর্ণকে, যুক্ত বা একক যাইহোক, একমাত্রা হিসেবে দেখালে, সেই হিসেব আমাদের আবৃত্তির রীতির সঙ্গে মিলবে কী করে ?

তবে কি আমরা ইতিপূর্বে স্বরবৃত্তের মাত্রা গণনার যে পদ্ধতি শিখেছি, সেখানে যেমন এক একটি দল্‌কে একমাত্রা হিসেবে গোণা হয়, অক্ষরবৃত্তেও তাই হবে ?

মাত্রার হিসেব কী ভাবে হবে, সেটা বোঝার আগে, আরও দু একটি বিষয় জেনে নেওয়া দরকার।

একটি শব্দের যতটুকু অংশ আমরা একবারে উচ্চারণ করি তাকে যে দল্ বলে, সেটা আমরা জেনেছি। যেমন, আগুন শব্দে দুটি দল্।

আ+গুন্

এখন, জানার দরকার যে এই দল্ দু'রকমের। রুদ্ধদল্, মুক্তদল্। যে দল্ উচ্চারণকালে আর টেনে দীর্ঘ করা যায় না, শেষ বর্ণে থেমে পড়তেই হয়, তাকেই বলি রুদ্ধদল্। যেমন, আগুন' শব্দে 'গুন্'। গুন্-ন্-ন্-ন্ এভাবে একে বাড়ানো যায় না। গুন্-এর ন-এর হসন্ত যেন এর গতিকে ঠেকিয়ে দেয়। রুদ্ধদলে শেষ বর্ণে একটি হসন্ত থাকতে হবে। স্বভাবতই, তার আগে একটি স্বরান্ত বর্ণ থাকতে হবে। যেমন 'গুন্' শব্দে 'গু'। 'ন্'—এই হসন্ত বর্ণটিকে বলে আশ্রিত বর্ণ ও (্) এই চিহ্নকে আশ্রয় চিহ্ন। এবং 'গু' কে বলি মুক্ত স্বরান্ত ব্যঞ্জন। অর্থাৎ একজন আশ্রয়দাতা মুক্ত স্বরান্ত ব্যঞ্জন ও একজন আশ্রিত বর্ণ—এই দুইয়ে মিলে একটি রুদ্ধদল্ হবে।

আর মুক্তদল্ হল গিয়ে মুক্ত, স্বাধীন; তাকে যত ইচ্ছে টেনে বাড়ানো যাবে। যেমন, আগুন শব্দে 'আ'। আ…… …, যত ইচ্ছে। এবং মুক্তদলের মধ্যে ওসব আশ্রয়-টাশ্রয়ের ঝঞ্ঝাট নেই, সে একেবারে একা।

এখন, পরপর কয়েকটি শব্দ নেওয়া যাক্।

কেন ? = কে. ন. = কে-মুক্তদল, ন-মুক্তদল,

অর্ঘ = অর্. ঘ = অর্-রুদ্ধদল, ঘ-মুক্তদল,

দুন্দুভি = দুন্. দু. ভি. = দুন্-রুদ্ধদল, দু-মুক্তদল, ভি-মুক্তদল্

উচ্চারণানুগ হিসেবের সময় এই রুদ্ধদল আর মুক্তদল এক এক ছন্দে এক একরকম মাত্রা পায়। আর দেখা যায় যে সেই অনুযায়ী-ই এক-একটি দল্ উচ্চারণে আমাদের স্থায়িত্বকাল।

স্বরবৃত্ত বলে যাকে আমরা চিনেছি, তার হিসেব হ'ল এই রকম যে, প্রতিটি দল্-ই সেখানে একমাত্রা হিসেবে গুণতে হবে। সে রুদ্ধ বা মুক্ত যাই হোক্ না কেন। 'একদল্ একমাত্রা' বলে, এখন থেকে এই ছন্দটিকে আমরা 'দলবৃত্ত' বলেই ডাকবো। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্।

ছুটবো মোরা/সরল্ প্রাণে/পর্ণকুটীর/হতে

একটু দ্রুত তাল্ রেখে, আমরা যেভাবে এই ছন্দ পড়ার সাধারণ ধরনের কথা জেনেছি—যে প্রতি পর্বের মাথায় একটু বেশী ঝোঁক থাকবে, পর্ব-মধ্যস্থ ধ্বনি ঠাস্‌বুনট্ হবে, বেশী প্রসারিত হবে না—সেভাবে পড়লেই দেখা যাবে যে প্রতিটি দল-ই এখানে আমরা সমান সময় নিয়ে উচ্চারণ করছি। পক্ষান্তরে, সেইরকম উচ্চারণ করার জন্যই পর্বের মধ্যে কোনো দল্-ই প্রসারণের সুযোগ পাচ্ছে না এবং প্রতি পর্বের শুরুতে ঝোঁকগুলি একটু বাড়তি চাপ আদায় করে নিচ্ছে।

এবার আসা যাক্, যাকে আমরা মাত্রাবৃত্ত বলে চিনেছি, সেই ছন্দের কথায়। 'দল্' হিসেবে বিচার করতে বসলে এখানে আর সব দল্-কে সমান সময়ের বখরা দেওয়া যাচ্ছে না। মুক্তদল্-কে এক মাত্রা হিসেবে ধরছি, কিন্তু রুদ্ধদল্-কে ধরতে হচ্ছে দু'মাত্রা। অর্থাৎ একটা মুক্তদল্ উচ্চারণ করতে আমরা যতটা সময় নেবো, রুদ্ধদল উচ্চারণ করতে নেবো তার দ্বিগুণ। 'আকাশ' শব্দ উচ্চারণ করতে হলে দলবৃত্তে আমরা করবো আ. কাশ্। 'আ' এবং 'কাশ্' এর জন্য সময়ের একই মাপ। কিন্তু মাত্রাবৃত্তে এই উচ্চারণ দাঁড়াবে আ. কা-শ.। কিন্তু এই হিসেবটা বোঝাবো কী করে ? যখন দলবৃত্তে প্রতিটি দল্‌কেই একমাত্রা বলেছিলাম, সেই মাত্রার মাপটিকেই বলেছিলাম দলমাত্রা। এখানে সব দল একই মাত্রা পাচ্ছে না, কাজেই, মাত্রাবৃত্তের মাত্রাকে দলমাত্রা বলা চলবে না। তার জন্যে একটা আলাদা উপায় চাই।

ফলের ভেতরে বীজের মতন কোনো দল্-এর ভেতরে একটা বীজ, কোনোটাতে দু'টি, এরকম ভেবে নিয়ে দল্-এর অভ্যন্তরস্থ ওই এক একটি বীজ বা ধ্বনি-পরিমাণকে 'কলা' বলা হয়। মুক্তদল্-এ একটি কলা, তাই উচ্চারণ করতে একক সময়। রুদ্ধদল্-এ দু'টি কলা, তাই, উচ্চারণ করতে দ্বিগুন সময়। এই মাত্রাকেও তাই দলমাত্রা না বলে কলামাত্রা বলবো এবং এই নতুন পরিচয়ের সূত্র ধরে মাত্রাবৃত্তকেও ডাকবো কলাবৃত্ত বলে।

এখন একটি পংক্তি নিয়ে বিচার করা যাক্।

ন য় নে আ মার্ / স জল্ মে ঘের্ / নীল্ অন্ জন্ / লেগেছে

মাত্রাবৃত্তের যে ধ্বনিবিচার আমরা কানে শুনে করতে শিখেছি, সেইরকম ভাবে পর্বমধ্যস্থ ধ্বনিপ্রসারণ বজায় রেখে, পর্বান্ত ঝোঁক খুব আল্গা রেখে গীতল ধ্বনিতে পংক্তিটি আবৃত্তি করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক রুদ্ধদল্ উচ্চারণ করতে মুক্তদলের তুলনায় দ্বিগুণ সময় লাগছে। 'আ' উচ্চারণে যা সময় 'মার্' উচ্চারণে তার দ্বিগুণ সময়। 'স' উচ্চারণে, 'মে' উচ্চারণে যা সময় 'জল্' ও 'ঘের্' উচ্চারণে তার দ্বিগুণ সময়। রুদ্ধদলে এই উচ্চারণ প্রসারণের জন্যই মাত্রাবৃত্তের পর্বমধ্যস্থ ধ্বনি এত তরল বা প্রসারিত। এরই ফলে এই ছন্দে গীতলতা।

এই পংক্তিটিতেই, রুদ্ধদল্গুলি প্রসারিত না করে, দ্বিগুণ সময় না দিয়ে, একক সময় দিয়ে উচ্চারণ করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে, পর্বের গোড়ায় ঝোঁকগুলি বেড়ে গেছে, পর্বমধ্যস্থ ধ্বনি ও ছন্দের সামগ্রিক ধ্বনি তার গীতলতা হারিয়েছে। এভাবে সমগ্র কবিতাটি সাবলীলতার সঙ্গে বলাও যাবে না। কিন্তু দু' একটি পংক্তি এভাবে বলতে চেষ্টা করলে, ছন্দের ধ্বনি দলবৃত্তের মতন শোনাবে। এ ছন্দের পক্ষে এ উচ্চারণ কৃত্রিম। তাই এরকম উচ্চারণ করে দেখলে, দলবৃত্ত ও কলাবৃত্তে দল্গুলি উচ্চারণের পদ্ধতির পার্থক্য বুঝে নেওয়া যাবে।

সঠিক আবৃত্তি করলে উপরের দৃষ্টান্তে প্রতি পর্বে ছয় কলামাত্রা পাওয়া যাবে। ছয় কলামাত্রার সমান সময়ান্তরে, হাতে তাল রেখে, সমগ্র পংক্তিটি বল্লে, কলাবৃত্ত ছন্দের সহজাত গীতল ধ্বনি কানে ধরা দেবে।

তারপর আসে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কথা। আলোচনার এই পর্য্যায়ের শুরুতে আমরা একটি অক্ষরবৃত্ত পংক্তি নিয়ে দেখিয়েছি যে বর্ণ (letter) অনুযায়ী মাত্রা হিসেব, যা আমরা শিখেছি, তার সঙ্গে আবৃত্তির উচ্চারণ রীতির মিল নেই। এও দেখিয়েছি যে আসলে আমরা এক একটি দল্ একবারে উচ্চারণ করি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রতিটি দল্ উচ্চারণ করতে কি একই সময় নিই?

বীণাতন্ত্রে হানো হানো / খরতর ঝংকার ঝন্‌ঝনা / তোলো উচ্‌চস্বর

পদভাগপ্রধান কবিতা যেভাবে বড় বড় ভাগে বলার কথা, সেই রকম করে উদাত্ত বিস্তার রেখে পংক্তিটি আবৃত্তি করে আবৃত্তিকালে প্রতিটি দল্‌ কীরকম সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হচ্ছে সেদিকে কান রাখলে, পদ্ধতিটি বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে। দেখা যাবে যে, এই ছন্দে প্রত্যেকটি মুক্তদল্‌ একমাত্রা হিসেবে একক সময়ে উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু রুদ্ধদল্‌ প্রত্যেকটি সমান সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হচ্ছে না। শব্দের শেষে থাকছে যে রুদ্ধদল্‌, তার উচ্চারণ করতে সময় লাগছে দ্বিগুণ। শব্দের গোড়ায় বা মধ্যে থাকলে রুদ্ধদল্‌-ও মুক্তদলের মতই একক সময়ে উচ্চারিত হচ্ছে। এখানেও, যেহেতু সর্বত্র দল্‌গুলি একই মাপের নয়—তাই এর মাত্রাকেও কলামাত্রাই বলা দরকার। কিন্তু এর হিসাব কলাবৃত্তের মত সরল নয় যে রুদ্ধদল্‌ হলেই দু'মাত্রা আর মুক্তদল্‌ হলেই একমাত্রা ধরা হবে। এর হিসেবে দলবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের হিসেব কষায় একটা মিশ্রণ রয়েছে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মিশ্রকলাবৃত্ত বা সংক্ষেপে মিশ্রবৃত্ত। এখন, মিশ্রবৃত্তের ওই পংক্তিটি আবৃত্তি করে উচ্চারণের মাপগুলি নীচের প্রদর্শিত হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাক্‌।

| | | | | | | | | | | | | || | | |
বী.ণা. তন্‌. ত্রে. হা. নো.   হা. নো./খ.র ত. র. ঝং. কার্‌. ঝন্‌. ঝ. না.
৮   ১০

| | | | ||
তো. লো.   উচ্‌. চ.   স্বর্‌.
৬

এই-ই হচ্ছে ছন্দ-নির্ণয় ও মাত্রাগণনার সঠিক পদ্ধতি। এখন আমরা আগের শেখা কাজ-চালানো-গোছ রীতি ছেড়ে নবলব্ধ রীতি অনুযায়ী ছন্দ-বিচার ও বিশ্লেষণ করবো। যে কোনো ছন্দোবদ্ধ কাব্যপংক্তি তুলে এনে, এইভাবে এ অনুশীলন চলবে। এই অনুশীলনকালে মনে রাখতে হবে, কোনো কবিতারই তিন-চার লাইন পড়ে তার ছন্দ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়, কবিতার সবখানিতে অনুমিত ছন্দটির যাথার্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো উচিত।

| | || || | | | | | | || | | | |

অন্. ত. হীন্ সেই. মউ. ন/ উচ্. ছ. সি. ল নীল্. গুচ. ছ. ফু. লে.

৮ ১০

৮/১০ মিশ্রবৃত্ত / পদভাগপ্রধান

| | | | || | | || | | | || | || || |

-না. ব. লা. ক. থায়্. / আ. ভা. সেয়্. ম. তো. /নী. লাম্. ব. রেয়্/প্রান্. ত.

৬ ৬ ৬ ৩

৬।৬।৬।৩ কলাবৃত্ত/পর্বভাগপ্রধান

| | | | | | | | | | | | | |

ছুট্. ব. আ. মি. / স. রল্. প্রা. ণে / পয়্. ণ. কু. টীয়্. / হ.তে

৪ ৪ ৪ ২

৪।৪.৪।২ দলবৃত্ত / পর্বভাগপ্রধান

সহজ কিন্তু আপাত-হিসাবটির অনুশীলন যেমন বহুল পরিমাণে প্রয়োজন ছিল, সঠিক পদ্ধতিটিরও ব্যাপক ও নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন।

ছন্দ-নির্ণয় ও ছন্দের মাত্রা হিসেবের অভ্যাস দৃঢ় হলে, ছন্দ চেনা বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ে পৌছতে পারলে, তখন কোন্ ছন্দের আবৃত্তি কী ভাবে হবে, তার অনুশীলন কোন্ দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে, কী ক্রমে সেই চর্চা এগোবে, এসব ভাবনা ও অনুশীলন আলাদাভাবে মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের জন্য করা প্রয়োজন।

এখন সেইদিকে এগোনো যাক্।

ছন্দ-চেনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর ছন্দ কেমনভাবে, কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে গলায় তুলে আনতে হবে, প্রকাশিতব্য অর্থ বা ভাব আর ছন্দে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা কেমনভাবে মিটিয়ে নিতে হয়, ছন্দ কোথায় স্বরক্ষেপণে সুর দাবী করে, কোথায় ছন্দের দোলাকে প্রচ্ছন্ন রেখে কথ্যভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার—এই সব খুঁটিনাটি প্রায়োগিক বোধ গড়ে নেওয়ার জন্য প্রতিটি ছন্দ পৃথক পৃথক ভাবে কণ্ঠে ধ্বনিত করার ধারাবাহিক অনুশীলন দরকার। কিন্তু এই চর্চা ছাপার হরফে চালানো প্রায় অসম্ভব, কান ও কণ্ঠের

মিলন ছাড়া এই চর্চায় তৃপ্তি নেই, বিকল্প হিসেবে নানা দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাপারটা বোধগম্য করার চেষ্টা চালানো যাক্।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের কথাই ধরা যাক্। এ হ'ল বড় পদক্ষেপের ছন্দ। এ ছন্দে পর্ব্বের প্রাধান্য নেই, পদেরই প্রাধান্য। তাই এ ছন্দ পড়বার সময়ে ছোট ছোট পর্বের তাল ঠুকে গড়িয়ে চলা নেই। প্রতিটি পংক্তি অসমান দুটি বা তিনটি পদে বিভক্ত করে নিয়ে বলতে হবে। কিন্তু সেই ভাগগুলি সর্ব্বদা দশ, আট, ছয়, চার বা দুই মাত্রার হবে। নিতান্ত ব্যতিক্রান্ত দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বিজোড় মাত্রায় এই ছন্দ বিভক্ত হয় না। কবির রচনা অনুযায়ী যেখানে অর্থের কারণে এরকম বিভাগ রয়েছে, সে ক্ষেত্রেও আবৃত্তিকারকে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে তাঁর কথনের স্বাভাবিক চাল হচ্ছে বড় পদক্ষেপে। সেই পদক্ষেপের স্থানটিতে তাঁকে পা ফেলতেই হবে। তার আগে-পরে কোনো কারণে যদি তিনি থামেন, তবুও, ওই স্থানটি উপেক্ষা করে বা ডিঙিয়ে গেলে চলবে না।

মরিতে চাহি না আমি / সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি / বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে এই / পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে / যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা / চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত / হাসি-অশ্রুময়—
মানবের সুখে দুঃখে / গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি / অমর আলয়।

আপাতত এই মিশ্রবৃত্তের উদাহরণ নেওয়া যাক্। ছন্দ বিষয়ে আবৃত্তির রীতি-পদ্ধতি ও সমস্যার দিক থেকে এটি একটি সরল দৃষ্টান্ত।

প্রত্যেক পংক্তিতে আট মাত্রার পর একটি বিভাগ দেখানো হয়েছে। পংক্তি প্রান্তেও, অর্থাৎ ছ-মাত্রার পরে আর একটি বিভাগ আছে। সময়ের হিসাবে অসমান এই দুটি ভাগে পা ফেলে আমাদের চলা। 'মরিতে চাহি না আমি' একই সঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে। এই আট মাত্রার ধ্বনি একটা সমষ্টি। 'ম' থেকে 'মি' পর্য্যন্ত ধ্বনিপ্রবাহ একটানা হবে।

মরিতে   চাহি না   আমি

এরকম মধ্যবর্তী কোনো ফাঁক বা শূন্যতা ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে থাকলে চলবে না। (তার মানে কিন্তু এই নয় যে, শব্দ তিনটিকে এক সঙ্গে জুড়ে ফেলতে হবে। শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করতে হবে কিন্তু দুটি শব্দের মধ্যে

ধ্বনির রেশ এমন থাকবে যে ধ্বনি সমষ্টি নিরবচ্ছিন্ন বলেই মনে হবে) এক সঙ্গে এই সমস্ত ধ্বনিটা প্রক্ষেপ করে অবশ্যই সামান্য সময় থামতে হবে। সেই থামাটা কাঠ-কাঠ নয়। ধ্বনির রেশ বজায় থাকবে বিরতির প্রারম্ভে। রেশ ফুরতে না ফুরতেই 'সুন্দর ভুবনে' বলতে হবে। এই অংশের ছ-টি মাত্রাও ধ্বনির একটি সমষ্টি। একটানা ধ্বনিপ্রবাহ বজায় রেখে ছ-টি মাত্রার ধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারিত হবে। শেষ হবে আগের মতই রেশ রেখে।

এই রেশ রাখা ব্যাপারটা ছাপার হরফে ঠিক্‌ঠাক্ বোঝানো মুশ্‌কিল। আমরা কোনো ফাঁকা প্রতিধ্বনিসম্ভব হল-ঘরে বা পাহাড়ের গুহায় চেঁচিয়ে কিছু উচ্চারণ করে প্রতিধ্বনির মজা উপভোগ করতে চাইলে যেমন একটু রেশ রেখে করি এবং প্রতিধ্বনিটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত পরবর্তী বাক্যটি প্রক্ষেপ না করে অপেক্ষা করি, মিশ্রবৃত্তের প্রতিটি পদ-ভাগের কণ্ঠোচ্চারিত প্রক্ষেপণ ও প্রতি ভাগে থেমে থাকার ধরন সেই প্রলম্বিত ক্রিয়ারই যেন একটু সংক্ষিপ্ত আকার। এরকম ভেবে নিলে, মিশ্রবৃত্তে সঠিক ধ্বনি উৎপাদন সহজ হয়।

অনেকে রেশ রেখে পড়া বলতে বা কবিতা পড়া বলতেই এক ধরণের সুর করে টেনে পড়া বোঝেন, যেমন সাধারণতঃ কবিদের কবিতা-পাঠ হয়ে থাকে। সে রকম নয়। এখানে ধ্বনিসমষ্টি কেবল শব্দ এবং বর্ণগুলির যথাযথ অনুনাদসহ উচ্চারণেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাড়তি টানের কোনো প্রয়োজন নেই। এবং পদ-ভাগের প্রান্তে যে ধ্বনির রেশ, তা-ও বাড়তি কোনো টান নয়, স্বাভাবিক অনুনাদ মাত্র।

দেখা যাচ্ছে, প্রতি পংক্তিতে দুটি পদ। এবং পদ-এর পরে একটু করে থামার প্রয়োজন পড়ছে সঠিক আবৃত্তি করতে গেলে। এই থামা প্রসঙ্গে দু-একটি পরিভাষার সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া ভালো। আমরা জানি, গদ্য পড়তে গেলেও আমাদের মাঝে মাঝে থামার প্রয়োজন পড়ে। থামা দু-রকমের। একটা থামা হল অর্থের কারণে। আর একটা থামা হ'ল শ্বাসদৈর্ঘ্যের কারণে। গদ্য পড়তে গিয়ে আমরা এমন এক-একটা লম্বা বাক্যের সাক্ষাৎ পাই, মানে বোঝানোর জন্য যার মাঝে থামবার কোনোই দরকার নেই, কিন্তু আমরা একদমে অতখানি বাক্য বলতে পারি না, তাই অর্থের প্রয়োজন ছাড়াও আমাদের মাঝে মাঝে স্টপেজ্ দিতে হয়। এই যে নিরর্থক থামা, একে বলি 'যতি', আর অর্থের প্রয়োজনে যে থামা তাকে বলি 'ছেদ'। এই ছেদের নির্দিষ্টতা আছে গদ্যে। কোথাও কম, কোথাও বেশী। কিন্তু গদ্যে যতির

নির্দ্দিষ্টতা সব সময় থাকে না। বিভিন্ন মানুষের শ্বাসদৈর্ঘ্য অনুযায়ী বাচনভঙ্গি অনুযায়ী, বিষয় অনুযায়ী, আবেগ অনুযায়ী, গদ্যে যতি-স্থান সর্ব্বদা পরিবর্তনশীল।

"উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্তিমিত মশালের আলোকে সহস্র সহস্র পল্লীর নিরক্ষর শ্রোতা নগ্নগাত্রে কটিবাস মাত্র পরিধান ও তৃণাসন মাত্র সম্বল করিয়া গায়েনের মুখ হইতে যে মনুষ্যার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে, তাহা যে তাহাদের বেদনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা প্রাণহীন ছাপার অক্ষরগুলি কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে ?"

(আশুতোষ ভট্টাচার্য্য)

এই দীর্ঘ্য বাক্যটির কণ্ঠোচ্চারণে বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্থানে যতি দেবেন, এটাই স্বাভাবিক।

পদ্যে বা কবিতাতেও আমাদের কেবলমাত্র অর্থের প্রয়োজনে থামতে হয় তা নয়। যদিও ছন্দোশাস্ত্রে 'যতি'র কথা বলতে গিয়ে শ্বাসের কারণে থামার প্রসঙ্গই তোলা হয়ে থাকে, কিন্তু পদ্যে 'যতি' ঠিক গদ্যের মতো নিয়মনিরপেক্ষ ব্যক্তিগত-শ্বাস-দৈর্ঘ্য নির্ভর নয়। ছন্দ ব্যাপারটাই একটা নিয়মের অন্তর্গত। থামা আর চলা মিলিয়েই সেই নিয়ম। থামা এবং চলার সেই নিয়মিত পদক্ষেপেই কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির মধ্যে তরঙ্গ ওঠে। আবৃত্তিকার এবং শ্রোতার মস্তিষ্কে জেগে ওঠে আবর্তনের প্রত্যাশা, তাঁদের কান প্রতীক্ষা করে সেই আবর্তনের। ছন্দোবদ্ধ কবিতায় যতি অনেক গুরুত্বের। যতি এখানে গতির অবরোধ বা নিয়ন্ত্রক মাত্র নয়, গতির পরিপূরক। গতির মধ্যে মধ্যে নিয়মিত যতিই আবর্তন গড়ে তোলে। উচ্চারিত বাক্যের মধ্যে দোলা আনে। তাই ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে যতিস্থানের বিরাম দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য নয়। অনেককেই দেখা যায়, আবৃত্তি করার সময়ে কবিতাপাঠের যে প্রচলিত ধরন, সুর করে টেনে টেনে পড়া, সেইভাবে পড়ে, তাঁরা যতিস্থানগুলিতে যথেচ্ছ থেমে থাকেন। আবৃত্তির ক্ষেত্রে ছন্দ-যতির ভূমিকা সম্পর্কে অনবধানই এরূপ ভ্রান্তির কারণ। ছন্দের কবিতায় যতিগুলি, তালনিবদ্ধ গানের তালিস্থানের মতোই আবৃত্তির ধ্বনিভাগ নির্দ্দেশক। যেমন, দাদরা একটি তাল। এই তালে নিবদ্ধ গানের সঙ্গে যখন তবলা বাজে। তখন,

ধা ধি না / না তি না

এই বোলটির ছ-মাত্রার মধ্যেকার যে বিভাগটি, তা কি বিরতির ?

ধা ধি না—

বলে দাঁড়িয়ে পড়ে স্থর টেনে, আবার না তি না—বলে দাঁড়িয়ে পড়ে স্থর টেনে বললে, এই তালটির সঠিক চাল্ কি ফুটে ওঠে?

আবার, ধাধিনানাতিনা একসঙ্গে উচ্চারণ করলে মধ্যবর্তী যতিটি অস্বীকার করা হয়। ফলে তরঙ্গটি ঠিকমতো ওঠে না। কিন্তু যতিটি যদি কেবলমাত্র বিভাগ দুটিকে স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং 'ধা'র মাথায় একটি তালি ও 'না'র মাথায় একটি তালি, এই দুই ঝোঁকে উচ্চারণ করা হয়, তবেই বোল্‌টির সঠিক ধ্বনিরূপ পাওয়া যায়। এই তালে নিবদ্ধ কোনো গান যতক্ষণ গাওয়া হবে, ততক্ষণ এই দুটি বিভাগের দুটি তালির মধ্যে সমগ্র গানের নিরবচ্ছিন্ন স্থর, ভাষা বা নীরবতা যাই-ই থাকুক, দোল খাবে। আবৃত্তির ক্ষেত্রেও, এই দোলা এবং ঝোঁক এবং তার নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনসাপেক্ষ। গানেও যেমন ভাষা ও ভাব অনুযায়ী কোথাও এই দোলা ও ঝোঁক খুব প্রকট, উন্মাদনাসৃষ্টিকারী, আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন কিন্তু স্পন্দমান, আবৃত্তিতেও ভাব ও ভাষা অনুযায়ী এই দোলার স্পষ্টতা-অস্পষ্টতা নিয়ন্ত্রিত হবে অবশ্যই।

স্পন্দ-প্রকৃতির দিক্ থেকে গানের তাল ও ছন্দের সঙ্গে আবৃত্তির তাল ও ছন্দের কোনোই পার্থক্য নেই। এই মৌলিক সত্যটিকে যাঁরাই অস্বীকার করেন, তাঁদের আবৃত্তিতেই ছন্দ কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পায় না।

গানের তালের সঙ্গে আবৃত্তির তালের পার্থক্য দু'জায়গায়। প্রথমত গানে একটি মাত্রার যা কাল-পরিমাণ, মন্থরতম আবৃত্তিতেও কাল-পরিমাণ তার চেয়ে কম। দ্বিতীয়তঃ, গানের তালের কাঠামোটা নানা নামে, নানা হিসাব-ছকে নির্দিষ্ট—দাদরা, একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি। সেখানে গানের ভাষাকে তাই ওরকম ছকে ফেলেই গাইতে হয়। কিন্তু আবৃত্তির ক্ষেত্রে তা হয় না। কবিতার ভাষাকেও ওরকম বাঁধা ছকে সাজানো হয় না। একই আবৃত্তিতে কখনো একবারে আটমাত্রাও উচ্চারিত হতে পারে। আবার কখনো টানা চব্বিশ মাত্রাও। এখানে চাল্‌টিই কেবল নির্দিষ্ট। চাল্-এর দোলাটাই নির্দিষ্ট। কয়েকটা পদক্ষেপ বা চাল্ মিলে একটা গোটা আবর্তন বারে বারে একই রকম ভাবে ঘটে না। নানারকম হতে পারে। কিন্তু ওই চাল্ বা পদক্ষেপজনিত ঝোঁক, দোলা, স্পন্দন ইত্যাদির তরঙ্গ গানের মতোই প্রবহমানতাসহ আবৃত্তির মধ্যে হাজির থাকবে।

একটি উদাহরণ নিলে প্রসঙ্গটি বোধগম্য হবে।

১	২	০	৩
সা সা জ্ঞ	র জ্ঞ -া	র মজ্ঞ -া	ঋ স দ্
দ য়া ০	দি য়ে ০	হ বে ০	গো মো র্
ণ্ স জ্ঞ	ঋ স -া	-া -া -া	-া -া -া
জী ব ন্	ধু তে ০	০ ০ ০	০ ০ ০

এই গানটি একতাল্-এ নিবদ্ধ। এই তালে প্রতি পদক্ষেপ তিনমাত্রার। গান গাইতে হলে তিনমাত্রার সমান চালে বাণী ও সুরকে উচ্চারণ করা যেমন দরকার, তিন-তিন-তিন-তিন বারো মাত্রার মোট আবর্তনে সম্ ও ফাঁক রক্ষা করে চলারও তেমনি দরকার। সেখানে ভাষা তালের এতই অধীন যে 'হবে গো মোর জীবন ধুতে' কথাটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই—যুক্তিপ্রসূত 'নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে' কথাটি বলে ওঠা চলে না,…

এ-এ-এ-এ-এ-এ-এ বলে সুরটি সাত মাত্রাকাল ধরে রাখতে হয়। এইখানে গানের তাল ও আবৃত্তির তালে পার্থক্য। এই পংক্তিটাই আবৃত্তি করলে,

দয়া দিয়ে / হবে গো মোর / জীবন ধুতে /
নইলে কি আর / পারবো তোমার / চরণ ছুঁতে
(রবীন্দ্রনাথ)

চারমাত্রার দলবৃত্ত ছন্দ হিসেবে, 'জীবন ধুতে' বলেই পরবর্তী তালি থেকেই 'নইলে কি আর'…বলতে পারা যাবে। কিন্তু যেমন পর্ব্ব-ভাগ করে দেখানো হয়েছে, সেভাবে প্রতি ভাগে তালি দিয়ে, সমান পদক্ষেপে বা চালে দোলাটি জাগিয়ে পংক্তি দুটি উচ্চারণ করতে হবে। তবেই সঠিক আবৃত্তি হবে।

দেখা গেল, ছয়, বারো, ষোলো ইত্যাদি মাত্রাসমষ্টির সম্ ও ফাঁক বজায় রেখে বাণী উচ্চারণ করার দায় আবৃত্তিকারের নেই। অর্থাৎ একটি ছন্দের ধ্বনিরূপ বিচারে যদি দুটি আবর্তনের অস্তিত্ব থাকে, একটি প্রতি পদক্ষেপ-জনিত ছোট আবর্তন, অপরটি সমগ্র মাত্রাসমষ্টির সম্-ফাঁক জনিত বড় আবর্তন, তবে সেটার অতিনির্দ্দিষ্টতা গানের ক্ষেত্রে। আবৃত্তিতে ছোট আবর্তনটাই বিচার্য্য। কোনো কবিতায় যদি এমন বাণীবিন্যাস থাকে, যে কোথাও কোনো চাল্ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কথা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবে চালের আবর্তনটুকু সম্পূর্ণ

করার জন্য আবৃত্তিকারকে এই স্বল্পকাল থেমে থাকতে হয়, পরবর্তী তালির অপেক্ষায়।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
মু দি ত আ লো র / ক ম ল ক লি কা / টি রে • • • •
রেখেছে সন্ধ্যা / আঁধার পর্ণ / পুটে • ০ • •

(রবীন্দ্রনাথ)

এক্ষেত্রে 'টিরে' বলেই 'রেখেছে সন্ধ্যা' বলতে পারেন না আবৃত্তিকার। অনেকেই ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেও বাক্যার্থের দিকে নজর রেখে এভাবে বলে থাকেন। তাঁরা যে ছন্দ ব্যাপারটাই বোঝেন না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাল বা ছন্দের ব্যাপারে আবৃত্তিকারের স্বাধীনতা অবশ্যই গায়কের থেকে অনেক বেশী, কিন্তু তিনি এতটাই উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ পেতে পারেন না। এইখানে ওই চারটি মাত্রা পরবর্তী তালির জন্য অপেক্ষা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই অপেক্ষার শেষে পরবর্তী পংক্তিটি তিনি পরের তালি থেকেই শুরু করবেন, না কি একটি তালি gap দেবেন, এ বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা আছে।

অবশিষ্ট চারটি মাত্রাই থামুন বা আরো একটি তালির অপেক্ষায় আরো ছ-মাত্রা থামুন, এই অবকাশে আবৃত্তিকার দম নিতে পারছেন। সেই অর্থে, এরকম ভাঙা-পর্বান্তিক যতি শ্বাসযতি হিসেবেও কাজ করছে। কেবল ওই ভাঙা-পর্বের পরের যতি বা যতির জন্য অপেক্ষা করার সময়টুকুকে শ্বাস নেওয়ার অবকাশ বলা চলে।

ছিলাম যবে / মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো / শিখাবে বলে
চোরাই করে / এনেছ মোরে / তুমি •••

(রবীন্দ্রনাথ)

আবৃত্তিতে ছন্দ রূপায়ণ সম্বন্ধে যে আলোচনা এ পর্যন্ত করা হ'ল তারই ভিত্তিতে নিশ্চয়ই এটা স্পষ্ট যে, এই পংক্তি কয়টির আবৃত্তিতে 'ছিলাম যবে' থেকে শুরু করে, প্রতি পর্বের মাথায় তালি দিতে দিতে, 'তুমি'তে পৌঁছে, তবে তিন মাত্রাকাল থামবার অবকাশ পাওয়া যাবে। সেখানেই শ্বাস নেওয়ার কথা।

কিন্তু শ্বাসদৈর্ঘ্য এতদূর না হওয়ার কারণে 'কোলে', 'বলে'র পরও থেমে থেকে একটি তালির অবকাশ নিতে পারেন আবৃত্তিকার।

পর্বভাগপ্রধান ছন্দে (কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত) এরূপ তাল রেখে চলাই আবৃত্তির রীতি। এই স্পন্দনকে, তালের এই নিয়মিত আবর্তনকে, যেখানেই অগ্রাহ্য করা হবে, কবিতার আবৃত্তিরূপ সেখানেই স্খলিতছন্দ হয়ে পড়বে। অনেক আবৃত্তিকারই ছন্দের চাইতে অর্থকে এতটাই গুরুত্ব দেন, যে যেখানে ছন্দ-যতি ও অর্থ-যতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তাঁরা অবলীলায় ছন্দের তাল ও চাল্-কে উপেক্ষা করে পংক্তিটিকে উচ্চারণ করেন এবং springকে সোজা করে ফেলার মতো, ছন্দকে বিনষ্ট করে ফেলেন। এবং তার পক্ষে এঁদের যুক্তি হ'ল এই যে, আবৃত্তিতে সবসময় এত ছন্দের গোঁড়ামি থাকলে আবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়। তাহলে তো গান গাইতে গিয়েও, একটি নির্দিষ্ট চালের অন্তর্গত গীতভাষাকে ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য হঠাৎ হঠাৎ তাল অমান্য করে গাইতে হয়। প্রকাশের সংকটে পড়লে ছন্দকে অগ্রাহ্য করে গদ্যভঙ্গিতে সেই পংক্তি উচ্চারণ করা আবৃত্তিকারের অক্ষমতারই পরিচায়ক। যত দুরূহ ভাবই হোক্, ছন্দ বজায় রেখে তাকে প্রকাশ করতে পারার মধ্যেই আবৃত্তিকারের সার্থকতা। কিন্তু সেটা করতে হলে ছন্দ ও তালের বোধ যেমন দরকার, তেমনি দরকার নিয়মিত অনুশীলনের। এরূপ দু'একটি সংকটক্ষেত্র উদাহরণসহ তুলে ধরা যাক্।

যবন না আমি / কাফের ভাবিয়া / খুঁজি টিকি দাড়ি / নাড়ি কাছা

(নজরুল্ ইস্লাম্)

এই পংক্তিটি কেবল টানা তাল রেখে বলে গেলে কখনোই অর্থ স্পষ্ট হবে না। 'কাফের' এর পর যেন একটি প্রশ্ন চিহ্ন এসে যায়। ফলে দ্বিতীয় পর্বটিতে ছ-মাত্রা যথাযথ সময়সীমার মধ্যে উচ্চারণ করে তাল বজায় রেখে চলা খুবই অনুশীলনসাধ্য। এই প্রশ্নবোধক অভিব্যক্তি চকিতে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তালেরই আবর্তনের মধ্যে। সে অনুশীলন-লব্ধ ক্ষমতার অভাবে অধিকাংশ আবৃত্তিকার পংক্তিটি—

যবন না আমি কাফের ?
ভাবিয়া খুঁজি টিকি, দাড়ি, নাড়ি, কাছা।

এই ভাবে ভেঙে, প্রতিটি উপরিদর্শিত কমায় দাঁড়িয়ে পড়ে গদ্যধর্মিতায় নিয়ে

চলে যান। এ আখছারই ঘটতে দেখা যায়। যেখানে এ সমস্যা আরও জটিল, সেখানে তো কথাই নেই।

একটি কবিতা / লেখা হবে। তার / জন্য
আগুনের নীল / শিখার মতন / আকাশ
রাগে রী রী করে। / সমুদ্রে ডানা / ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়। / ....

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

এ কবিতা তো প্রায় সকলেই বলেন এমন ভাবে,

একটি কবিতা লেখা হবে। / তার জন্য / আগুনের নীল শিখার মতন
আকাশ / রাগে রী রী করে / সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে দুরন্ত ঝড় /

....ছ-মাত্রার কলাবৃত্তে লেখা, পর্বের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য ছেদসহ এই জটিল ছন্দভাষার রূপায়ণ সঠিকভাবে করার জন্য আরও কয়েকটি বিষয় জেনে নেওয়া দরকার।

কোনো কোনো কবিতায় মূল পংক্তির সামনে একটি বা দুটি শব্দ বসানো থাকে। যেমন,

এই নীরব নিশীথ রাতে
শুধু জল আসে আঁখি পাতে

(নজরুল্ ইস্লাম্)

এই সামনের অংশটি (এই, শুধু) ছন্দের মূল চালের বাইরে। মূল ছন্দে যে পর্ব বা ভাঙা-পর্ব থাকে, তদপেক্ষা অতিরিক্ত এই সামনের দু একটি শব্দ বা শব্দ দিয়ে গড়া অসম্পূর্ণ পর্ব। এই পর্বকে বলা হয় অতি-পর্ব। ছন্দের মূল চালের বাইরে হলেও ছন্দের মূল কাঠামোর ওপর এই অতি-পর্ব বেশ একটা বাড়তি স্পন্দন সৃষ্টি করে। এই অংশটুকু দ্রুত পেরিয়ে এসে মূল পর্ব থেকে তাল শুরু হয়। গানের তালের নিরিখে এই অংশটিকে 'আড়ি' বলা যেতে পারে। এই অংশটিকে দ্রুত পেরিয়ে এসে যেন প্রথম পর্বটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়া হয়। ফলে, পর্বের ওপর ঝোঁকটি বেড়ে যায়,

আমি ছেড়েই দিতে / রাজী আছি / সুসভ্যতার / আলোক্

(রবীন্দ্রনাথ)

এই শিকল্ পরেই / শিকল্ তোদের / করবো রে বি / কল্

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

এরকম লম্বা পংক্তি হলে, সেই ঝোঁক্ এর চাপটি সমগ্র পংক্তিতেই চারিয়ে যায়। ফলে একটা অতিরিক্ত স্পন্দন জেগে ওঠে। একটা টান্ করা তারের কোনো প্রান্ত আঙুল দিয়ে আঘাত করলে যেমন সমস্ত তারটাতেই একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে।

ভৈরবী আর / গেয়োনাকো এই / প্রভাতে

নিয়মিত তাল রেখে এই পংক্তিটি উচ্চারণ করে তারপর,

ওই ভৈরবী আর / গেয়োনাকো এই / প্রভাতে

(রবীন্দ্রনাথ)

'ওই' অংশটি দ্রুত পার হয়ে এসে তাল রেখে পংক্তিটি উচ্চারণ করলেই অতি-পর্বজনিত ঝোঁকের প্রাবল্য ও তার দরুণ গোটা পংক্তিতে চারিয়ে যাওয়া স্পন্দনটি অনুভব করা যাবে।

যাঁদের তাল রেখে পড়বার সময়ে এই অতিপর্বগুলিকে উচ্চারণ করা প্রাথমিকভাবে অসুবিধাজনক মনে হয়, তাঁদের প্রথমে অতিপর্বগুলি বাদ দিয়ে ছন্দটি পড়ে, তারপর ছন্দের চালের মধ্যে অতিপর্বগুলিকে আত্মসাৎ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আমি বসে বসে তাই / ভাবি
নদী কোথা হতে এল / নাবি
কোথায় পাহাড় সে কোন্ / খানে
তাহার নাম কি কেহই / জানে

(রবীন্দ্রনাথ)

এই কাব্যাংশটি প্রথমে

বসে বসে তাই / ভাবি
কোথা হতে এল / নাবি
পাহাড় সে কোন্ / খানে
নাম কি কেহই / জানে

এইভাবে আবৃত্তি করতে হবে। তারপর এক এক করে এক-একটি পংক্তির

আগায় বসানো অতি-পর্বগুলি সমেত উচ্চারণের চেষ্টা করতে হবে। ক্রমে আবৃত্তির সঠিক অভ্যাস গড়ে উঠবে।

ছন্দোপ্রবাহের মধ্যে অর্থগত যতি বা ছেদ বজায় রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে হলে অতিপর্বিক স্পন্দনের ধ্যানধারণা ও অতিপর্ব উচ্চারণের সঠিক দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কমা থাকলে অল্প সময় থামা, সেমিকোলন থাকলে তার চেয়ে কিছু বেশী, দাঁড়ি থাকলে আরও বেশী—গদ্য পড়ার এরকম বোধ নিয়েই অধিকাংশ জন ছন্দোবদ্ধ কবিতাও আবৃত্তি করেন। এমন কি শেখানও। অধিকাংশ কবিকেও, যাঁরা ছন্দোবদ্ধ এই ভাষাগুলি রচনা করেন, দেখা যায়, ওইরকম বোধ নিয়েই কবিতা পড়তে। যে ভাষা তাঁরা লেখেন, সেই ভাষার যথার্থ স্পন্দন তাই তাঁদের কবিতা পাঠ-এ অনুপস্থিত।

ছন্দ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভালো আবৃত্তির শিক্ষা একটা সাধনা। কবিতা রচনা করার সময় আমি আবৃত্তি করে দেখি ...." ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যপংক্তি লিখে আবৃত্তি করে দেখতেন ছন্দস্পন্দ লেখ্য ভাষায় ঠিকভাবে ধরার জন্য, এই উক্তির যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে। তিনি যে-ভাষা লেখেন, সেই স্পন্দনই তাঁর কণ্ঠোচ্চারণেও শ্রুতিতে ধরা দেয়। ছন্দের চলন, ঝোঁক, এমন কি তালের বিভাগগুলিও তাঁর আবৃত্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায়। অন্যান্য কবিরা হয়তো ভাষায় শ্রুতিরূপটি এভাবে আপন কণ্ঠে পরীক্ষা করেন না। যদিও তাঁদের ছন্দ লেখায় কোনোই খুঁত থাকে না, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে সে ছন্দের উচ্চারণ অত্যন্ত বল্গাহীন। আবৃত্তি বিষয়ে ঔদাসীন্যই হয়তো এর কারণ।

কেবল কবি নয়, আবৃত্তিকারদের সম্পর্কেও, এক সাক্ষাৎকারে এই লেখকের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, প্রয়াত ছান্দসিক প্রবোধ চন্দ্র সেন, "আজকাল আর কেউ ছন্দে লেখা কবিতা ছন্দ রেখে আবৃত্তি করে না, সবাই গদ্য করে পড়ে দেয়।"

হয়তো ছন্দ বিষয়ে তত অভিনিবেশ নেই বা জানা নেই কোন্ ছন্দ কী ভাবে পড়তে হবে—এরকম একটা যুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী স্বরে বলেছিলেন ছন্দাচার্য্য, "না, না, এদের অন্যরকম যুক্তি আছে। এরা বলে যে ছন্দ নাকি প্রচ্ছন্ন থাকবে, প্রকট হবে না। লোকে আপনি বুঝে নেবে। সেটা যে কী ব্যাপার আমি বুঝি না। ছন্দে লেখা কবিতা যদি গদ্য করে বলা

হবে, তবে ছন্দে লেখা হয়েছে কেন? ধর, কেউ গান গাইতে এসে গানের ভাষাটা খুব ভাব দিয়ে বলে দিল, আর বলল যে এর মধ্যে একটা সুর আছে, সেটা লোকে আপনিই বুঝে নেবে। তবে সেটা কি গান হ'ল? আবৃত্তিও তাই। ছন্দ তোমায় গলায় আনতে হবে। না হলে আর আবৃত্তি কি?"

অবশ্য আবৃত্তিতে ছন্দোহীনতার এই অভিযোগ যে কেবল অর্থযতির জন্য ছন্দপতনের কারণে তা নয়, এ নালিশ ছন্দোচ্চারণে শৈথিল্যের সামগ্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে।

ছন্দোবদ্ধ ভাষার আবৃত্তিতে অর্থ-যতিকে দু'ভাবে প্রকাশ করা যায়। যতিস্থানে থেমে পড়ে পরবর্তী তালের জন্য অপেক্ষা করা অথবা স্বরভঙ্গির সামান্য উচ্চাবচতায় বা ঝোঁকের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা আবর্তিত গতির মধ্যেই যতির ইঙ্গিত দেওয়া।

ঠিকানা আমার / চেয়েছ বন্ধু /,
ঠিকানার সন্ / ধান্
আজও পাওনি? / দুঃখ যে দিলে
করব না অভি / মান?
(সুকান্ত ভট্টাচার্য্য)

এই কলাবৃত্তে, ছন্দের গতি অনুযায়ী প্রতিটি পর্বের মাথায় তাল্ দিয়ে আবর্তন বজায় রেখে চলতে চলতে সন্ধান্-এর ধান্-এতে পৌঁছলে তবে চারমাত্রার খালি জায়গাটায় দাঁড়াবার নিয়ম অথচ 'বন্ধু'র পরেই কমা বা অর্ধচ্ছেদটি, যা বাক্যের অর্থপ্রকাশের পক্ষে জরুরী, কী ভাবে প্রকাশ করা হবে?

যে রকম তাল রেখে বলা হচ্ছিল, সেইটি বজায় রেখে 'বন্ধু'তে আমরা থেমে যাব। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী তালিতেই 'ঠিকানার' আরম্ভ করবো না। একটি তাল পার করে দিয়ে পরের তালি থেকে আরম্ভ করবো। অনুরূপভাবে, 'আজও পাওনি'র পরের প্রশ্নবোধক চিহ্নে বিরতি বোঝানো যায়।

অথবা 'চেয়েছ বন্ধু'তে এবং 'আজও পাওনি'তে স্বরভঙ্গির মাধ্যমে অর্ধচ্ছেদ এবং প্রশ্নবোধক পূর্ণচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়ে, পরবর্তী পর্বের মুখে স্বরের বৃংবদল ঘটিয়ে দিলেই বিরতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে আর তালির আবর্তনের মধ্যে কোথাও থেমে পড়তে হবে না।

এই আলোচিত অর্থ-যতি বা বিরতি দুটিই কোনো না কোনো পর্বের শেষে রয়েছে। কিন্তু যদি

বহু চাঁদ, বহু / শ্রীমন্ত সদা / গর
চম্পা, তোমারই / পারুল মায়ার / লোভে
বাহিরকে ঘর / আপনকে করে / পর

(বিষ্ণু দে)

এরকম 'বহু চাঁদ, বহু' বা 'চম্পা, তোমারই'র মতো পর্ব-মধ্যস্থ অর্থজনিত অর্ধচ্ছেদ দেখা যায়, সেখানে ছন্দোপ্রবাহ বজায় রেখে এই বিরতিগুলি প্রকাশ করতে হলে ওই স্বরভঙ্গির ইঙ্গিত এবং স্বরের রংবদল তো কাজে লাগেই, তাছাড়াও দরকার হয় অতিপর্বজনিত স্পন্দনের বোধ ও অতিপর্ব উচ্চারণের দক্ষতা। কারণ, তালের আবর্তনের মধ্যে ওই স্বরভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়ে বিরতি বোঝাতে গেলেও অণুপরিমাণ সময় খরচ হয়। তারই ফলে, ওই পর্বে ছ-মাত্রার উচ্চারণকালে যে সামান্য সময়ের টান পড়ে, তার জন্য বিরতির পরবর্তী পর্বমধ্যস্থ মাত্রা কয়টির উচ্চারণ অতিপর্বের মতো দ্রুততায় করতে হয়। যেমন, 'বহু চাঁদ, বহু' পর্বের দ্বিতীয় 'বহু' শব্দটিকে। এবং তারই ফলে পংক্তির বাকি অংশে তালের আবর্তিত ধ্বনির ওপর বাড়তি একটা স্পন্দন ছড়িয়ে যায়।

ছন্দোমধ্যস্থ বিরতি বোঝাতে অপর যে কৌশলের কথা বলা হয়েছে,— অর্থযতির স্থানে থেমে গিয়ে পরবর্তী তালির জন্য অপেক্ষা করা, সে পদ্ধতি অনুসরণ করলে স্পষ্টতই, 'বহু চাঁদ, বহু/শ্রীমন্ত সদা/গর' পংক্তিতে 'বহু চাঁদ' বলে থামতে হয়। এবং পরবর্তী তালির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু পরবর্তী তালির মুখ থেকে 'বহু' শব্দটি আরম্ভ করা যাবে কি ?

বারবার আবৃত্তি করে দেখলে বোঝা যাবে, পরবর্তী তালি পড়ছে, 'শ্রীমন্ত' শব্দের মাথায়। অর্থাৎ থেমে থাকার পরও 'বহু' শব্দটি তালের বাইরে অতিপর্ব হিসেবেই উচ্চারণ করে নিতে হচ্ছে।

ছন্দোবদ্ধ কবিতার আবৃত্তিতে, তালের নিয়মিত আবর্তনের মধ্যে এই হ'ল অর্থ-যতির ভূমিকা। তা একদিকে বাক্যের অর্থ ও ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। সেই অনুসারে তৈরী হবে সেই বাক্যের intonation। বাক্যটির মোট দৈর্ঘ্য—একটি পূর্ণচ্ছেদ থেকে অন্য পূর্ণচ্ছেদের মধ্যবর্তী মাপ, তার অন্তর্গত অর্ধচ্ছেদ সকল, এসবের ওপরই নির্ভর করে বাক্যের সেই

intonation। কিন্তু সেই 'কথার সুর'কে চলতে হয় ছন্দের নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে, নিয়মিত আবর্তনে, এরকম বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গে। আবৃত্তিকার কেবল গদ্যধর্মী উচ্চারণে ছন্দের ইশারা করে যাবেন, এত সহজ নয় তাঁর কাজ। সেটা অধ্যাপক বা কবিতা ব্যাখ্যাতার কাজ হতে পারে, কিন্তু আবৃত্তিকারকে হতে হবে প্রকৃত প্রয়োগদক্ষ। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত শ্রুতিরূপের মধ্যে এই সমস্ত জটিল বিন্যাস ও তজ্জনিত প্রক্রিয়া মূর্ত হয়ে উঠতে হবে।

উচ্চারিতব্য বাক্যের intcnation আরও একটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তা হ'ল মিল। মূলত অন্ত্যমিল, তবে কখনো মধ্যমিলের ওপরেও। মিলের একপ্রান্তে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলে, অপর প্রান্তে তার নিরসন করার জন্য পংক্তিগুলিকে concave (উত্তল) ও convex (অবতল) ধরনে বলে, একরকম ঝোঁক্ ও তজ্জনিত intonation তৈরী করে নিতে হয়।

দেখিনু সেদিন / রেলে
কুলি বলে এক / বাবু সা'ব তারে / ঠেলে দিল নীচে / ফেলে।

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

ছন্দজনিত তালির আবর্তন, যতি-জনিত ভঙ্গি ইত্যাদি ছাড়াও 'রেলে' ও 'ফেলে' এই মিলের জন্য একটা অন্ত্য-ঝোঁক্ উভয়-পংক্তিতে থাকে। প্রথম পংক্তিটি যেন ccncave ও দ্বিতীয়টি ccnvex। এই পংক্তিপ্রান্তিক opening-closing (মুক্ততা-রুদ্ধতা) বাক্যের intcn tion এর ওপর এবং ছন্দের স্পন্দনের ওপর প্রভাব ফেলে। মিলগুলি দূরান্বয়ী হলে এই বুনন আরও জটিল হয়ে পড়ে।

তোমায় নিয়ে / আপন মনে / খেলা
কখনো আমি / খেলিনি ভালো / বাসা। *
লক্ষ্যহারা / রাজার মতো / শেষে
জীবনপণ / ধরেছিলাম / পাশা। *

(আল্ মাহমুদ)

প্রথম উদাহরণটিতে অন্ত্যমিল যেখানে মেলার স্বস্তি পায়, জাগিয়ে রাখা প্রত্যাশা যেখানে মেটে, সেইখানে বাক্যেরও শেষ। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে মিলের প্রত্যাশা যেখানে জেগে থাকে, বাক্য সেখানে শেষ হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে, অর্থের অন্ত থেমেও, অর্থ সম্পূর্ণ হ'ল বুঝিয়ে দিয়েও intonation এর মধ্যে এক ধরণের অপূর্ণতা জাগিয়ে রাখতে হবে, পরবর্তী তারকাচিহ্নিত পংক্তিতে মিল সম্পূর্ণ করার ঝোঁকসহ প্রক্ষেপণে সেই অপূর্ণতার পরিতৃপ্তি। কেবল মিলের দূরান্বয়ের জন্য প্রতীক্ষার ও প্রতীক্ষাপূরণের এই প্রক্ষেপণ, বাক্যের অর্থানুগ কথার সুর ও ছন্দের পদ পরম্পরের আবর্তে আবৃত্তির সামগ্রিক নির্মাণে আবৃত্তিকারের মেধা ও বোধকে সদাই আলোড়িত করে ও জাগ্রত রাখে।

মাগো, পাখির / গানের সুরে / মন
উদাস হয়ে/ ওঠে,
গান শুনে তার / হাওয়ায় মাথা / কোটে
উতলা ঝাউ / বন।

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এই উদাহরণে আবার দেখা যাচ্ছে মিল যেখানে সম্পূর্ণ, বাক্য সেখানে সম্পূর্ণ নয় (ওঠে, কোটে)। কাজেই এখানে মিলের প্রত্যাশা-বোধ মিটিয়ে দিয়েও, অর্থের অসম্পূর্ণতার জন্য অনাবৃকম intonation হবে।

ছন্দের চাল্ বজায় রেখে, মিলজনিত কথার ঝোঁক ও অর্থজনিত কথার সুর যথাযথ ধ্বনিত করতে চেষ্টা করলেই আবৃত্তির স্থাপত্যের এই দিক্‌টি পরিষ্কার হবে। এর সঙ্গে পূর্বাপর অধ্যায়ে আলোচিত কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যময় ও সুচিন্তিত প্রয়োগ, উচ্চারণের নানাবিধ যত্ন তো থাকছেই।

ছন্দ মিলের এই আলোচনা, যেখানে হাতে তালি দিয়ে কবিতা বলার নানা বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা গেল, বলাবাহুল্য, এর প্রায় সবটাই পর্বভাগপ্রধান ছন্দকে নিয়ে। অর্থাৎ এ সবই কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের সাধারণ কিছু আবৃত্তি-রীতির আলোচনা। যদিও, এই অধ্যায় শুরু হয়েছিল একটি মিশ্রবৃত্তের উদাহরণ দিয়ে (মরিতে চাহি না আমি), মিশ্রবৃত্ত ছন্দ বা পদভাগ-প্রধান ছন্দের আবৃত্তিরীতির কথায় আমরা আরো কিছু পরে আসবো।

পর্বভাগপ্রধান ছন্দে প্রতি পর্বে যে মাত্রা-ভাগ, সেই হচ্ছে একটি তালি থেকে অপর তালির মধ্যবর্তী কাল-পরিমাণ। আবৃত্তিকারকে যে সেই সমতালে পা ফেলে চলতে হবে, এটা এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট। ছন্দের মধ্যে পর্ব ও

ভাঙা-পর্বের বিন্যাস অনুযায়ী আবৃত্তিকার কোথায় থামতে পারেন বা পারেন না, সে সম্বন্ধেও বলা হয়েছে।

ছন্দের মধ্যে তালের আবর্তন ও থামা-চলার নিয়মকানুন বজায় রেখে আর দু-একটি বিষয়েও স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারেন আবৃত্তিকার। অবশ্যই এক্ষেত্রেও, ছন্দের নিয়ম, বাক্যের অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের দায়িত্বও তাঁরই।

প্রথমটি হ'ল, আবৃত্তির লয়। আবর্তন ঠিক রেখে যে কোনো ছন্দই দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিত লয়ে বলতে পারেন তিনি। কিন্তু যে কোনো লয়েই তাল না কেটে এই আবৃত্তি অভ্যাসসাপেক্ষ। কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের যে কোনো কবিতা নিয়েই বিভিন্ন লয়ে অভ্যাস করা যেতে পারে।

শরৎ, তোমার / অরুণ আলোর / অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল / ছাপিয়ে মোহন / অংগুলি

(রবীন্দ্রনাথ)

এই কবিতাটি বিভিন্ন লয়ে আবৃত্তি করে অনুশীলন করা যায়। এছাড়াও,

অশ্রুর মৌক্তিক
হাস্যের স্ফূর্তি
লহরের লীলা ঠিক
লাস্যের মূর্তি ···

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

'বিদ্যুৎপর্ণা' শীর্ষক এই কবিতাটি ক্রমাগত stanza-র পর stanza-য় লয় বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমাদের উচ্চারণ যন্ত্রের দ্রুততম সীমায় পৌঁছানো যেতে পারে। আবার ক্রমাগত লয় কমিয়ে কমিয়ে মন্থরতম চলনে ফিরে আসা যায়। এই অভ্যাসের সময়,

অশ্‌শ্রুর / মৌক্‌তিক্ /
হাস্‌সের / স্ফুর্‌তি
লহরের্ / লীলা ঠিক্ /
লাস্‌সের্ / মুর্‌তি ···

এইভাবে চারমাত্রার চালটি যে কোনো লয়েই, সঠিকভাবে বজায় রেখে চলতে হবে। এই অনুশীলনে কেবল যে তাল লয় সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করা যাবে তাই

নয়, যুক্তাক্ষরে সংঘর্ষবহুল শব্দগুলির নানা লয়ে উচ্চারণের ফলে জিভ-দাঁত-ঠোঁটের জড়তা দূর হবে। সমান চাল্ বজায় রেখে বিভিন্ন লয়ে আবৃত্তি করার দক্ষতা আবৃত্তিকারের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। কারণ ভাব ও বিষয় অনুযায়ী যে কোন ছন্দের কবিতার আবৃত্তিতে লয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বাঞ্ছিত পরিবেশ গড়ে তোলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আবৃত্তিকারের রয়েছে।

আবৃত্তিকারের আর একটি স্বাধীনতা হ'ল, একটি পংক্তির মাত্রাসংখ্যা ঠিক রেখে চালের রদবদল ঘটানো। পর্বভাগগুলিকে অন্যভাবে বিন্যাস করা, সেই সঙ্গে ঝোঁক্ ও লয়েরও নানা বিন্যাসসাধন। অবশ্য এ স্বাধীনতা গ্রহণ করার সুযোগও খুব সীমিত। কয়েকটি মাত্র কবিতায় এটা করা সম্ভব এবং সেখানেও অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে এই চলন-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা বা চলন-বৈচিত্র্যের দ্বারা নতুন কোনো ভাবনাকে প্রকাশ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কঠিন এই বিভিন্ন চলন রূপায়িত করে ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা করাও।

ছিপখান তিন দাঁড়
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিনভর
ভায় দূর পাল্লা।

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই কবিতাটি

১। | | | |
ছিপ্‌ খান্ / তিন্ দাঁড়্
তিন্ জন্ / মাল্ লা
চৌ পর্ / দিন্ ভর্
ভায় দূর্ / পাল্ লা

এই পর্ব ভাগে একটি দল্ একমাত্রা হিসাবে বলতে পারি। প্রতিভাগে দু'মাত্রা হিসাবে।

২। ছিপ্ / খান্ / তিন্ / দাঁড়
তিন্ / জন্ / মাল্ / লা

এরকম ভাগে, একটি দল একমাত্রা হিসাবে উচ্চারণ করে প্রতি দল্-এর পর ভাগ

স্পষ্ট করে তুলে আবৃত্তি করতে পারি। মন্থর লয়ে এর একরকম ধ্বনি। দ্রুত লয়ে এর আর একরকম ধ্বনি। এই ভাগটিই দ্রুত লয়ে আবৃত্তি করে,

৩। ছিপ্. খান্. তিন্. দাঁড়্. তিন্. জন্. মাল্. লা /
চৌ. পর্. দিন্. ভর্. ছায়্. দুর্. পাল্. লা /

এরকম দূরত্বে থেমে, একটি করে তালি Gap দিয়ে দিয়ে যেতে পারি। অথবা,

৪। ছিপ্. খান্. তিন্. দাঁড়্ /
তিন্. জন্. মাল্. লা /
চৌ. পর্. দিন. ভর্ /
ছায়্. দূর্. পাল্. লা /

এভাবে চারটি ছেদ দেখিয়ে প্রতি ছেদ-এ একটি তালি gap দিতে পারি। আবার,

|| | || |
৫। ছি-প্. খান্ / তি-ন্. দাঁড় /
|| | || |
তি-ন্. জন্ / মা-ল্. লা

এইভাবে প্রথম দল্‌টি কলাবৃত্তধর্মী দু'কলা উচ্চারণ ও দ্বিতীয় দলটি দলবৃত্তধর্মী এক-কলা উচ্চারণ করে, তিন কলামাত্রা অন্তর ভাগ দেখিয়ে চলতে পারি। বা,

| || | ||
৬। ছিপ্. খা-ন্ / তিন্ দাঁ-ড়্ /
| || | ||
তিন্. জ-ন্ / মাল্. লা— /

প্রথম দলটি এক-কলা ও শেষের দলটি দু-কলা উচ্চারণেও বলা যায়। আবার,

৭। ছিপ্ / খান্ তিন্ দাঁড়্
তিন্ / জন্ মাল্ লা
চৌ / পর্ দিন্ ভর্
ছায় / দূর্ পাল্ লা

এভাবে দলবৃত্তের একমাত্রিক উচ্চারণেই প্রথম দলটিকে অতিপর্ব হিসাবে উচ্চারণ করলে ছন্দের চাল্ একরকম হয়,

৮। ছিপ্‌ খান্‌ তিন্‌ / দাঁড়

তিন্‌ জন্‌ মাল্‌ / লা

শেষ দলটিকে প্রতি পংক্তিতে ভাঙা-পর্ব হিসাবে আলাদা উচ্চারণ করলে ছন্দের চাল্‌ আর একরকম হয়। আবার ৭ ও ৮ এর দুই স্পন্দকে মেলাতে পারলে নতুন আর একটি চাল্‌ পাওয়া যাবে।

৯। ছিপ্‌ / খান্‌ তিন্‌ / দাঁড়্‌

তিন্‌ / জন্‌ মাল্‌ / লা

চৌ / পর্‌ দিন্‌ / ভর্‌

ছায়্‌ / দূর্‌ পাল্‌ / লা

এই কবিতাটিতে এই ভাবে দল্‌-এর বিবিধ উচ্চারণ, দল সমষ্টির নানা বিন্যাস ও লয়, ঝোঁক ইত্যাদি দিয়ে আরও অনেক চাল্‌ গড়ে তোলা যায়। এগুলি সব আবৃত্তি করে দেখতে হবে। তবেই এই বর্ণনার রসগ্রহণ সম্ভব। তবেই এভাবে আরও নতুন বিন্যাস নিজ নিজ বুদ্ধি দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব। নতুবা এ শুধুই ব্যাকরণের কচকচি। অনুশীলনের পরবর্তী পর্যায় হ'ল, এর প্রতিটি চাল্‌-এর জন্য যে ধ্বনিমণ্ডল তৈরী হচ্ছে, তা দিয়ে কী বোঝানো যায়, সেটি আবিষ্কার করা। যেমন, শেষ বিন্যাসটি দিয়ে মাঝির বৈঠা চালানোর শারীরিক দৃশ্যটি ফুটে ওঠে। ৩নং বিন্যাসটি দ্রুত লয়ে প্রক্ষেপণ দিয়ে নৌকোর তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝির্‌-ঝির্‌ জলপ্রবাহের অনুভব আসে।

আবৃত্তির যে কোনো টেক্‌নিকই কিছু না কিছু উপস্থাপিত করবে। কীভাবে সেটা ঘটবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আবৃত্তিকারের কল্পনাশক্তি ও প্রয়োগদক্ষতার সমন্বয়ের ওপর।

মাত্রার নানা বিন্যাস ঘটিয়ে চাল্‌-এর রকমফের করার এই পদ্ধতি যে কেবল এই একধরণের ছন্দে ঘটতে পারে তাই নয়, সবরকম ছন্দেই এ রকম অবকাশ আছে।

আপাতত এই পর্য্যায়ে আর উদাহরণ বাড়ানোর দরকার নেই। বরং স্বতন্ত্র-ভাবে প্রথমে দলবৃত্ত পরে কলাবৃত্ত ছন্দ ধ্বনিত করার অনুশীলনীগুলি তুলে ধরা যাক্‌।

প্রথমে দলবৃত্ত। যেহেতু লৌকিক ছন্দ এর মূল উৎস, এই ছন্দ অভ্যাসের সময় প্রথমে কিছু প্রচলিত ছড়া নিয়মিত তাল রেখে আবৃত্তি করা উচিত। এই

অভ্যাসের জন্য বিভিন্ন চাল্ ও বিভিন্ন মাত্রাবিন্যাসের গোটা কুড়ি ছড়া নির্বাচন করে নিলেই হবে। এইগুলি আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে এই ছন্দের অন্তর্গত স্বভাবটি বুঝে নিতে সুবিধে হবে। যদিও প্রচলিত ছড়াগুলি গান হিসেবেই গাওয়া হ'ত বলে এর আবৃত্তিতে একটু সুর বেশী লাগবে এবং প্রতি পর্বে চার কলমাত্রার ঠাস্বুনন ঠিকঠাক অনুভব করা যাবে না, তবু প্রাথমিক স্তরে এই ছড়াগুলির আবৃত্তি খুব প্রয়োজন। কতকগুলি ছড়ার নমুনা অভ্যাসের জন্য দেওয়া গেল। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'খুকুমণির ছড়া' থেকে এরকম আরও কিছু উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকুরী
চাম কাটে মজুমদার,
ধেয়ে এল দামোদর,
দামোদর ছুতোরের পো
হিঙুলগাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়্মড়্।
দাদা দিলে জগন্নাথ
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি :
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি
চাল কাঁড়তে হ'ল বেলা
ভাত খাও সে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি!
কোদাল হ'ল ভোঁতা
খা ছুতোরের মাথা।

* * * *

আয় রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে,
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

হ্যাদে লো কলমীলতা
এতকাল ছিলি কোথা?
এতকাল ছিলুম বনে
বনেতে বাগ্দী ম'ল
আমারে যেতে হ'ল।
তুমি নেও বংশী হাতে,
আমি নিই কলসী কাঁখে
চল যাই রাজ পথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে
ছেলেটি তুড়ুক নাচে।

* * * *

খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে হলো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেবো
ছায়ায় ছায়ায় যেতে;
শান বাঁধানো ঘাট দেবো,
পথে জল খেতে।
ঝাড় লণ্ঠন জ্বেলে দেবো
আলোয় আলোয় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দেবো
শাশুড়ী ভোলাতে।

মধ্যবর্তী অনেকখানি সময় ও অনেক স্তর আছে কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু দলবৃত্ত ছন্দের উন্নততর অবস্থাটিকে ধরবার জন্য এরপরই আমরা নির্বাচন করে নেবো রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের রচনা। এখন আমরা আবৃত্তিকালে দল্‌গুলির একমাত্রিক উচ্চারণ, পর্বান্ত ঝোঁক ও পর্বমধ্যস্থ ধ্বনির ঠাসবুননের ওপর নজর রাখবো। দলবৃত্ত ছন্দ যেন এলিয়ে গিয়ে মাত্রাবৃত্তের মত গীতল না হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সজাগ থাকবো।

দিনের আলো / নিবে এল / সূয্যি ডোবে / ডোবে
আকাশ ঘিরে / মেঘ জুটেছে / চাঁদের লোভে / লোভে

এ কবিতাটি আবৃত্তি করলে পূর্ব্ব-আবৃত্ত লৌকিক ছড়াগুলির অনেকটা আমেজ আসে। অথচ ওদের তুলনায় এই কবিতার আবৃত্তিতে সুর কমে আসে, পর্বমধ্যস্থ ধ্বনি অনেক ঠাস্ মনে হয়।

বাঁশবাগানের / মাথার ওপর / চাঁদ উঠেছে / ওই
মাগো আমার / শোলোক্ বলা / কাজ্‌লা দিদি / কই ?
(কাজলাদিদি, যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

সমস্ত ভাবপ্রকাশসহ এই কবিতাটি দলবৃত্ত ছন্দের আবৃত্তি অভ্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পত্র দিল / পাঠান কেসর / খাঁরে
কেতুন হতে / ভূ-নাগ রাজার / রাণী,
লড়াই করি / আশ মিটেছে / মিঞা
বসন্ত যায় / চোখের ওপর / দিয়া
এসো তোমার / পাঠান সৈন্য / নিয়া
হোরি খেলব / আমরা রাজপু / তানি
(হোরিখেলা, রবীন্দ্রনাথ)

এখানে তাল-লয় ঠিক রেখে দলবৃত্ত ধ্বনিত করতে হবে, সেই সঙ্গে গল্প বলার ভঙ্গি, নানা ঘটনার ঘনঘটা সবই ফুটে ওঠা চাই।

আমরা দুজন / একটি গাঁয়ে / থাকি
সেই আমাদের / একটি মাত্র / সুখ।
(এক গাঁয়ে, রবীন্দ্রনাথ)

এবং

আজকে আমার / বেড়া দেওয়া / বাগানে
বাতাসটি বয় / মনের কথা / জাগানে

(সংবরণ, রবীন্দ্রনাথ)

একই রকম তালে বিভিন্ন আবেদন সৃষ্টির অভ্যাসে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কবিতা দুটি সাহায্য করতে পারে।

যেমন আছো / তেমনি এসো / আর কোরো না / সাজ

(চিরায়মানা, রবীন্দ্রনাথ)

দলবৃত্ত চালের মধ্যে কথ্যভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার অভ্যাসে কাজে লাগানো যায়।

দলবৃত্তের পর্বে পর্বে ঝোঁক ও তালগুলি লুপ্ত না করে, কখনো দুলিয়ে দিয়ে, কখনো প্রচ্ছন্ন রেখে, কিন্তু যথাসম্ভব বাড়তি বা আরোপিত সুর বর্জন করে নীচের এই কবিতার আবৃত্তি করতে হবে। কথা বলার মতোই অথচ নিখুঁত তালে দলবৃত্তধর্মী স্পন্দন বজায় রেখে,

বিনুর বয়স / তেইশ তখন /
রোগে ধরল / তারে।
ওষুধে ডাক্তারে / ব্যাধির চেয়ে / আধি হ'ল / বড়ো।

(ফাঁকি, রবীন্দ্রনাথ)

কথার এই ভঙ্গি, সুরবর্জিত ঋজুতা, ছন্দের চাল্, ঝোঁক ও স্পন্দন বজায় রেখে অভ্যাস করার জন্য আরো অনেক কবিতা বেছে নেওয়া যেতে পারে। দু-একটি নমুনা দেওয়া গেল :

হ্যালো। হ্যালো। / কখন আসছ / তুমি।
কোথায় মেঘ / কোথাও মেঘ / নেই।
হ্যালো। হ্যালো। / যদি বৃষ্টি / নামে ?
ভিজবে, হ্যালো। ভিজবো অনা / য়াসে
গাছ পালারা / যেমন করে / ভেজে।

(কথপকথন, পূর্ণেন্দু পত্রী)

শ্রমিকের ফাটুচে পিলে / ধনিকের বুটের ঘায়ে /
বণিকের বংশ বাড়ে / তেতলা প্রাসাদ ছায়ে /
কে খাটে, কেউ বা খাটায় / কেবা কাল খেলায় কাটায়
যে বোনে গায়ের কাপড় / সে মরে আদুড় গায়ে

(নিরুপায়, যতীন বাগচী)

দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে,
এইটে পাহাড়, ওই অরণ্য এবং ওইটে মরুভূমি।
দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে তুমি।
বার করেছ নতুন খেলা।
শহর গঞ্জ খেত খামারে দেশটা যখন ঘুমিয়ে আছে রাত্রিবেলা
খুলেছ মানচিত্রখানা।

(দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

দলবৃত্ত ছন্দের কিছু কবিতাতে তালের মজাটাই প্রধান। তেমন কবিতার মধ্যে

ইল্‌শে গুঁড়ি / ইল্‌শে গুঁড়ি /
ইলিশ মাছের / ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি / ইলশে গুঁড়ি /
দিনের বেলায় / হিম্‌।
কেয়া ফুলে / ঘুণ লেগেছে / পড়তে পরাগ / মিলিয়ে গেছে /
মেঘের সীমায় / রোদ্‌ জেগেছে /
আলতা পাটি / শিম্‌।

(ইল্‌শেগুঁড়ি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

বা অতিপর্বপ্রধান,

আজ স্মৃষ্টি সুখের / উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর / চোখ হাসে মোর / টগ্‌বগিয়ে / খুন হাসে

(সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, নজরুল্‌ ইস্‌লাম্‌)

এ রকম আরো অনেক কবিতাই আছে।

আবৃত্তির দিক থেকে বিচার করলে দলবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতার দুটি ভাগ

করা যায়। একটির কথা এতক্ষণ আলোচিত হচ্ছিল, যেখানে পর্বে পর্বে তাল রেখে, ভাঙা-পর্ব পর্যন্ত পৌছুতে হয়, পর্বপ্রধান ছন্দের ধর্ম অনুযায়ী। দলবৃত্তে লেখা আর এক ধরনের কবিতাতে পদের ভাগগুলি মিশ্রবৃত্তের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে, দলবৃত্তের মতো পর্বস্পন্দন সমেতই প্রতিটি পংক্তি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রতি পর্বে তাল রেখে পংক্তি-প্রান্তিক ভাঙা-পর্বে পৌছোনোর যে ধরন, সেভাবে একে আবৃত্তি করা যায় না।

দলবৃত্তের এই চেহারাটা খুব স্পষ্টভাবে ধরা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি কবিতায়—

একখানি তার তরী ছিল / বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা
একদিন হঠাৎ / ডুবে গেল ঝড়ে। /

একে এরকম পদ-ভাগেই বলতে হয়, তবে ঠিক ছন্দ-ধ্বনি পাওয়া যায়।

একখানি তার / তরী ছিল / বিজন শূন্য / ঘাটে বাঁধা
একদিন হঠাৎ / ডুবে গেল / ঝড়ে /

এরকম পর্বে পর্বে তাল রেখে বললে খুবই অস্বস্তি হয়। পাশাপাশি এই কবিতাটি—

ভোর্ হল রে / ফর্সা হ'ল / দুল্‌ল উষার / ফুল্-দোলা
আন্‌কো আলোয় / যায় দেখা ওই / পদ্মকলির / হাই-তোলা
(ভোরাই, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

আবৃত্তি করে দেখলেই দুয়ের তফাৎ বোঝা যাবে।

আবার,

বহে শীতের প্রখর বাতাস / উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া-কাপড়
তারি মাঝে / পথের ধারে খাড়া।
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র তাপে / আগুন ছোটে ; জানে না সে
কোথায় দাঁড়ায় / গাছের তলায় ছাড়া।

এবং

কুন্দেন্দু তুষার শঙ্খ / শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রাণী
মূর্তিমাঝে / উর বীণাপাণি
(শ্রীপঞ্চমী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

পাশাপাশি আবৃত্তি করলে, এই ধরনের সংশ্লেষধর্মী দলবৃত্তের পর্বজনিত স্পন্দন ও মিশ্রবৃত্তের পর্বস্পন্দনহীন গম্ভীর ধ্বনির তফাৎ বোঝা যাবে।

এই যে দলবৃত্তের দুটি করে পর্ব জুড়ে গিয়ে পদ-ভাগ প্রবণতা, এটা দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি কবিতাতেই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু আবৃত্তির নিয়মিত অভ্যাসের মধ্যে থাকলে অনুভব করা যাবে, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই এর আভাস পাওয়া যায়।

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে / কেমন করে সইব ?
বাতাস আলো গেল মরে / এ কী রে দুর্দৈব।

(শঙ্খ, রবীন্দ্রনাথ)

কিসের তরে অশ্রু ঝরে / কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে / করবো মোরা পরিহাস।

(হতভাগ্যের গান, রবীন্দ্রনাথ)

দলবৃত্তে লেখা আধুনিককালের অধিকাংশ কবিতাতেই আবৃত্তির সময় পর্বগুলি সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে এরকম পদ-ভাগ-প্রধান ছন্দে রূপান্তরিত হয়। কারণ, প্রতি পর্বে তাল রেখে পড়লে ছড়ার ছন্দে যে সুর বা ঝোঁক আসে, আধুনিক কবিতার ভাষা তার অনুগামী নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। দলবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতার পংক্তিগুলি এরকম দুটি বা তিনটি পদে ভাগ হয়ে গেলে ও প্রতি পদের অন্তর্গত পর্বগুলি সংশ্লিষ্ট হয়ে গেলে আবৃত্তি অনেকটা গদ্যধর্ম পায়। দৈনন্দিন কথোপকথনের ধরন পেয়ে যায়। যদিও তারই মধ্যে পর্বভাগজনিত একটা স্পন্দন ঠিকই জেগে থাকে।

ধান খুঁটে খায় তিনটে চড়ুই /
দোলমঞ্চের পাশে /
পায়রাগুলো ঘুরে বেড়ায় ঘাসে /
বেড়ালটা আড়মোড়া ভাঙছে / কুকুরটা কানখাড়া
করে শুনছে / কথা বলছে কারা।

(স্বপ্নে দেখা ঘরদুয়ার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

জন্মে মুখে কান্না দিলে / ভাসিয়ে দিলে ভেলা
এ কূল ও কূল কালি ঢালা / কালনাগিনীর দ'য়

জলকে দিলাম সাঁতার / দিলাম ঢেউকে হেলা ফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি / কান্না আমার নয়।
(জননীযন্ত্রণা, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

'খুকু যাবে / শ্বশুরবাড়ী / সঙ্গে যাবে কে /' বা 'হ্যাদে লো. কলমীলতা'র ধরনে গানের মত সমদূরত্বে তাল ঠুকে আবৃত্তি করা দলবৃত্তের এক রীতি, আর অন্তর্গত পর্বস্পন্দ বজায় রেখে পদ-ভাগের ধরনে পংক্তিগুলিকে ভাগ করে আপাত গদ্যধর্মিতায় বা কথা বলার কাছাকাছি চলে আসা আর এক রীতি। দলবৃত্ত আবৃত্তি করার এই রীতিদ্বৈধের মধ্যে চলাচলের স্বাধীনতা আবৃত্তিকারের আছে। কিন্তু দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারেই কাব্যভাষার কত রূপ ও রস পুরণো দিনের বা আধুনিককালের কবিরা গড়েছেন, সে সম্বন্ধে যোগ্য অভিনিবেশ না থাকলে সেই স্বাধীনতা যথেচ্ছাচার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একই ছন্দে বিষয় ও ভাবের তারতম্যে এবং কালের বিবর্তনে ভাষাগত পরিবর্তনের যে অনুভব আনে, তার তুলনামূলক অভ্যাসের দ্বারাই কেবল আবৃত্তিকার এই প্রায়োগিক ধ্যানধারণা বা জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এখানে দলবৃত্ত ছন্দের একটি নির্দিষ্ট ছাঁচের বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষাবৈচিত্র্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত অভ্যাসের জন্য তুলে ধরছি। অন্যান্য ছাঁচের বা ধ্বনিবিন্যাসের অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিশ্রমী আবৃত্তিকার নিজেই খুঁজে নিয়ে অনুশীলন করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

১) হ্যাদে লো কলমীলতা
২) সাঁঝাই (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)
৩) লিচু চোর (নজরুল্ ইস্‌লাম্)
৪) বাসন্তী (নজরুল্ ইস্‌লাম্)
৫) লজ্জা (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, শঙ্খ ঘোষ)
৬) পূজার বাজার (সুনির্মল বসু)
৭) খুন (জয় গোস্বামী)

বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে সব কটি কবিতাই দলবৃত্ত আবৃত্তির প্রথম রীতি অনুযায়ী তাল ও ঝোঁক বজায় রেখেই করতে হবে। তবু তারই মধ্যে বাচনিক বৈচিত্র্যগুলি লক্ষ্য করতে হবে। ছন্দের স্পন্দন ও দোলাকে ব্যাহত না করে সে বৈচিত্র্য কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

বাঁশবাগানের / মাথার উপর / চাঁদ উঠেছে / ওই
মাগো আমার / শোলোক্ বলা / কাজলা দিদি / কই ?

এবং

আমার মায়ের / সোনার নোলক্ / হারিয়ে গেলো / শেষে
হেথায় খুঁজি / হোথায় খুঁজি / সারা বাংলা / দেশে

এই দুটি কবিতা যেমন একইরকম তালে, ঝোঁকে, এমনকি প্রায় একই সুরে আবৃত্তি করা চলে, একইরকম ছন্দোবিন্যাসে লেখা নীচের কবিতাটিতে তাল এক থাকলেও ঝোঁকে ও সুরে একটা অন্য প্রবাহ---

মেঘলা দিনে / দুপুর বেলা / যেই পড়েছে / মনে
চিরকালীন / ভালোবাসার / বাঘ বেরুলো / বনে।
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

এখানে যে পর্ব্বগুলি সংশ্লিষ্ট হয়ে পদের আকার পেয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু নয়, অথচ একটা কথোপকথনের ভঙ্গি একে অনেকটাই গদ্যধর্মী করে তুলছে। আবৃত্তিকার সচেতন চর্চার মধ্যে থাকলে তবেই তাঁর আবৃত্তির মধ্যে এই পার্থক্যটা ছন্দের যথাযথ ধ্বনিসমেত ফুটে উঠবে।

দলবৃত্ত ছন্দের আবৃত্তি সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা সমীচীন হবে না। বাকিটা অনুশীলনকারীকে নিজে খুঁজে নেওয়ার বরাত দেওয়া গেল।

আমরা এখন চলে যাবো কলাবৃত্ত ছন্দ আবৃত্তির খুঁটিনাটি খুঁজতে। ছন্দের এই কলাবৃত্ত রীতিটি আধুনিক বাংলায় রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু তার উৎস বৈষ্ণব গীতিকবিতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম, 'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে।' লিখিয়া ভারী খুশী হইলাম।"

এই গীতিসুরটি রবীন্দ্রকাব্যে আমরা আদ্যোপান্ত শুনতে পাই। এমন কি তাঁর মিশ্রবৃত্ত রচনাতেও এই গীতলতা। কিন্তু এই শৈশব-কৈশোরের গীতিকবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ থেকেই বাংলাভাষা গীতিচ্ছন্দে (কলাবৃত্তের অপর এক নাম) যথার্থ সমর্থ হওয়ার সুযোগ পেল। যে কবিতাগুলিকে

আমরা এই ছন্দের উৎস বলে মনে করছি, সেগুলি যেহেতু বাংলাভাষায় লেখা নয়, তাই সে কবিতা আবৃত্তি করার ক্ষেত্রে ভাষা ও উচ্চারণ একটু অন্তরায় হবে। তবু এই ছন্দের প্রকৃতি বোঝার জন্য সম্ভব হলে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের বা অন্যান্য পদকর্তাদের কয়েকটি পদ আবৃত্তি করে নেওয়া ভালো। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী থেকে দু'একটি। এই মৈথিলী ও বাংলার মিশ্ররূপ যা ব্রজবুলি নামে খ্যাত, এর উচ্চারণ ও ছন্দোধ্বনিবিন্যাসে এ-কার, আ-কার, ও-কার, ঈ-কার দু'কলামাত্রা হিসেবেই অধিকাংশ সময়ে উচ্চারণ করতে হয় এবং সামগ্রিকভাবে ভাষাটিতে একটু দেবনাগরী ধরণে 'অ' উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

শাঁ-ওন / গগনে— /
ঘো-র ঘ / ন ঘ টা
নিশী-থ / যা-মি নী / রে।
কু ন্ জ প / থে-সখী / কৈ-সে / যা-ওব /
অবলা—/ কা—মিনী / রে।

(রবীন্দ্রনাথ)

ভাষার অসুবিধে কাটিয়ে এইভাবে একে প্রতি পর্বে তাল দিয়ে পড়লে এই ছন্দের স্পন্দনটি কানে ধরা পড়বে। পর্বভাগের ছন্দেরই আবৃত্তি-রীতি অনুযায়ী তাল রেখে পর্ব থেকে পর্বান্তরে গড়িয়ে চলা, যতক্ষণ না ভাঙা-পর্ব পর্যন্ত পৌছনো যায়। এই চলাটা দলবৃত্তের মতই, কিন্তু এখানে পর্বমধ্যস্থ ধ্বনি দলবৃত্তের মতো ঠাস্ নয়। অনেক প্রসারিত। বর্ণগুলির ফাঁকে ফাঁকে স্বর কিছুটা বিস্তার পেয়েছে, তার ফলে পর্বের মাথায় যে ঝোঁকগুলি পড়ছে, সেগুলি তত বিস্ফোরক বা তীব্র নয় এবং সমগ্র ছন্দস্পন্দে একটা নরম গীতলতা এসেছে। একটু গলা খেলিয়ে সুরেলা করে আবৃত্তি করলে এ ছন্দ এতটাই গানের মতো শোনায় যে এর গীতিচ্ছন্দ নামটাই অত্যন্ত সঠিক পরিচয় বলে মনে হয়।

আমরা চলি / সমুখ পানে / কে আমাদের / বাঁধবে
রইল যারা / পিছুর টানে / কাঁদবে তারা / কাঁদবে

(রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু কবির লেখ্য বা দৃশ্যরূপের এরকম অবিকল ধ্বনিরূপ গড়বার দায় আবৃত্তিকারের নেই। তাঁর ধ্বনিরূপ তিনি নিজস্ব বোধ বা চেতনা অনুযায়ীই গড়বেন। কেবল আবৃত্তিতে তালভঙ্গ দোষ না হলেই হ'ল। তাঁর প্রকাশ করতে চাওয়া অর্থ, অনুভব বা চিত্রমূর্তি অনুযায়ী এই একই ধরনের ছন্দোবিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিরূপ তিনি গড়তে পারেন, এমনকি একই কবিতার আবৃত্তির ভেতরেও।

বাতাস হয়েছে / উতলা আকুল //
পথ তরুশাখে / ধরেছে মুকুল //
রাজার কাননে / ফুটেছে বকুল //
পারুল রজনী / গন্ধা //

বা,

বাতাস হয়েছে / উতলা আকুল //
পথ তরুশাখে // ধরেছে মুকুল //
রাজার কাননে // ফুটেছে বকুল //
পারুল রজনী / গন্ধা //

বা,

বাতাস হয়েছে / উতলা আকুল /
পথ তরুশাখে / ধরেছে মুকুল /
রাজার কাননে / ফুটেছে বকুল /
পারুল রজনী / গন্ধা।

বা,

বাতাস হয়েছে // উতলা আকুল //
পথ তরুশাখে / ধরেছে মুকুল //
রাজার কাননে // ফুটেছে বকুল /
পারুল রজনী / গন্ধা

প্রতি // চিহ্নে একটি তালি gap দিয়ে এরকম বিভিন্ন প্যাটার্ণ আবৃত্তিকার গড়ে নিতেই পারেন। সেটা আবৃত্তির ধ্বনিবৈচিত্র্যের দিক্ থেকে সমাদরণীয়, যদি অর্থ, অনুভব ইত্যাদির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকে ও তালভঙ্গ দোষ না ঘটে। কিন্তু অনুশীলনের প্রথম ধাপে কবির প্যাটার্ণ বজায় রেখে তার ধ্বনিরূপ তৈরী

করে স্বকর্ণে অনুধাবন করা দরকার। ছন্দের সাঙ্গীতিক সুষমা যেন ঠিকমত শ্রুতিনন্দন হয়ে ফুটে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তারপর নানাবিধ ভাঙচুরের প্রশ্ন।

কলাবৃত্তের ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা, ৬ মাত্রা, ৭ মাত্রা-র চালে বিভিন্ন অভিব্যক্তির কবিতা আবৃত্তি করা দরকার।

৪ মাত্রার চাল,

দিন শেষ হয়ে এল আঁধারিল ধরণী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী

(দিনশেষ, রবীন্দ্রনাথ০)

তারপর? তারপর?
কত নদী কত গিরি অরণ্য প্রান্তর
পার হয়ে ছোটে রথ ঘর্‌ঘর্‌ ঘর্‌ঘর্‌
(তারপর? তারপর? —বিমলচন্দ্র ঘোষ')

যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার
বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জেছে কে আবার
(খেয়াপারের তরণী, নজরুল্ ইস্‌লাম্)

ঝর্ণা! ঝর্ণা!
সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা।
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে
(ঝর্ণা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া
(মে-দিনের কবিতা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

হাওয়াদের বাড়ী নেই, হাওয়াদের বাড়ী নেই নেই রে
তারা শুধু কেঁদে মরে বাইরে

(হাওয়ার গান, বুদ্ধদেব বসু)

মাত্রার চাল,

ছিলাম যবে মায়ের কোলে
বাঁশী বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি

(বিচিত্রা, রবীন্দ্রনাথ)

মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,

(দুরন্ত আশা, রবীন্দ্রনাথ)

তোমায় নিয়ে আপন মনে খেলা
কখনো আমি খেলিনি ভালোবাসা

(পাশা, আল মাহমুদ)

এখানে ঢেউ আসে না ভালোবাসে না কেউ, প্রাণে
কী ব্যাথা জলে, রাত্রিদিন মরু কঠিন হাওয়া

(ঢেউ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এই আকাশ রুক্ষ নীল
কোনোখানেই শান্তি নেই
হেথা আকাশ শুষ্ক নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ মিছিল।

(ভুখ মিছিল, দিনেশ দাশ)

আমারে তুমি ভালোবাসো না বলে
দুঃখ আমি অবশ্যই পাই :
কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে
তাছাড়া কোনো যাতনা জালা নাই ।।

(নিরুক্তি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

৬ মাত্রার চাল,

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচে রে।

(নববর্ষা, রবীন্দ্রনাথ)

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে ঋণে
বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন ও জমি লইব কিনে

(পুরাতন ভৃত্য, রবীন্দ্রনাথ)

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া

(শাশ্বতী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ

(উত্তরাধিকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

ওগো সুন্দরী, মনে আছে কাল তেসরা জুন
সেকি ভুলে গেছো ? তুমি তো দেখছি সাংঘাতিক !

(কথপকথন, পূর্ণেন্দু পত্রী)

হঠাৎ এলে যে, বেশ তো
ভুলে ছিলে, ভুলে ছিলামও
গাছে এঁটেছিল ছায়াময়
স্মৃতির ছাপানো ছবিরা

(ঐ)

৭ মাত্রার চাল,

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে

(দুই পাখী, রবীন্দ্রনাথ)

ভাবিছ যে ভাবনা একা একা
দুয়ারে বসি চুপে চুপে

(ভাবনি, রবীন্দ্রনাথ)

স্মৃতির বালুচরে মুখেরা ভিড় করে
কেন যে ভিড় করে আমি তো ক্লান্ত

(প্রভাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

তোমাকে চাই আমি তোমাকে চাই
তোমাকে ছাড়া নেই শান্তি নেই
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন

(বৈশাখী, অরুণকুমার সরকার)

এখানে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল। আসল কথা হ'ল, বিভিন্ন প্যাটার্ণের ছন্দোবিন্যাস অনুযায়ী ধ্বনিমণ্ডল গড়ে তোলার অভ্যাস করতে হবে। এবং একই চালের কলাবৃত্ত ছন্দের কবিতা ক্রমশঃ সাম্প্রতিক কালের রচনায়, ভাষার দিক থেকে যে সুরবর্জিত ঋজুতা অর্জন করেছে, আবৃত্তিতে ছন্দের আবর্তনপ্রত্যাশা যথাযথ জাগিয়ে রেখে, বাচনভঙ্গিতে কেমন করে সেই ঋজুতা আনা যাবে, ধারাবাহিক ভাবে বা বিবর্তনক্রমে বিভিন্ন উদাহরণ সাজিয়ে তাদের আবৃত্তি করার অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই প্রত্যেক আবৃত্তিচর্চাকারীকে নিজে নিজে সেটা অনুভব করতে হবে, রূপায়িত করতে হবে।

কলাবৃত্ত ছন্দের আলোচনা শেষ করে, মিশ্রবৃত্তের কথায় আসা যাক্। মিশ্রবৃত্ত ছন্দ আবৃত্তির প্রাথমিক রীতির কথা এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে। যেখানে একটি পংক্তিতে একটি বাক্য সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আটটি মাত্রার একটি ধ্বনিসমষ্টি ও ছ'টি মাত্রার একটি ধ্বনিসমষ্টি, দু'বারে, মাঝখানে একটি যতি রেখে, বলা হয়। কিন্তু ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি চারমাত্রা নিয়ে একটি করে পর্ব ও পংক্তিপ্রান্তিক ভাঙা-পর্ব এই ছন্দেও আছে।

মানবের / মাঝে আমি // বাঁচিবারে / চাই

এই পংক্তিতে প্রতি চারমাত্রা অন্তর একটি পর্ব-যতি, আটমাত্রার পরে একটি পদ-যতি, বারোমাত্রার পরে আবার একটি পর্ব-যতি ও তার পরে দু'মাত্রার

ভাঙা-পর্ব, হিসাব মতন, রয়েছে। কিন্তু আবৃত্তিকালে দেখা যায় যে পর্ব-ভাগগুলি, কলাবৃত্ত বা দলবৃত্তের মতন এই ছন্দে 'তাল' বিভাগ হিসেবে কাজ করে না। বরং পর্ব-ভাগগুলির প্রাধান্য কমে গিয়ে আটমাত্রার ও ছয়মাত্রার টানা উদাত্ত ধ্বনিসমষ্টি এ ছন্দের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলে। সময়ে সময়ে অর্থ বা ভাব অনুযায়ী এই টানা আটের ধ্বনিসমষ্টিকে ভেঙে ছয়-দুই বা চার-চার ভাগে যতি দিতে হয়, কিন্তু আট-ছয়, আট-দশ, আট-বারো—এরকম দীর্ঘ পদক্ষেপে অসমান দোলায় ভারিক্কী চলাই মিশ্রবৃত্তের আবৃত্তি-প্রকৃতি। এবং মাঝে মাঝে ওরকম ছোট পদক্ষেপ ফেলতে হলেও, সেটা নিয়মিত একই দূরত্বে না হওয়ায়, কলাবৃত্ত বা দলবৃত্তে যেমন গানের তালের আমেজ ফুটে ওঠে, এখানে তা ফোটে না।

মিশ্রবৃত্তের আবৃত্তি প্রক্রিয়ায় জটিলতা শুরু হয়, ভাব ও অর্থজনিত কারণে বাক্য যখন আট-ছয়ের বা আট-দশের এই বেড়া ডিঙিয়ে পরবর্তী পংক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।

শুক্লচতুর্থীর চন্দ্র / অস্তগতপ্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে / সুদীর্ঘরেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ / আলো, ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল অন্ধকার / কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো।

(পরিশোধ, রবীন্দ্রনাথ)

এইখানে প্রতি আট ও ছয় মাত্রার যতি ঠিক রেখে, অন্ত্যমিলজনিত উত্তল-অবতল ভঙ্গি ঠিক রেখে, অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া একটা জটিল বুননের মতো ব্যাপার। যাঁরা আবৃত্তি করেন, অথচ এভাবে ছন্দজনিত ধ্বনিবিন্যাসকে গুরুত্ব দেন না, তাঁরা এ পংক্তিকে অর্থ ও বর্ণনাত্মক নাট্যভঙ্গির দিকে নজর রেখে এভাবে বলে থাকেন,

শুক্লচতুর্থীর চন্দ্র অস্তগত প্রায় /
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে / সুদীর্ঘরেখায় ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো /
ঝিল্লিস্বনে / তরুমূল অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে বীণার তন্ত্রীর মতো /

তার ফলে বিষয়টা উপস্থাপিত হয় বটে, কারো কণ্ঠস্বরের ক্ষেপণে কাব্যিক আবেশও লেগে থাকে কিছুটা, কিন্তু ছন্দোবিন্যাসজনিত সহজাত কাব্য ফুটে

ওঠার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। ছন্দোজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে তেমন আবৃত্তি শোনাও খুব অস্বস্তিকর।

গিরিশচন্দ্র যে ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন, সংলাপ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী পংক্তি বিন্যাস করে,

শান্ত।
অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি?
পুত্রশোকাতুরা
উন্মাদিনী করালিনী আমি।
শান্ত? শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?
ধরা যদি পশে রসাতলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহতারা, নিভে দিনকর,
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি'
জলে যদি ক্ষীরোদ অনলে,
অষ্টবজ্র চলে, বিশ্বচূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা।

বা রবীন্দ্রনাথ অন্ত্যমিলসহ যে মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন,

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান?
প্রভাতের গান?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির পরে।

সেখানে কোনো জটিলতার মধ্যে না গিয়ে পংক্তিগুলি উচ্চারণ করলেই চলে, কেবল বাক্য শেষ না হলে তার রেশটুকু রেখে ও অন্ত্যমিলনের ভঙ্গি ঠিক রেখে পরবর্তী পংক্তিতে গেলেই হ'ল।

কবি এরকম পংক্তিবিন্যাস করেছেন বলেই সেই লেখ্য চেহারাটার মতো থামা-চলা গলাতেও করতে হবে, শিল্পী হিসেবে এরকম পরাধীনতার শিকল একজন বোধসম্পন্ন আবৃত্তিকারকে পরানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ভাষার যে সুষমা, ছন্দোরক্ষার মাধ্যমেই সে ধ্বনি গলায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, বাংলার মতো করে যেমন সংস্কৃত ভাষা বলা চলে না, তার ধ্বনি

আলাদা রকম, তেমনি গদ্যের মতো এলোমেলোভাবে ছন্দোবদ্ধ ভাষাও বলা চলে না। কোন্ ভাষা কেমন করে বলবেন, সেটাও তো আবৃত্তিকারের শিক্ষণীয় বিষয়।

'আট-ছয়'—এই দু'ভাগে বিভক্ত পংক্তিবিন্যাসকে ছন্দের পরিভাষায় বলে পয়ার। পয়ারে লেখা কবিতায় বাক্য যখন লাইন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দু-তিনটি পংক্তি জুড়ে ছড়ানো থাকে, সেরকম ক্ষেত্রে, প্রথমে দেখে নিতে হয় সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য। সেই বাক্যটির প্রকাশ ভাব ও অর্থসমেত কেমন হবে সেটা আগে ঠিক করে নিতে হয়। তারপর সেই বাক্যটি ছন্দে যেমনভাবে বাঁধা আছে, তেমনভাবে আট-ছয়ের দোলায় দোলাতে হয়, অন্ত্যমিল থাকলে তা মেলানোর ভঙ্গি করতে হয়। তার ফলে, সমগ্র বাক্যটির কথনভঙ্গি ও সুর-ভঙ্গিতে ছন্দ ও মিলজনিত তরঙ্গ যুক্ত হয়ে ঢেউ খেলিয়ে তোলে। সেটা যিনি আবৃত্তি করছেন তাঁর পক্ষে উপভোগ্য। এই-ই অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবৃত্তি করার সময়, সে রবীন্দ্রনাথের সমিল অমিত্রাক্ষরই হোক্ বা মধুসূদনের অমিল অমিত্রাক্ষর, অর্থ-যতির পাশাপাশি প্রতিটি ছন্দ-যতিকেও ফুটিয়ে তুলতে হয়। এই দুই যতির বিনুনিতেই এই ছন্দ আবৃত্তির আনন্দ। প্রথমে পয়ার পরিমাপের পর পর কিছু কবিতা আবৃত্তির অভ্যাস করে, তারপর মহাপয়ার (আট-দশ, আট-বারো) মাপের অভ্যাস করতে হবে। দেখতে হবে, পয়ার মাপের ছন্দে যেমন দু'টি যতির মাঝে তরঙ্গায়িত হয় বাক্যগুলি, দীর্ঘতর মাপের ছন্দে কখনো এই দোলার বিস্তার বাড়ে, কখনো দু'য়ের অধিক অসমান যতিতে ছোট বড় তরঙ্গে বিভক্ত হয় ধ্বনি। আবার, মুক্তক ছন্দে ধাপ থেকে ধাপে ঝর্ণার ছড়িয়ে পড়ার মত, ধ্বনিও ছোট বড় পংক্তির মাপে গড়িয়ে চলে। এসবই অভ্যাসের দ্বারা গলায় ফোটাতে হবে।

ক্রমশঃ রবীন্দ্র থেকে রবীন্দ্রোত্তর কবিদের কবিতায় মিশ্রবৃত্ত, তার মাপ ও চাল ঠিক রেখেও কেমন ঋজু হয়ে উঠছে, সুর ঝরে যাচ্ছে তার শব্দবিন্যাসের বা বাক্যবিন্যাসের নতুনত্বে—এটা লক্ষ্য রেখে অভ্যাস করতে হবে ও এই ক্রমপরিবর্তন গলায় আনতে হবে। এখানে বিভিন্ন মাপের ও বিভিন্ন বিন্যাসের নানা অক্ষরবৃত্তের একটা ক্রমানুসারী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল। উৎসাহীজন আরও অনেক এরকম দৃষ্টান্ত খুঁজে নিয়ে অভ্যাস করবেন, আশা করা যায়।

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী……
(মেঘনাদবধ, মাইকেল মধুসূদন)

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক……
(মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান,
কণ্টকমুকুট শোভা, দিয়াছ তাপস
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস……
(দারিদ্র্য, নজরুল্ ইস্লাম্)

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি……
(জন্মদিন, রবীন্দ্রনাথ)

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘ ধারা।
(বর্ষশেষ, রবীন্দ্রনাথ)

মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন……
(ছবি, রবীন্দ্রনাথ)

নাম তার জানি না কো,
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক
যুগে যুগে সব যুদ্ধে হেরে ফিরে আসা ক্লান্ত পদাতিক
(জনৈক, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

আবার সকল তুরী, সমস্ত বিষাণ আরম্ভিল
সমস্বরে কাংস্য কোলাহল, অভ্রভেদী রুদ্রবীণা
ঝংকারিল সমুচ্চ সপ্তমে………
(অর্কেষ্ট্রা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।
(বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ)

একটু সময় হবে ? পাশে গিয়ে বসিব তোমার।
মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন, বিষম বিভ্রাট,………
(কোনো মেয়ের প্রতি, বুদ্ধদেব বসু)

আমরা যে গান শুনি, গান করি, আকাশে হাওয়ায়
ফুলে ফুলে বনে পথে ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় সকালে……
(পঁচিশে বৈশাখ, বিষ্ণু দে)

সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে
সবাই চেঁচিয়ে বলছে, সাবাস ! সাবাস ।… …
(উলঙ্গ রাজা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

বার বার ফিরে আসা নয়
পারাপার নয়,
শুধু যাওয়া।
এখন কথাটা হ'ল
কখন কী ভাবে যাবে, আকাশের কেমন আবহাওয়া।………
(কাল মধুমাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

বাসের পাদানিতটে দুটি ইঞ্চি পেয়ে যাই বহু পুণ্যফলে
বিকাল পাঁচটায়।
তারপর বিহঙ্গেরা যেমন স্বাধীন……

(বাসের ভিতরে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

তোমার পৌঁছতে এত দেরী হ'ল ?
পথে ভিড় ছিল ?
আমারও পৌঁছতে কিছু দেরী হ'ল,
সব পথই ফাটা…. …

(কথপকথন, পূর্ণেন্দু পত্রী)

আমার পিতার নাম বিপিনবিহারী,
আমার মাতার নাম বিনোদিনী, ঠাকুর্দার নাম
নিমচাঁদ। … …

(আমার পিতার নাম, বিনয় মজুমদার)

বেলা হ'ল দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী সারথি চালাও রথ সৈন্যদল, চলো
জোরে আরো জোরে আমি বর্শায় নক্ষত্র গেঁথে নেবো আমি
শাস্তি কেড়ে নেবো তাদের আমাকে যারা কুর্ণিশ করে না……

(অলর্কের উপাখ্যান, পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

ধারাবাহিকভাবে গলায় ছন্দ ধ্বনিত করার এই চর্চা কিছুদিন করলে অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ও অক্ষরবৃত্ত আবৃত্তিকালে পদক্ষেপের অভ্যাস এমন তৈরী হয়ে যাবে যে তখন আর ছন্দ-যতিগুলি খেয়াল রেখে আবৃত্তি করতে হবে না। আপনিই ঠিক-ঠিক জায়গায় থামা-চলা, ঝোঁক ইত্যাদি এসে পড়বে। ক্রমান্বয়ে সুরবর্জিত কথ্যভঙ্গিমার দিকে, বাচনিক সুরেলা আবহ থেকে সহজ আলাপচারিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টিও, ছন্দ যথাযথ বজায় রেখে, সঠিকভাবে অভ্যাস করতে হবে। এইজন্যই, এই সব চর্চায় কান ও কণ্ঠের মিলনের এত প্রয়োজন। লিখে সবটা বোঝানো যায় না।

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ-চেনা ও ছন্দ ধ্বনিত করার এই পদ্ধতিটি ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করলে, নিয়মিত অভ্যাস করলে ও যে-কোনো কবিতা

হাতে পেলেই তার ছন্দ চেনার ও ধ্বনিত করার প্রয়াসের আগ্রহ গড়ে উঠলে, আপনিই একটা ছন্দবোধ জন্মাবে।

তখন গদ্য কবিতা, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, আধুনিক কাল পর্য্যন্ত, আবৃত্তি করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যদিও গদ্য অর্থ বা ভাব অনুসারে রচিত হয় তবু তার অন্তর্নিহিত একটা ছন্দস্পন্দ আছে যা ছন্দবোধসম্পন্ন কানেই ধরা পড়ে ও ছন্দাভ্যাসসম্পন্ন বাক্‌যন্ত্রেই যথাযথ রূপ পায়। উপরিলিখিত চর্চার পর গদ্য কবিতার আবৃত্তির দিকে এগোলেই সে রহস্য ধরা পড়বে। গদ্য কবিতার ক্রমানুযায়ী অভ্যাস-তালিকা প্রস্তুতির ভার শিক্ষার্থীদের নিজের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে 'ছন্দ' আলোচনার সমাপ্তি টানব।

শেষ করার আগে, কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পদ-ভাগের ছন্দ, ও পর্ব-ভাগের ছন্দ, আবৃত্তির রীতির দিক্ থেকে ছন্দ প্রকৃতির এই দুই পরিচয় দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, এখন নিশ্চয়ই একথা স্পষ্ট যে দলবৃত্ত কলাবৃত্ত সব রীতিতেই পর্ব্ব ও পদ, দুই-ই আছে। কেবল যখন যেটার প্রাধান্য, সেই অনুযায়ী আবৃত্তির রীতি ভিন্নরকম হবে। কখনো কখনো মিশ্রবৃত্তে যুক্তাক্ষরবিরলতা তাকে চারমাত্রার কলাবৃত্তের মত পর্বপ্রধান করে তোলে। চারে চারে দুলে যায় মিশ্রবৃত্ত। কখনো ভাবের মন্থরতায় কলাবৃত্ত হয়ে পড়ে টান টান গম্ভীর পদভাগের ছন্দের মতো। মিশ্রবৃত্তের প্রসারিত উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি, আধুনিককালে এসে কথ্যভঙ্গির কাছে এত আত্মসমর্পণ করেছে যে সেই বিস্তার তো নেই-ই, পদযতির জন্য থামার যে বিলম্বিত অভ্যাস দিয়ে ছন্দ-চেনা শুরু করেছিলাম, ইদানীং কালের কবিতায় অতখানি থেমে থাকার অবকাশই নেই। কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্তের ছন্দ-বোধ ও তজ্জনিতআবৃত্তিরীতির স্বাভাবিক নিয়ম বজায় রেখে, তাই, ভাব ও ভাষার প্রয়োজনানুপাতে আবৃত্তিকার এক রীতি থেকে অন্যরীতিতে যাতায়াত করতে পারেন। সেটা তাঁর সচেতন শিল্পকর্ম হলে, তারও একটা আলাদা মূল্য গড়ে উঠবে।

অভিব্যক্তি

আবৃত্তি শিখতে আসার মূল কারণই হ'ল এই যে, কোনো কবিতা বা গদ্যাংশ, সেটা যদি-বা বুঝতে পারা যাচ্ছে, কিন্তু পাঁচজনকে বা পাঁচ হাজার জনকে সেটা শোনাতে হলে কেমন করে বলবো, সেটাই পারা যাচ্ছে না। সেটা কেমন করে পারা যাবে ? তার সবচেয়ে সহজ সমাধান হ'ল, যাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে, তাঁকে গলায় করে দেখিয়ে দিতে বলা। তারপর, হুবহু না হোক্, তাঁর নিকটতম অনুকরণ করে উঠতে পারলেই শিখে ফেলা গেল। এই গ্রন্থে এর আগেও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এই হচ্ছে বাজার চল্‌তি আবৃত্তি-শিক্ষার পদ্ধতি। সঙ্গীতের গুরুমুখী বিদ্যাদানরীতির অনুরূপ হিসাবে তর্ক জুড়ে এর সার্থকতা প্রমাণেরও বহু চেষ্টা দেখা যায়। একথা ঠিক যে, যেহেতু আবৃত্তি শিক্ষাও কান ও কণ্ঠের মিলন ছাড়া সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, সেই অর্থে এ বিদ্যাও গুরুমুখী। কিন্তু যে অর্থে সঙ্গীতের নির্দ্দিষ্ট স্বর, তান বা অলংকরণ অনুকরণযোগ্য, আবৃত্তি সেই অর্থে অনুকরণ করতে গেলে গুরুর বাচনভঙ্গিই মাত্র অনুকৃত হয়। এবং দীর্ঘদিন তেমন অনুকরণের পর আবৃত্তিকারের বাচনভঙ্গি গুরুরই কার্বন-কপি হয়ে দাঁড়ায়। দেখা যায়, তিনি স্বাভাবিক কথা-বার্তা বলেন নিজ কণ্ঠস্বরে, নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে, আর আবৃত্তি করলেই মনে হয় তাঁর গুরুর বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে শিষ্যের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তাঁর আবৃত্তিতে ফুটে উঠতে পায় না, শ্রোতারাও হেমন্তকণ্ঠ লতাকণ্ঠি জাতীয় নকল গায়কদের কাছে যে সস্তা অনুকরণপ্রিয়তার আমোদ আশা করেন, শিষ্যের আবৃত্তিতে গুরুর ওইরূপ অনুকরণ শোনার আগ্রহেই তার আবৃত্তি শোনেন। শিষ্যের কোনো সৃষ্টিশীল ভূমিকা থাকে না। অপরদিকে, এই অনুকরণজাত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মেধা, হৃদয়, বোধ-বুদ্ধির চালনা যেহেতু অপ্রয়োজনীয়, তাই তার বিকাশ ঘটে না শিল্পরচনার ক্ষেত্রে। তখন দেখা যায়, যে ক'টি কবিতা গুরুর কার্ব্বনকপি করা হয়েছে, সেই ক'টি কবিতা বা সেই ধাঁচের কবিতা না হলে, নতুন কবিতার জন্য 'প্রকাশ' গড়ে তোলার

মতো তার না থাকে নিজস্ব ক্ষমতা, না আত্মপ্রত্যয়। যদি বা কেউ সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'ন, সব রকম কবিতাই কাল-ক্রম-ভাষা নির্ব্বিশেষে এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। ঐ গুরুর বাচনভঙ্গির ছাঁচ।

আবৃত্তির সঠিক চর্চা বলতে তাই আমরা ওই পথে না গিয়ে প্রথমে নিজ নিজ কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন স্তর ও রং এবং স্তরবদলের, রং-বদলের রীতি-পদ্ধতিগুলি খুঁজে নিয়েছি আবৃত্তির মধ্যে থেকে এবং অনুশীলন করেছি। আমাদের উচ্চারণকে ধ্বনিতাত্ত্বিক মতে পরিশুদ্ধ করেছি। শব্দবিষয়ে আমাদের নিজ নিজ অনুভব দিয়ে শব্দ উচ্চারণের অভ্যাস করেছি। উচ্চারণের সেই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে তাকে বারবার রূপায়নের মতো কাঠামো তৈরী করে নিয়েছি। শব্দপুঞ্জকে প্রকৃতি ও হৃদয়ের নানা অনুভবে বাজিয়ে তোলার করণ কৌশল শিখেছি। যে ভাষা নিয়ে আবৃত্তি করবো তার গতি-যতি ছন্দ ও ছন্দস্পন্দকে চেনার ও ধ্বনিত করার কাজও শিখেছি। এসব কিছু করার পরও বাকি থাকে আরও এক কাজ, যাকে চলতি কথায় প্রকাশভঙ্গি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকাশভঙ্গি বলতে প্রায় সমগ্র আবৃত্তিটাকেই বোঝায়। তাই, এই বাকি প্রকরণটির নাম দেওয়া যাক্, 'অভিব্যক্তি।' যার ইংরেজী প্রতিশব্দ expression.

একটি কথা কণ্ঠে প্রকাশ করার দ্বারা আমরা যে অনুভব (শোক, আনন্দ, উল্লাস, হতাশা ইত্যাদি প্রকাশ করি বা করতে পারি এবং আমাদের প্রক্ষেপণের দ্বারা যে রস শ্রুতিমাধ্যমে সৃষ্টি হয়—এই দু'টি ব্যাপারই অভিব্যক্তি-চর্চার লক্ষ্য

ধরা যাক্, একটি শব্দই একটি কথা।

চলো

এই একক শব্দ সমন্বিত কথাটি দিয়ে আমরা কী কী প্রকাশ করতে পারি? আহ্বান, আদেশ, অনুরোধ, ক্রোধ, হতাশা, উদ্দীপনা, ব্যঙ্গ, ব্যথা, স্নেহ, আব্দার, শঙ্কা ইত্যাদি অনেক কিছুই। এই কথাটির মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত অনুভব ব্যক্ত করার চেষ্টা করে দেখলেই বোঝা যাবে অভিব্যক্তি বলতে কী বোঝায় ও তার অনুশীলন বলতে কী বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে। অনেকের হয়তো মনে হতে পারে পূর্ব্ববর্তী অধ্যায়ে উচ্চারণের অর্থ বা ভাবব্যঞ্জনা বলতে যা বোঝানো হয়েছে, এ-ও তাই; আলাদা করে আবার এ চর্চার কী প্রয়োজন? একটি বা দুটি শব্দে যতক্ষণ আমরা এ চর্চা করবো, ততক্ষণ হয়তো এমনই মনে

হবে। একথা স্বীকার্য্য যে সেক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া প্রায় একই। কিন্তু অভিব্যক্তির চর্চা যতই এগোবে, ততই বুঝতে পারা যাবে যে অভিব্যক্তি ও উচ্চারণব্যঞ্জনা এক নয়।

আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় এই সব অনুভব প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু তা করি প্রতিক্রিয়া হিসেবে। যেমন, কারো কোনো কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে একটা ক্রোধের অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল। কোনো ঘটনায় প্রভাবিত হয়েও তা করতে পারি। কিন্তু আমরা যখন মঞ্চে আসি আবৃত্তি করবো বলে, তখন এরকম কোনো প্ররোচনা ছাড়াই আমাদের একই সঙ্গে কখনো ক্রোধ, কখনো উদ্দীপনা, কখনো ক্ষোভ, কখনো বেদনা প্রকাশ করতে থাকতে হয়। চকিতে একটি অভিব্যক্তি কণ্ঠে আনার অভ্যাস না থাকলে সর্ব্বদাই আবেগের অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। আবেগ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে না আসে, তবে আবৃত্তিই হবে না। তাছাড়াও, কবিতা আবৃত্তির সময় আবেগতাড়িত ভাবে পংক্তিগুলি বললেই হয় না। আবেগের নিয়ন্ত্রণ চাই। যে কথা বলতে চাই, যে অনুষঙ্গে, যে পরিবেশে, আমার অভিব্যক্তি সেই মাপে ঠিকঠাক খাপ খাওয়া চাই। এই মাপ ও নিয়ন্ত্রণ অভিব্যক্তির স্বতন্ত্র অভ্যাস ছাড়া সম্ভব নয়।

তবে একথাও ঠিক যে দৈনন্দিন শ্রুতি-অভিজ্ঞতাও অর্জন করা দরকার। অনুধাবন করা দরকার নিজের ও অন্যের নানা অভিব্যক্তি। তাই বলে, সদা-সর্বদা জীবন থেকে তুলে টাটকা অভিব্যক্তি আবৃত্তির মধ্যে বসিয়েও দেওয়া যায় না। কিন্তু এই সব সংগ্রহই কালক্রমে, কাব্য-ভাষার আবেশে ও নিজস্ব উপলব্ধিতে জারিত হয়ে আবৃত্তিতে রূপ পায়। অভিব্যক্তির এরকম সচেতন অনুশীলন থাকলেই, আর একটি নতুন কবিতা বলবার সময়ে গুরুর কণ্ঠ-প্রদর্শিত অভিব্যক্তির নকল করার দরকার হবে না।

কয়েকটি অনুশীলনীর কথা বলা হ'ল। এগুলি কণ্ঠে করে দেখতে হবে। খুব ভালো হয়, এগুলি কয়েকজন মিলে অভ্যাস করলে। একজন কণ্ঠে একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করবেন, অন্যরা শুনে বলবেন সেটা কী প্রকাশ হ'ল—ক্রোধ না বেদনা, লজ্জা না ব্যঙ্গ, হতাশা না উদ্দীপনা ইত্যাদি। যদি অন্যেরা একমত হতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই যিনি প্রকাশ করছেন, তাঁর প্রকাশের যাথার্থ্য বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়া যায়। বলবাহুল্য, যিনি অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন তিনি কী করছেন তা আগে-ভাগে বলবেন না। এভাবে এই অভ্যাস চলবে।

আচ্ছা

(ব্যঙ্গ, বিস্ময়, সম্মতি, উৎসাহ, অনিচ্ছা, হুম্‌কি, ক্রোধ)

যাই

(ব্যস্ততা, আলস্য, বিষণ্ণতা, উদ্দীপনা, আহ্বানের উত্তর, বিরক্তি)

হায়

(শোক, বিষণ্ণতা, আনন্দ, নিন্দা, মুগ্ধতা, হতাশা)

খেতে দাও

(আব্‌দার, আদেশ, অনুরোধ, বিরক্তি, ক্রোধ, উদ্দীপনা)

বৃষ্টি এল

(বর্ণনা, স্বস্তি, শঙ্কা, আনন্দ, ঘোষণা, কৌতুক, বিস্ময়)

এ কী খেলা

(বিস্ময়, ভক্তি, উচ্ছ্বাস, তাচ্ছিল্য, হতাশা, ক্রোধ)

ওকে যেতে দাও

(নিস্পৃহতা, অনুরোধ, আদেশ, ক্রোধ, আব্‌দার, ব্যথা)

দিন শেষ হয়ে এল

(শঙ্কা, বিষণ্ণতা, আশা, বর্ণনা, হতাশা, উদ্দীপনা)

আসবে না কেউ আজ

(প্রত্যয়, সংশয়, হতাশা, ভীতি, উপেক্ষা, ক্ষোভ)

যাবই আমি, যাবই, ওগো বাণিজ্যেতে যাবই
তোমায় যদি না পাই তবু আর কারে তো পাবই

(উদ্দীপনা, উদাসীনতা, প্রতিবাদ, ঘোষণা)

(রবীন্দ্রনাথ)

শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, এই আমি

(আহ্বান, মমতা, বিষণ্ণতা, উচ্ছলতা)

(রবীন্দ্রনাথ)

মশা মেরে ঐ গরজে কামান, "বিপ্লব মারিয়াছি।"
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া বাম হাতে মারি মাছি।

(আক্ষেপ, কষ্ট, ক্রোধ, ব্যঙ্গ)

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি

(ক্ষোভ, দুঃখ, স্মৃতিচারণ, বিদ্রূপ)

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

মনে রে আজ কহ যে,
ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।

(সান্ত্বনা, কৌতুক, বেদনা, উপদেশ)

(রবীন্দ্রনাথ)

জীবনের এই স্বাদ, সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল ?

(সহানুভূতি, বিস্ময়, দুঃখ)

(জীবনানন্দ দাশ)

ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে উচ্চারণব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তি একই প্রক্রিয়া নয়। সে কথা এখন স্পষ্টতর হওয়ার অপেক্ষায়—

তখন রাত্রি **আঁধার** হ'ল, **সাঙ্গ** হল কাজ

(রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'আঁধার' ও 'সাঙ্গ' শব্দ দুটিতে নিজ নিজ অনুভব অনুযায়ী উচ্চারণের অর্থব্যঞ্জনা করা হ'ল। কিন্তু সমগ্র পংক্তিটি দিয়ে কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হ'ল না।

এবার সমগ্র পংক্তিটি দিয়ে, অর্থব্যঞ্জনা দুটি বজায় রেখেই, যথাক্রমে একবার ক্লান্তি, একবার শঙ্কা, একবার তৃপ্তি, একবার উদ্বেগ প্রকাশ করা যাক্। এখন নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে যে, অভিব্যক্তি উচ্চারণব্যঞ্জনার ওপরেও আর এক পোঁচ কাজ।

অনুরূপভাবে স্থূলহরফের শব্দগুলিতে অর্থব্যঞ্জনা করে নীচের বন্ধনীতে প্রস্তাবিত অভিব্যক্তিগুলি একে একে প্রকাশ করে এই সূক্ষ্ম অনুশীলন চালানো যেতে পারে।

আমি **দেখতে** পেলাম, **কাছে** গেলাম, মুখে বললাম, **খা**

(বিষণ্ণতা, কৌতুক, উচ্ছ্বাস, মুগ্ধতা)

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

তুমি কি **কেবলি স্মৃতি**?

(ক্ষোভ, ব্যথা, ব্যঙ্গ বা কৌতুক)

(বিষ্ণু দে)

ওই হরিপদ আসছে, **তুচ্ছ** ও **নগণ্য** হরিপদ

(কৌতুক, সহানুভূতি, দুঃখ, বিদ্রূপ)

(ব্রত চক্রবর্তী)

এখানে **প্রতিদিন** রোদ্দুর আসে, সকালের **প্রথম** রোদ্দুর

(তৃপ্তি, উচ্ছ্বাস, বিষণ্ণতা)

(প্রমোদ বসু)

আঁচলে **কাঁচ** বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ **সোনা**
এখানে মন বড় **কৃপণ**, এখানে থাকবো না

(অভিমান, তাচ্ছিল্য, হতাশা)

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এ কয়টি দৃষ্টান্ত কেবল ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার জন্য তুলে ধরা হ'ল। এরকম অনুশীলন আরও অনেক করা দরকার। নিজে বাক্য বা কাব্যপংক্তি নির্বাচন করে নিজেই মানানসই অভিব্যক্তি প্রয়োগ করে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে।

এর পরবর্তী ধাপে আমরা আসব ধ্বনিব্যঞ্জনাসম্ভব কাব্যপংক্তির ওপর অভিব্যক্তির রং চাপানোর কাজে।

বসন্তের নানা ফুলে গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণ গানে।

(রবীন্দ্রনাথ)

এই পংক্তির ধ্বনিব্যঞ্জনা করলে বসন্তের বাতাস, পুষ্পগন্ধ ও বনাঞ্চলের আলোছায়ায় মৌমাছির গুণগুণানি—এসব প্রকাশ করা যায়। এই যে শ্রুতির কাছে গন্ধ, স্পর্শ ও দৃশ্যের ইশারা পৌঁছল, এগুলি কোন্ অনুভব থেকে বলা হবে ? এই পরিবেশের চিত্রণ যে নিছক বর্ণনা হিসেবেই করতে হবে তেমন না-ও হতে পারে। এই চিত্রটির সঙ্গে হৃদয়ের অন্য আবেদনও তো প্রকাশ করা যায়।

ধরা যাক্ প্রথমে প্রকাশ করা হল বিষণ্ণতা, তারপর আনন্দ।
এটাই হ'ল ধ্বনিব্যঞ্জনা বজায় রেখেও অভিব্যক্তি প্রকাশের অনুশীলন।

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা

(রবীন্দ্রনাথ)

ঘনীভূত কালো মেঘের বিপুল বেগে ধেয়ে আসা, ঘনায়মান অন্ধকার, আসন্ন বৃষ্টির শীতলতা, বাতাস ও মেঘের শব্দ—এরকম মিশ্র দৃশ্য-স্পর্শ-শ্রুতির অনুভব এই শব্দগুলির ধ্বনি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারেন আবৃত্তিকার। তাই-ই ধ্বনিব্যঞ্জনা। তারপর আবৃত্তিকার অভিব্যক্তির রংও চাপাতে পারেন।

আশঙ্কা, আনন্দ, বিষণ্ণতা—যে কোনোটি।

সারাদিন ঝর্‌ঝর্ থর্‌থর্
কাঁপে পাতা পত্তর্

(রবীন্দ্রনাথ)

তালগাছের পাতায় হাওয়া লেগে অনেক ওপরে যে শব্দ হয় এবং সেই মৃদুমন্দ বাতাসের অনুভব দুই-ই জাগিয়ে দেওয়া যায় ধ্বনিব্যঞ্জনা দিয়ে। সেই সঙ্গে অভিব্যক্তি হিসেবে আনন্দ বা বেদনা বোঝানো যায়।

ঘুম নামে নদীটির নয়ানে

লিপটাং থেকে অ্যাবডোমেনের দিকে মীড়সহ গড়িয়ে যাওয়া স্বরে কেবল পংক্তিটি উচ্চারণ করলে নিদ্রাকালীন চোখের পাতার বুজে আসা, সম্মুখস্থ আলো ও দৃশ্যের ক্রমশ মুছে যাওয়ার অনুভব ফুটে ওঠে। ম, 'ন' এর অনুপ্রাসে এই প্রক্রিয়াটিই ধ্বনিব্যঞ্জনা। কিন্তু ওই সন্ধ্যার আগমনে আবৃত্তিকার তৃপ্ত, না ভীত, না বিষণ্ণ ? ধ্বনিব্যঞ্জনাসহ সেইটি প্রকাশ করার নামই অভিব্যক্তি।

কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ও ছন্দের মতো অভিব্যক্তিও আমাদের আবৃত্তিরূপ গড়ে তোলার একটি উপাদান। সেটি আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। পরবর্তী ধাপে আমাদের অনুশীলনের বিষয় হ'ল, অভিব্যক্তির মাত্রা। যেমন,

ছাড়ো।

এই শব্দে ক্রোধ প্রকাশ করা হবে। প্রথমে অল্প ক্রোধ, তারপর তার চেয়ে বেশী, তারপর আরো একটু বেশী। তারপর আরো।

খেয়াল রাখতে হবে, যে অভিব্যক্তির এই মাত্রাবৃদ্ধি মানে কিন্তু চীৎকার বাড়ানো বা পর্দা চড়ানো নয়। চীৎকার করলে বা তীক্ষ্ণতা বাড়ালেই যে ক্রোধের মাত্রাবৃদ্ধি প্রকাশ করা যাবে এমন নয়। ক্রোধ নামক যে ভাব আমরা প্রকাশ করি, তারই নিয়ন্ত্রণ। সেটা, এমন কি একই স্তরে গলা রেখেও, করা যেতে পারে।

কান ও কণ্ঠের মিলন না ঘটলে, আবৃত্তি-চর্চার অনেক কিছুই বোঝানো কষ্টকর হয়ে পড়ে, সেই অসুবিধেটা এখানেও হচ্ছে। বোঝার সুবিধের জন্য এরকম বলা যেতে পারে, যে, এই অভিব্যক্তির মাত্রার ওপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে নাটকীয়তা বা অতিনাটকীয়তা। বর্ণনার মধ্যে ক্রোধ প্রকাশ করলে যেমন কিছুটা নিষ্প্রভ (sublime) থাকে। তাকেই সাধারণ কথোপকথনে বললে মাত্রা একটু বাড়ে। নাট্যসংলাপ হিসেবে উচ্চারণ করলে আরও একটু, আবার যাত্রার সংলাপ হিসেবে বললে সেই মাত্রা বেশ বাড়াবাড়ির পর্য্যায়ে চলে যায়।

চলে যাব।

কথাটায় দুঃখ প্রকাশ করে, তার মাত্রা এইভাবে বাড়াতে থাকলে ক্রমশঃ তা কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। এই হচ্ছে অভিব্যক্তির মাত্রা। অনুরূপ ভাবে,

ইয়ারকি পেয়েছো।

(কৌতুক— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

আর চলছে না।

(হতাশা— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

দাও না।

(আবদার— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

তুই এমন কথা বলতে পারলি।

(ব্যথা— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

আমি ছিনায়ে আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগল কন্যা

(নজরুল্ ইস্‌লাম্)

(উদ্দীপনা— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

আহা আহা সোনার মেয়ে, কেমন করে ভুললে আমায়

(জসীমউদ্দিন)

(ব্যাথা— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

ভুল করে আমরা কখনো পদমর্য্যাদাকে খেয়ে ফেলি না
জিভে কষ্ট হয় আমাদের

(ব্রত চক্রবর্তী)

(বিদ্রূপ— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে ঝন্‌কে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

(শঙ্কা— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

লক্ষ্মী সোনা মাণিক আমার, এবার খেয়ে নে

(অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়)

(স্নেহ/আদর— মাত্রা ১, মাত্রা ২, মাত্রা ৩)

এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। এরকম উদাহরণ আরো নিজে নিজে সংগ্রহ করে, অনুশীলন বাড়াতে হবে। এই অনুশীলনও কয়েকজনে মিলে করলে ভালো। তা প্রেরণাদায়ক ও ফলপ্রসূ।

আবৃত্তির সময় অভিব্যক্তির মাত্রার এই নিয়ন্ত্রণের ওপরেই তার মান অনেকাংশে নির্ভরশীল।

আমরা যখন একটি কবিতা আবৃত্তির জন্য নির্ব্বাচন করি, তখন কিন্তু তার এক একটি পংক্তিতে বা পংক্তিবন্ধে যে এরকম এক একটি অভিব্যক্তিই প্রকাশ

করার থাকে, তা একেবারেই নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি পংক্তির মধ্য দিয়ে আমরা মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই।

তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে।

(রবীন্দ্রনাথ)

এই পংক্তিটা দিয়ে যে শুধু বিদ্রূপ প্রকাশ করতে চাই তা নয়, এর সঙ্গে অনেকখানি ব্যাথাও মিশে থাকে। এমন কি কারো কারো চেতনায় একই সঙ্গে ক্রোধ প্রকাশের ভাবনাও আসতে পারে। অনেক সময়ই এমন ঘটে যে, আবৃত্তি করতে করতে এই পংক্তিতে পৌঁছলে আপনা-আপনিই ওই মিশ্র অভিব্যক্তি কণ্ঠে ফুটে ওঠে। সেটা স্বভাব-প্রতিভা দ্বারা উৎসারিত বলা যায়। কিন্তু বারে বারে কবিতাটি আবৃত্তি করলে যে প্রতিবারই সেটা ঘটবে এমন আশা করা যায় না। তবে, প্রক্রিয়া হিসাবে কণ্ঠে এরকম প্রকাশের অনুশীলন করলে সেটা ঘটানো সম্ভব।

প্রথমে, পংক্তিটি দিয়ে বিদ্রূপ প্রকাশ করা হ'ল।

তারপর, বিদ্রূপের সঙ্গে ব্যথার অভিব্যক্তি মেশানো হ'ল।

তারপর, পূর্ব্ব অভিব্যক্তিগুলি সমেত ক্রোধ প্রকাশ করা হ'ল।

এটি খুবই কঠিন অনুশীলন।

কবিতা আবৃত্তির সময় কোনো পংক্তিতে এরকম মিশ্র অভিব্যক্তি প্রকাশের ভাবনা দেখা দিলে, তার কোন্ অভিব্যক্তিটি প্রধান হবে ও কোন্‌গুলির স্পর্শমাত্র থাকবে, সে বিচারেরও প্রয়োজন।

এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি এই লেখা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে করে দেখতে হবে। না-হলে কেবল তত্ত্ব হিসাবে এই লেখা, আবৃত্তি-চর্চাকারীর কোনোই কাজে আসবে না।

মিশ্র অভিব্যক্তি প্রকাশের অনুশীলনের জন্য আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বতোৎসারিত মিশ্র অভিব্যক্তির দ্বারা অনুশীলন না করে, প্রথমে একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, পরবর্তী ধাপে অপর অভিব্যক্তিকে তার সঙ্গে মেশাতে হবে।

লুটে নেবো হৃদ, টিলাগুলি, আমি জঙ্গী
দূর বনপথে ঝরে ঝরে যাবে রঙ্গন,

ছোটাবো তুফান ঘোড়াটি, যাবে না সঙ্গে ?
তোলো মুখ, এসো, ধরো হাত, চলো সঙ্গে।

(মৃদুল দাশগুপ্ত)

(প্রেম ও উদ্দীপনা)

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে

(নজরুল্ ইস্লাম্)

(ক্রোধ ও ব্যথা)

কতদিন এই বনে
দিক্-দিগন্তরে আষাঢ়ের নীলজটা
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্মহীন দিনে সঘনকল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয়, ...

(রবীন্দ্রনাথ)

(স্মৃতি + তৃপ্তি + বেদনা)

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা
তারার আলোক সাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য।

(রবীন্দ্রনাথ)

(বেদনা ও উদ্দীপনা)

আরও এরকম উদাহরণ নিজে অনুসন্ধান করে অনুশীলন করতে হবে।

কণ্ঠ, উচ্চারণ, ছন্দ, অভিব্যক্তি—আবৃত্তি শিল্পের এই চার আঙ্গিক ও উপাদানের বিশ্লেষিত ও পৃথক পৃথক চর্চার কথা ক্রমান্বয়ে বলা হ'ল। এই চর্চালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে আবৃত্তিরূপ গড়ার কাজ এরপর। সেটা যে কে কেমনভাবে করবেন, তা একান্তভাবেই নির্ভর করে তাঁর সৃজনীশক্তি ও কল্পনাশক্তির ওপর, নির্ভর করে শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধির ওপর, সর্বোপরি জীবন, প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব বিষয়ে তাঁর সংবেদনশীলতার ওপর।

অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ

আবৃত্তি এমনই একটা বিষয়, যে এর চর্চা করতে বসে বাক্‌যন্ত্রের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী শিখতে হয় প্রায় একজন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের নিষ্ঠায়, স্বর ও স্বরগ্রাম সম্বন্ধীয় চর্চা করতে ও স্বরান্তরের অনুভবসকল জেনে নিতে হয় সংগীতসাধকের মতই কঠিন অনুশীলন দিয়ে, উচ্চারণ শিখতে গিয়ে পৌঁছে যেতে হয় বাংলা ব্যাকরণের জটিল অরণ্যে, ছন্দ শিখতে গিয়ে যতখানি শ্রম স্বীকার করতে হয় তত্ত্বে ও প্রয়োগে, ঠিক ততখানি দায় এমন কি ছান্দসিকেরও থাকবার কথা নয়, অভিব্যক্তি-চর্চা সূক্ষ্মতার নানা ধাপে একজন নাট্যকর্মীর শিক্ষাকেও হার মানাতে পারে, কাব্য ও কবিতা বোঝার বা উপলব্ধির জন্য প্রতিটি কবির সমগ্র রচনা ও প্রতিটি কবিকর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা যত বেশী পড়া যায়, ততই ভালো। শিল্প কী ও কেন, ও সেই নিরিখে আবৃত্তি শিল্প কি না তার সন্ধানে শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক যত লেখা জোগাড় করা সম্ভব পড়ে ফেলা ভালো, কেবল সেই সব আলোচনায় কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ইত্যাদির স্থলে আবৃত্তিকে সেই আসনে বসিয়ে নিয়ে পড়তে হবে, কেন না এ হেন অস্পৃশ্য শিল্পকে এতাবৎ কোনো আলোচনায় স্থান দেওয়া হয় নি। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসটুকু তো নিদেনপক্ষে আবৃত্তিকারকে জানতেই হবে, আর সেইটে জানবার পথে দেশের ইতিহাস জানাটাও কম জরুরী নয়। কবিতার বহিরঙ্গে ও অন্তর্লোকে যত রকম পট-পরিবর্তন হয়েছে, তাকে নিঃসঙ্গ বা বিচ্ছিন্নভাবে বুঝে ওঠা যায় না। তাকে জানতে হয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য বা সংগীতেরও নানা বিবর্তন বা নানারীতির সাযুজ্যে। তাই আবৃত্তিকারকে এই শিল্পগুলি বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। অনুভব করতে শিখতে হবে এ সকল শিল্পেরও রূপ-রস-গন্ধ। অভিনয়-শিল্প যে আবৃত্তিরই পিঠোপিঠি, সে কথা তো বহুল প্রচারিত। এইভাবে, সত্য হয়ে ওঠে সেই প্রবাদ "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। কেবলমাত্র এতদূর নিষ্ঠাবান একজন আবৃত্তিকারই অবশ্য ওই প্রবাদের সত্যোপলব্ধিতে পৌঁছতে পারেন।

এরই মধ্যে প্রয়োগের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী একটি চর্চার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবো। ভাষা চর্চা। ভাষার একটা দিক্ হল সাহিত্যগত গঠন বা ব্যাকরণ-গত গঠন। অন্যদিক হ'ল বাচন। মানুষের মুখের ভাষা। সাহিত্যে অনেক সময় মুখের ভাষাকেই, তার স্বাদগন্ধসমেত ধরতে চেষ্টা করা হয়। আবার কখনো ভাষাকে কিছুটা স্টাইলাইজ্‌ড্‌ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। এই স্টাইলাইজেশন্‌ কখনো নির্ভর করে রচয়িতার নিজস্ব মেজাজের বা মানসিকতার ওপর, কখনো একই রচয়িতা নানা সময়ে নানা প্রকরণে ভাষাকে খেলান। কখনো বা সাহিত্যভাষার ক্রমান্বয়ী বিবর্তনের বশবর্তী হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসে সেরকম স্টাইলাইজেশন্‌।

আবৃত্তিকারের মুশ্‌কিল হ'ল এই সবরকমের ভাষাই তাঁকে মুখে প্রকাশ করতে হয়। যা মুখের ভাষার খুব সন্নিকট, তাকেও। যা মুখের ভাষা থেকে কিছুটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাকেও। আবার হয়তো স্বাভাবিক ক্রমবিবর্তনের পথে কোনো একসময় মুখের ভাষার কাছাকাছি ছিল যে ভাষা, কিন্তু এখনকার প্রাত্যহিক ভাষার থেকে তার কিছু দূরত্ব বেড়েছে, তাকেও।

যাঁরা মনে করেন, সাহিত্যভাষাকে বা সাহিত্যকে জনসমক্ষে প্রদর্শন করাই আবৃত্তিকারের কাজ, তাঁরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'ন হয়তো এই ভেবে যে, যে-ভাষা যেমন লেখা আছে তাকে তেমন পড়ে গেলেই হবে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গে জীবনানন্দের ভাষার যা তফাৎ তা সেই ভাষার সাহিত্যিক গঠনের মধ্যেই রয়েছে, কেবল স্থিরভাবে পড়ে গেলেই দুই ভাষার পার্থক্য কণ্ঠে-ও ফুটে উঠবে। আমাদের সাহিত্যজগতের অনেক বিদগ্ধ ও শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবি আবৃত্তিকারদের তেমনি পরামর্শও দেন। কিন্তু এই চিন্তার ভেতরে এক অতিসরলীকরণের প্রবণতা রয়েছে। যিনি শ্রুতিমাধ্যমে কোনো ভাষার উপস্থাপন সম্বন্ধে সম্যক চর্চা করেছেন, তিনি এই সরলীকরণ মানতে পারেন না।

প্রত্যেক মানুষের রয়েছে নিজস্ব ভাষা। ভাষা বলতে এখানে বুঝতে হবে মুখের ভাষা। সেই ভাষার শ্রুতিগত পূর্ণ চেহারাটা ও সংবেদনক্ষমতা যেমন নির্ভর করছে সেই মানুষটির কণ্ঠস্বর ও বাক্‌যন্ত্র, উচ্চারণযন্ত্রের গঠনের ওপর, তেমনি নির্ভর করছে তার ব্যক্তিগত মানসিক গঠনের ওপর, শিক্ষা ও রুচির ওপর, তেমনি নির্ভর করছে কোন্‌ পরিবেশে ও সময়ে সে লালিত হয়েছে সেই পরিবেশ ও কালগত প্রভাবেরও ওপর। সে যখন নিজে কথা বলে, এ সব

ব্যাপারই ক্রিয়া করে তার মুখের ভাষার বাক্যগঠনপ্রণালী ও বাচন-বৈশিষ্ট্যের ভেতর। বাচনবৈশিষ্ট্য বলতে তার উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ, কথার সুর ও ঝোঁক, বাচনিক মুদ্রাদোষ—সবই।

কেউ যখন অন্য কোনো ভাষা কণ্ঠে প্রকাশ করে, তাকে তার ওই নিজস্ব স্বভাবের (নাকি অভ্যাসের?) বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এবং সেই অপর প্রকাশিতব্য ভাষার যে একটি ধ্বনিপ্রকৃতি ও ইনটোনেশন্ আছে, সেটি বুঝে, তাকে গুরুত্ব দিয়ে উচ্চারণ করলে, তার সঙ্গে উচ্চারণকর্তার নিজস্ব ভাষার একটা টানাপোড়েন তৈরী হয়। ফলে ভাষার মধ্যে জেগে ওঠে একটা তৃতীয় স্বর। এটা যে-কোনো সাহিত্যভাষা উপযুক্ত গুরুত্বসহ উচ্চারণ করার সময় যে-কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই, আবৃত্তি শিক্ষার প্রথমতম ধাপ থেকে শিক্ষাক্রমের সকল পর্যায়ে, কখনোই শিক্ষার্থীর নিজস্ব বাচনভঙ্গিকে শিক্ষকের বাচনভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হতে দেওয়া উচিত নয়।

অধিকাংশ অভিনেতাই, যাঁরা মনে করেন, অভিনয় জানলে আবৃত্তি আপনিই করা যায়, ওটা কোনো আলাদা চর্চার বিষয় নয়, তাঁরা প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধ্বনিপ্রকৃতি ও ইনটোনেশনকে অবহেলা করে, আপন বাচনবৈশিষ্ট্যে তাকে সরাসরি ঢালাই করে ফেলেন। ফলে, অভিব্যক্তির প্রকাশটাই সেখানে অন্য সব কিছুর থেকে বড় হয়ে ওঠে, ও আবৃত্তি হয়ে ওঠে বাচিক অভিনয়। ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যজনিত সেই তৃতীয় স্বরটি অনাবিষ্কৃত থেকে যায় অযত্নের ফলে। উপস্থাপিত ভাষার নিজস্ব স্বাদগন্ধের সবটাই স্খলিত হয়ে পড়ে তাঁদের সেই উপস্থাপনে, সেই সঙ্গে ঝরে যায় কাব্যবিভাও। যার ফলে, মনে হতে থাকে, ফুটে উঠল কেবল একটা নাটুকে আবেগ।

যাঁরা মনে করেন স্থির শান্ত কণ্ঠে কবিতাটি ধীরে ধীরে পড়ে গেলেই ফুটে উঠবে তার সমস্ত মহিমা, তাঁরাও, কোনোদিন আপন কণ্ঠে ভাষা উচ্চারণের ফলে জেগে ওঠা সেই তৃতীয় স্বরের হদিশ পাবেন না। কেন না, তাঁরা কবিতাপাঠেরই বা কথনেরই একটা একমুখী নিরুপদ্রব ছাঁচ গড়ে নিয়েছেন, সেই ছাঁচেই ঢালাই হয়ে যাচ্ছে সমস্ত ভাষা।

মনে রাখতে হবে, এই পর্যায়ে পৌঁছনোর আগে একজন আবৃত্তিকার নিজেকে তৈরী করেছেন নানা ভাবে। কণ্ঠস্বরের অবাধ ও অনায়াস গতিভঙ্গিতে ও সূক্ষ্মতম স্বরান্তরজাত অনুভবের সঠিক জ্ঞানে, উচ্চারণের শুদ্ধতায় ও নানা

ব্যঞ্জনায়, ছন্দের ও অভিব্যক্তির নানাবিধ সম্ভাব্য প্রকাশে। সব মিলিয়ে তাঁর প্রস্তুতি এমন যে, যে-কোনো অনুভব তাঁর ভেতরে বাজবে, তা-ই ফুটে উঠতে পারবে কণ্ঠে, কখনো চকিতে, কখনো বহু অতৃপ্ত ভাঙাগড়ার পর। এই অবস্থায় ভাষার বৈশিষ্ট্যের চর্চা তাঁর কর্তব্য।

যে ভাষা তিনি উচ্চারণ করবেন, তার দুটি দিক যেন সর্ব্বদা আবৃত্তিকারের লক্ষ্যে থাকে। যে শব্দে ভাষা বিন্যস্ত তার ধ্বনির দিক্, ও যে কথা সেই ভাষা দিয়ে বলতে চাওয়া হয়েছে, সেই কথার সুর ও ঝোঁক (intonation)। এ দুটি বিষয়ে সচেতন হয়ে যখনই নিজের শিক্ষিত বাক্‌যন্ত্রে তিনি প্রকাশ করবেন সেই ভাষা, তাঁর নিজস্বভাষার সংমিশ্রণে সেই তৃতীয় স্তর অবশ্যই জেগে উঠবে। ভাষা থেকে ভাষান্তরে পরিক্রমা করে তিনি সেই স্তরটি সৃজনের আনন্দ খুঁজে নিতে পারেন। এবং অন্য দীক্ষিত আবৃত্তিকারের কণ্ঠে আবৃত্তি শোনার সময়ও এই সৃজন তাঁর উপভোগের বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

এই চর্চা করার জন্য ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্য ও পদ্যভাষার আবৃত্তি প্রয়োজন। যেহেতু সাহিত্যভাষা সাহিত্যিকের নিজস্ব মেজাজ ও রুচির ওপরও নির্ভর করে, তাই প্রত্যেক কবির সমগ্র কবিকর্মে ভাষার ক্রমরূপান্তর ও সেই ভাষাসমূহ আবৃত্তিকারের নিজস্ব বাচনবৈশিষ্ট্যে কোন্‌টা কেমন রূপ পায়, সেই নিরীক্ষাও জরুরী। প্রতিটি কবির কবিকর্ম ধরে, আলাদা আলাদা করে।

অনেক আবৃত্তিকারই, তাঁদের নানা লেখায় বা বক্তৃতায় বলে থাকেন যে জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত বা নজরুল আলাদারকম করে বলতে হবে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় তিনিই রবীন্দ্রনাথের মত সুর করে বলছেন মাইকেলের মেঘনাদবধ বা নজরুল-কাব্যভাষার মতো প্রবল স্বরাঘাত ও উত্থানপতনযোগে বলছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও কবিতা। ভবিষ্যৎ চর্চাকারীরা এই সব আবৃত্তির নেতির দিক্‌টা বুঝে নিলে, তা মঙ্গলজনক হবে।

আবৃত্তিকারের নিজস্ব বাচনস্বভাব যে সবরকম ভাষাকেই এমনভাবে গ্রহণ করতে পারবে যাতে জেগে ওঠা তৃতীয় স্তর প্রণিধানযোগ্য বা শিল্পিত প্রতিভাত হবে, তা না-ও হতে পারে। এই সহজ ও সুন্দরকে অর্জন করে উঠতে পারবেন যে ভাষার সংযোগে, তেমন ভাষাই নির্ব্বাচন করা উচিত আবৃত্তিকারের।

অন্তরালেই যদিও অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করবেন আবৃত্তিকার, কিন্তু তাঁর মূল কাজটা যেহেতু জনতার দরবারে, নির্ব্বাচন

ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী আবৃত্তিকারের পক্ষে। জনরুচির সঙ্গে সহজেই আপস করে নিয়ে চটুল মনোরঞ্জন বা সস্তা উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা যেমন একজন দায়িত্বশীল শিল্পীর পক্ষে অপমানজনক, তেমনি সৎ সাহিত্য বা গভীর কবিতা প্রচার করার গৌরব অর্জন করার মোহে যদি তিনি শ্রোতার সঙ্গে সংযোগই হারিয়ে ফেলেন, তা-ও শিল্পী হিসেবে তাঁর চরম ব্যর্থতা। যে কোনো শিল্পীর মতো আবৃত্তিকারেরও দায়িত্ব ভোক্তাকে গভীরতায় টেনে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু তারও আগে বিচার্য্য যে, কতটা গভীরে তিনি টেনে নিতে পারেন, কতটুকু তাঁর শক্তি!

অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা থাকা উচিত নয়। সবরকম বিষয়ই যাতে আবৃত্তি করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, অনুশীলন তেমনভাবেই করতে হবে। কিন্তু জনসমক্ষে তা পরিবেশনের সময় নির্ব্বাচন যথাযথ হতেই হবে। এবং নির্ব্বাচনের যাথার্থ্য অনেকাংশেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

অনেকে খুব সহজেই এর সমাধান করে দেন। যার গলায় যে কবিতা মানায়, সেরকম আবৃত্তি করলেই হ'ল। যেন কণ্ঠবাদনই আবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য!

কণ্ঠের সীমা ও সৌকর্য্য নিশ্চয়ই বিচার্য্য। সেই সঙ্গে বিচার্য্য, যে বিষয় নির্ব্বাচন করা হচ্ছে তার ভাষা ও মেজাজ। আবার, এ সবই পরিবেশনের স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্নরকম হবে। যে বিষয় পঁচিশজন মরমী শ্রোতার মধ্যে পরিবেশন করা চলে, তা-ই পাঁচহাজারী জনসমাবেশে চলে না। কারণ, এই দুই পরিবেশে, পরিবেশগত কারণে, শ্রোতার মনঃসংযোগ একইরকম থাকে না। আবার একই কবিতার যে আবৃত্তিরূপ ঘনিষ্ঠ ও মন্ময় পরিবেশে পরিবেশন করা চলে, বিক্ষিপ্ত মানসিকতার শ্রোতাদের কাছে সেই কবিতারই আবৃত্তিরূপে স্বরের উত্থানপতন, ছন্দের ঘাত, অভিব্যক্তির মাত্রা অনেক বাড়িয়ে তুলতে হয়। তবেই যথার্থ সংযোগ ঘটে ওঠে। এমনকি, একই কবিতার দু-তিনরকম প্রয়োগভাবনা সম্ভব হলে, তার সবগুলিই সব পরিবেশে আবৃত্তি করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও সঠিক নির্ব্বাচনের কথা আবৃত্তিকারকে ভাবতে হবে।

নির্ব্বাচনের বিচারে ভাষার আত্মীকরণ সমস্যার কথা বলেছি। আবৃত্তিকারের নিজস্ব মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এবং তার কণ্ঠে যা মানায় সেই অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনও একটা দিক্, পরিবেশ অনুযায়ী নির্ব্বাচনও একটা দিক্।

কিন্তু এইসব কিছুর ঊর্দ্ধে একটা কথা রয়ে যায়। আবৃত্তিকার একজন সৎ শিল্পী। তাই তিনি যা কিছু সত্য বলে উপলব্ধি করবেন, কেবল

সেটুকুই বলবেন জনতার কাছে। যিনি মিটিং-মিছিলে আনন্দ পান না, তিনি যখন জেহাদের শ্লোগান আওড়ান, যিনি ঈশ্বরকে কোনোভাবেই উপলব্ধি করেন না, তিনি যখন অধ্যাত্মচেতনার কবিতা বলতে যান, যিনি কখনো বর্ষার সজল হাওয়া বা ঘনঘটায় উদ্বেল হ'ন নি, তিনি যখন তেমন কোনো বিষয় গলার নানা কসরৎ করে উপস্থাপন করেন, তখন নির্বাচনের অন্য সব শর্ত যতই অক্ষুন্ন থাকুক, সে আবৃত্তি শিল্পের নন্দনবিন্দুকে ছুঁতে পারে না। সে যান্ত্রিক আবৃত্তি শুনে কান যদি বা ভরে, মন কখনো ভরবে না। তাই, সব শিল্পের মতো আবৃত্তিতেও ফরমায়েশী কাজ খুব কমই উতরোয়।

অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে মাইক্রোফোনের ব্যবহারও একটি। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতর কারো পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে, মনে রাখতে হবে, ইদানীং ব্যবহৃত সব মাউথপীসেই ডায়াফ্রাম খুব ছোট। তাই সরাসরি স্বর ও শ্বাস সেই ডায়াফ্রামে পড়লে THRUST বা ধাক্কা আসে। মাইক্রোফোনে প্রবেশ করবে কেবল স্বরের তরঙ্গ, শ্বাস ও স্বরের ঘাত কোণাকুণি বেরিয়ে যাবে—এইভাবে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা উচিত। এবং আবৃত্তি করতে করতে উৎপাদিত ধ্বনির প্রতি কান রেখে মুখের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। প্রত্যেকের স্বরের স্বাভাবিক ঘনত্ব ও তীব্রতা অনুযায়ী তাকে নিজেকে মাইক্রোফোন ব্যবহার আয়ত্ত করতে হবে। আবার সব মাইক সমান সংবেদী নয়, সেই অনুযায়ীও ব্যবহারের তারতম্য হয়। নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বজায় রেখে (বেশী চীৎকার না করে বা গলা না চেপে) যাতে আবৃত্তি করা সম্ভব হয়, একটি দুটি আবৃত্তি করার পর মাইক্রোফোন সেই অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেওয়া উচিত। এক এক মাইক্রোফোনের এক এক রকম চরিত্র। বেতার কেন্দ্রের মাইক্রোফোন ৪৫° কোণ থেকে সবচেয়ে ভালো শব্দগ্রহণ করে। কোনো কোনো স্টুডিওতে মাইক ব্যবহার করার সময় মুখ একটুও নড়ানো চলে না। যাঁরা আবৃত্তি করার সময় স্বর ও উচ্চারণের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মুখ বা শরীর নাড়ানোর অভ্যাস করে ফেলেছেন, তাঁদের মাইক্রোফোন ব্যবহারে নানা অসুবিধা হয়। চর্চার গোড়াতেই এ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ভালো। আবৃত্তির স্বরক্ষেপণের রেজিস্টার (আপার, মিড্ বা লোয়ার) এবং শুদ্ধ ও কোমল পর্দার ব্যবহার অনুযায়ীও মাইক্রোফোন থেকে দূরত্ব বাড়ানো-কমানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। আবৃত্তিকারের কণ্ঠের অনুনাদ ও মাইক্রোফোনজাত অনুনাদের সামঞ্জস্য সাধনেরও একটা ব্যাপার আছে। সেই অনুযায়ী স্কেল বা রেজিস্টার নির্বাচন, প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে।

তিলে তিলে তিলোত্তমা

একটি কবিতা কেন আবৃত্তির জন্য নির্ব্বাচিত হবে, তা একান্তভাবেই নির্ভর করে আবৃত্তিকারের ওপর। তিনি নিজের বলবার বিষয়টাই খুঁজে পেয়েছেন বলে এই নির্ব্বাচন অথবা কবিতাটার অভিঘাতেই জন্ম নিলো তাঁর মধ্যে প্রকাশিতব্য কিছু অথবা পূর্ব্বলালিত প্রকাশিতব্যও ছিল, কবিতাটাও লক্ষ্যে ছিল কিন্তু আকস্মিক জন্ম নিলো কোনো রূপারোপের চিন্তা—এরকম অনেক কারণই থাকতে পারে। একটি কবিতার আবৃত্তিরূপও তাই, ব্যক্তিভেদে উদ্দেশ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে।

এ লেখায় যা কিছুই আলোচিত হচ্ছিল, যতক্ষণ সেটা অনুশীলন ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল তাকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সাধারণীকৃত একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বলবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আবৃত্তি শিল্পসৃষ্টিব্যাপারে লেখক কেবল তাঁর নিজের সৃষ্টিভাবনাই ব্যক্ত করতে পারেন। অন্যেরা কী করবেন, কী ভেবে করবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার। সেই মতো আবৃত্তিরূপ তাঁরা খাড়া করবেন

ছেলেবেলায় মাসে মাসে বাবা টাকা পাঠাতেন। দিতে আসত ক্ষয়া চেহারার একটি বৃদ্ধ ডাকপিয়ন। ওই টাকা ক'টার জন্য পথ চেয়ে থাকতে হ'ত। মায়ের নামে আসত। মা-ই সই করে নিতেন। ওই বৃদ্ধ লোকটির আবির্ভাবটুকু এতই আশার ব্যাপার ছিল যে লোকটির প্রতি একটা আপনতা-বোধ জন্মে গিয়েছিল বালকের। লোকটির একটি ছেঁড়া ছাতা, তালিমারা জামা, পায়ে আধক্ষয়া হাওয়াই চপ্পল। নিজেই যে দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি, সেই আবার আমাদের মাসশেষের নিরর্থ দিনগুলোর পারে রসদের আশ্বাস নিয়ে আসতো। এই সব মিলে, ডাকপিয়ন শ্রেণীর প্রতিই একরকম সমব্যথামিশ্রিত কৌতূহল গড়ে উঠেছিল।

তারও অনেক পরে, স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ার সময় নানা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া ও তারও পরে চাকুরীর জন্য নানা চিঠি বিনিময়ের

সূত্রে, আমাদের এলাকার ডাকপিয়ন যারা, তাদের সঙ্গে মুখচেনা হয়ে গিয়েছিল খুব। কখনো রাস্তায়ই দিয়ে দিত চিঠিপত্র। এরা আমার সেই বালককালের লোক নয়, কিন্তু ডাকপিয়ন সম্পর্কিত সেই সেন্টিমেন্ট, কাজ করত এদেরও সঙ্গে এই সব স্বল্পতম বিনিময়ের সময়। বিশ বছরে এদের খুব কিছু পরিবর্তন তো হয়নি। নবীনকালের এই মানুষগুলোর মধ্যেও একই রকম দারিদ্র্যের ছাপ, একই রকম রুগ্না চেহারা। একদিন প্রবল বৈশাখে এদেরই একজন দুপুরে চিঠি দিতে এসে জল চেয়েছিল একগ্লাস। 'একটা ছাতা নেন না কেন?'—এ রকম অনুযোগের উত্তরে কেবল একটু হেসেছিল সে। সে হাসিতে একই সঙ্গে এত কথা বলা হয়ে গিয়েছিল যে, সেই অভিব্যক্তি যেন বহুমাত্রিক কোনো শিল্পেরই সংবেদন। কোনোদিন বা বর্ষায় তাকে দেখেছি বৃষ্টিতে ভিজেই বাড়ি বাড়ি ঘুরতে।

মধ্যবর্তী কোনো সময়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটা গান শুনি, 'রাণার'। অসম্ভব মুগ্ধ হয়ে যাই। তখনও আবৃত্তির জগতে তেমন করে ঢুকিনি। তখনও সুকান্তের লেখা কবিতাটা পড়া হয়নি। তখন রাণার-এর সমস্ত অভিঘাতটাই হেমন্ত-কথিত। বার বার শুনতে ইচ্ছে হ'ত। 'রাণার' আমি কখনো চোখে দেখি নি। ডাকপিওন সম্বন্ধে সমব্যথার কথা তুলতে ছেলেবেলায় কোনো গুরুজনের কাছে গল্প শুনেছিলাম তাদের। আমার চেতনায় রাণার আর ডাকপিয়ন একাকার হয়ে ছিল; গানটা শুনতে শুনতে আমার দেখা ডাকপিয়নের মুখ ভেসে উঠত। ডাকপিয়নের সঙ্গে দেখা হলে গানের কথাগুলো মনে এসে যেত।

আবৃত্তি করতে এসে বেশ কিছুদিন পর সুকান্তের 'ছাড়পত্র' হাতে পেয়ে কবিতাটা আবিষ্কার করি। প্রায় প্রথম পাঠেই স্মৃতিবদ্ধ হয়ে যায়। মনে হয়েছিল, আমার ডাকপিয়নদের সম্পর্কিত অনুভব ওই পংক্তিগুলো দিয়েই খুব ভালো বলা যায়। মনে হয়েছিল, গান দিয়ে যেন প্রকাশিত হয়নি সবটা। ব্যথা বা ক্ষোভের অনেকটাই সুরের মূর্চ্ছনায় পেলব হয়ে উঠেছে। আবৃত্তিতে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সেই বেদনা ও ক্ষোভ গলায় আনছিলাম। কিন্তু

আবৃত্তি সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

তখনও আজকের মতো আবৃত্তির পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে নি। নিজের কোনো অনুভবের কথা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ ছিল না। আবৃত্তি করতে হ'ত প্রতিযোগিতায়। যদি কোনো প্রতিযোগিতায় কখনো এই কবিতাটি নির্ধারিত হয়, তবেই সুযোগ পাওয়া যাবে এইসব প্রকাশের। তা-ও তার শ্রোতা মাত্র

তিনজন বিচারক। সেরকম সুযোগও একটা পাওয়া গেল। তখন সেই আবৃত্তির মধ্য দিয়ে দীর্ঘলালিত সব অনুভবই প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষোভের দিকটাই বেশী এবং সমগ্র আবৃত্তিই খুব উচ্চকিত আবেগে বিধৃত।

তারও বছর কয়েক বাদে, একদিন 'রাণার' অবলম্বনে একটি নাচের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়। নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্য্য। কবিতার কিছুটা বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে গাওয়া হচ্ছিল, কিছুটা আবৃত্তি। বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে চলছিল নৃত্যাভিনয়। এরই মধ্যে একটা অংশে শিল্পী বর্শা ডান হাতে নিয়ে, বাঁ হাতে পিঠের বোঝাটি ধরে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে দৌড়নোর ভঙ্গি করছিলেন। নৃত্য আঙ্গিকেই স্বল্প পরিসরে এগোনো-পিছনো। তখন কেবল তবলা বাজছিল। তবলার লয় আর রাণারের পদক্ষেপ মিলে যাচ্ছিল। কিন্তু কবিতার বাণী ওই লয়ে গাওয়া বা আবৃত্তি করা হচ্ছিল না। সম্ভবত ওই দৃশ্যটুকুর বর্ণনা একটু আগেই করা হয়েছিল। তখন কেবল তবলার বোলের সঙ্গে নাচটুকু।

তখনই আমার মনে হয়, 'রাণার' কবিতার ছয়-মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দকেই কাজে লাগানো যায় রাণারের পদক্ষেপ হিসেবে। এবং স্বরের ভেতরে একটা রোলিংসহ লয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি করে রাণারের দৌড়ে চলার গতি শ্রুতিমাধ্যমেই অনুভবসিদ্ধ করে তোলা যায়। এই কবিতার সে রকম আবৃত্তিতে কেবল পংক্তিগুলিকে ঘিরে বক্তব্যের বা আবেগের প্রকাশই থাকে না, তারই সঙ্গে এর একটি দৃশ্যব্যঞ্জনাও গড়ে ওঠে।

'রাণার'-এর আবৃত্তিরূপ এরপরই সম্পূর্ণতা পায়। যদিও এই পরিবেশন সম্ভব হ'ল তারও ছ-সাত বছর পর।

একটা কবিতা গলায় উচ্চারণ করার আগে সর্বপ্রথম ভাবতে হয় তার ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধে।

রাণার ছুটেছে/তাই ঝুমঝুম্/ঘণ্টা বাজছে /রাতে
রাণার চলেছে/খবরের বোঝা/হাতে

ছন্দ ও ভাষা-ভাবনা

ছ-মাত্রার এই কলাবৃত্ত, পর্বপ্রধান ছন্দ, তাল রেখে বলা হবে। ভাঙা-পর্বে এসে দাঁড়ানোর জায়গা। এর ভাষা সুকান্তের অন্যান্য কবিতার ভাষানুসারী। সুরের প্রাধান্যের কোনো অবকাশ নেই। ঋজু সুরধ্বনিহীন শব্দবিন্যাস। বক্তব্যও খুব সরাসরি।

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	H

প্রথম দুটি পংক্তিতে ছ-মাত্রার তালকে স্পষ্ট না করে একটু বর্ণনাত্মক করে বলি। রাত্রির অন্ধকার ও নৈঃশব্দকে ধরার চেষ্টা করি। ফলে, স্বরবিন্যাস এ রকম —

রাণার ছুটেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্‌ ঘণ্টা বাজছে রাতে

A_4 ....

রাণার চলেছে খবরের বোঝা হাতে

(A_4+n_1)—A_4..................

A_4 অ্যাব্‌ডোমেনের স্বরে প্রথম পংক্তিটি। দ্বিতীয় পংক্তির 'রাণার' শব্দটির শুরুতে A_4 ও ন্যাজালের কোমল স্বর n_1 যুগ্মভাবে শুরু হয়ে মীড়সহ 'চলেছে'র 'চ'তে এসে A_4এ মেশে। এবং বাকি অংশে A_4-এই দাঁড়িয়ে থাকে। 'ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঘণ্টা' শব্দ সমষ্টি দিয়ে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে আসা মৃদু নূপুরধ্বনির ব্যঞ্জনা আনার চেষ্টা থাকে, ম্‌, ম্‌, ণ্ট-এর ঝংকারে। কিন্তু তার জন্য স্বরস্থান নড়ানো চলে না, কেবল স্বরের প্রাবল্য কমিয়ে-বাড়িয়ে দূরাগত ধ্বনির ভেসে আসা বোঝানোর চেষ্টা করা যায়। 'খবরের বোঝা' শব্দ দুটিতে অর্থব্যঞ্জনার দ্বারা স্পষ্টতা আসে। এই দুটি পংক্তিতে 'বর্ণনা' ছাড়া অন্য কোনো অভিব্যক্তি নেই।

স্বরে, উচ্চারণে, ছন্দে, অভিব্যক্তিতে আবৃত্তিরূপ

পরের পংক্তিগুলিতে নিছক বর্ণনা থেকে ক্রমশঃ রাণারের ছুটে চলার দৃশ্যে পৌছনোর চেষ্টা।

রাণার চলেছে/রাণার

L_2........................

রাত্রির পথে/পথে চলে কোনো/নিষেধ জানে না/মানার।

L_2.................. L_3...... L_4......... L_5

দিগন্ত থেকে/দিগন্তে ছোটে/রাণার,

n_1................ ....

কাজ নিয়েছে সে/নতুন খবর/আনার।

L_4............ L_3 ...... L_2.... ..

প্রথম পংক্তিতে স্বর L_2তে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বরে আবর্তনের সামান্য আভাস আসে। ভঙ্গি বর্ণনাত্মক-ই।

দ্বিতীয় পংক্তিতে তালের ঘাতের সঙ্গে আবর্তনের (রোলিং) আভাস স্পষ্টতর হয়। যেন এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল রাণারের পায়ের প্রতি। তার চলা

যেন ছোটায় পরিণত হয়-হয়। স্বর ক্রমশঃ L_3 থেকে L_5এ গিয়ে পৌঁছয়, ফলে রাণারের গতিদৃশ্য ফুটে উঠতে চায়।

পরবর্তী পংক্তিতে n_1 কোমল স্বরের প্রয়োগে রাণারের দূর দূরান্তর গমনের কথা বিবৃত হয় মাত্র। দৃশ্যায়িত হয় না। স্বরের আবর্তন একই লয়ে বজায় থাকে। আবার চতুর্থ পংক্তিতে কথা বলার স্বাভাবিক ধরনে, স্বরে আবর্তনের বদলে, ছন্দের প্রতি পর্বে ঘাতের দ্বারা দৃশ্যের চলমানতা বজায় রেখে স্বর L_4 থেকে ধাপে ধাপে L_3 তে নেমে আসে।

পরবর্তী পংক্তি থেকেই ছ-মাত্রার চালকে রাণারের দ্রুত পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপিত করতে থাকি। প্রতি পর্বে তালের ঝোঁক স্পষ্ট হয় এবং প্রতি পর্বের মাথায় স্বরের আবর্তন (রোলিং) থাকে। ধাবমান মানুষের শ্বাস যেভাবে আবর্তিত হয়, সেই ছন্দটা ধরতে চাই। এর মধ্যে কোনো শব্দে ব্যঞ্জনাসৃষ্টির চেষ্টা না করে রাণারের গতিময় পদক্ষেপ ও তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-পড়ার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করি।

রাণার। রাণার।/

L_1 ....

জানা অজানার/বোঝা আজ তার/কাঁধে

L_1..................................

বোঝাই জাহাজ/রাণার চলেছে/চিঠি আর সং/বাদে

L_1..................................... ....

তার পরের পংক্তিতে,

রাণারের এই পদক্ষেপ ও গতির আবেশ ঠিক রেখে ভোরের আভাস আনি স্বরে। সেজন্য ন্যাজালের একটি কোমল পর্দা 'বুঝি ভোর হয় হয়' অংশে ছুঁইয়ে দিই।

রাণার চলেছে/বুঝি ভোর হয়/হয়

L_4............ n_1...... ....

পরবর্তী পংক্তিতে,

আরো জোরো : আরো/জোরে এ রাণার/দুর্বার দুর্জয়

(A_4+l_3) .... . L_3.........

স্বরে ওই রোলিং সমেত A_4 স্বর দিয়ে কণ্ঠ করি। এবং উদ্দীপনায় অভিব্যক্তিসহ একটু গমক বা ঝটকা আনি ছন্দে, লয়ও ঈষৎ দ্রুত হয়। এই

ঝটকা লাগে রোলিং-এরই বিন্দুতে। অর্থাৎ প্রথম 'আরো'তে এবং দ্বিতীয় 'জোরে' তে। প্রথম স্বরাঘাতটি পংক্তির প্রথম শব্দ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই আসে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বরাঘাত সৃষ্টির জন্য 'আরো জোরে'র পর কণামাত্র বিরতি নিয়ে 'আরো' শব্দটিকে অতিপর্ব ধরনে ব্যবহার করতে হয়। ফলে পরের 'জোরে' শব্দটিতে স্বরাঘাত বাড়ে। এই ঈষৎ হোঁচটের ফলে দুটি কাজ বেশী হয়। প্রথমতঃ, 'আরো জোরে' বাক্যটি উৎসাহদানের ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিয়ে, পরের 'আরো' থেকে উদ্দীপিত বর্ণনার অভিব্যক্তি করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, দৃশ্যব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে ধাবমান রাণারের ছুটে চলাটাও ঈষৎ ঝাঁকানি বা ছোট একটি লাফ সমেত দ্রুততর হয়ে উঠ্‌ল—এরকম এফেক্‌ট্‌ সৃষ্টি হয়। 'দুর্বার দুর্জয়' অংশে পৌঁছে, যখন দু'বারের গমকের ফলে লয়ে কিছুটা দ্রুততা এসে পড়েছে, স্বর থেকে খুব সাবলীলভাবে A_4 স্বরের কর্ড-টি প্রত্যাহার করে নিই। তার ফলে রাণার তার গতিময়তাসহ দৃষ্টিবলয়ের বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এগিয়ে যায় যেন।

তার জীবনের / স্বপ্নের মতো / পিছে সরে যায় / বন,
$(A_4+n_1)\cdots$ $(A_4+l_4)\cdots$ $(A_4+l_3)\cdots$ ...
আরো পথ আরো / পথ বুঝি হয় / লাল ও পূর্ব / কোণ
$(A_4+L_3)\cdots$ ....

A_4 স্বরকে কর্ড করে ন্যাজালের কোমল পর্দা n_1-এ পংক্তিটির শুরু। এখানে স্বরে রোলিং-এর আভাসমাত্র থাকে। প্রতি পর্বে শ্বাসাঘাত এমনভাবে পড়ে, যেন ছিটকে পেছিয়ে যাচ্ছে দৃশ্যাবলী এবং রোলিং-এর আভাস সমেত স্বর, A_4-কে কর্ড রেখে ক্রমান্বয়ে l_4, l_3 কোমল স্বরগুলিতে নামে। যার ফলে, ধাবমান রাণারের বিপরীতে পিছিয়ে যাওয়া দৃশ্যব্যঞ্জনার অনুভব স্পষ্টতর হয়। কিন্তু মুহূর্তেই গতির আবেশ ও উদ্দীপনা বজায় রেখে পরবর্তী পংক্তিটি, সুস্পষ্ট রোলিং-এ (A_4+l_3) যুগ্মস্বরে বলতে থাকি, লয় একইরকম রেখে। অভিব্যক্তি হিসেবে উৎকণ্ঠা কাজ করে। ইতিমধ্যে 'স্বপ্নের', 'লাল', 'পূর্ব্বকোণ' শব্দে অর্থব্যঞ্জনা হয়।

অবাক রাতের/তারারা আকাশে/মিটমিট্ করে/চায়
n_4..
কেমন করে এ/রাণার সবেগে/হরিণের মতো/যায়
$(A_4+l_3)\cdots(A_4+l_4)\cdots$ $(A_4+l_5)\cdots\cdots$

এখানে প্রথম পংক্তিটিতে রোলিং-এর ক্রিয়া কিছু কমিয়ে কেবল ছন্দের ঘাত ও লয় ঠিক রেখে n_4 কোমল স্বর-এ দাঁড়িয়ে বলি। যেন, A_4 স্বরের তুলনায় n_4-এর দূরত্বে আকাশ মাটির অবস্থানের আপেক্ষিকতা প্রকাশ পায়—যেখান থেকে তারারা দৃষ্টি মেলে আছে অন্ধকারে ; কৌতুহল নিয়ে দেখছে। কোমল পর্দা ব্যবহারের ফলে রাতের পরিবেশ ও তারার আলোর মৃদুতা দুই-ই প্রকাশ পায়। অভিব্যক্তিতে মৃদু সহানুভূতি ও বিস্ময় লেগে থাকে। 'অবাক' ও 'মিট্‌মিট্‌' শব্দদুটিতে অর্থব্যঞ্জনা।

দ্বিতীয় পংক্তিতে (A_4+l_3) যুগ্মস্বরে রোলিং ফিরে আসে এবং গতির দ্রুততা, প্রায় লাফিয়ে ছোটার দৃশ্যাভিঘাত, রোলিং-এর শ্বাসাঘাতে প্রকাশ পায়। ক্রমশঃ 'রাণার সবেগে' ও 'হরিণের মতো'তে স্বর A_4-এর সঙ্গে l_4, l_5 পর্য্যন্ত গড়িয়ে এগিয়ে গেলে, রাণারের গতিদৃশ্যও এগিয়ে চলার অনুভব জোগায়

কত গ্রাম কত / পথ যায় সরে / সরে

(A_4+l_4)...... ....

শহরে রাণার / যাবেই পৌঁছে / ভোরে

(A_4+l_4)............ ....

এই দুটি পংক্তিতেই স্বর (A_4+l_4) যুগ্মভাবে একস্থানে থেকে পর্বে পর্বে আবর্তিত। প্রথম পংক্তিতে আবর্তনের সঙ্গে শ্বাসাঘাতে দৃশ্যগুলি ছিট্‌কে সরে যাওয়ার আভাস আনতে থাকি। দ্বিতীয় পংক্তিতে কেবল রোলিংসহ লয়টি ধরে রাখলেই ছুটে চলার ক্রমদৃশ্য উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয় বাক্য 'যাবেই'-তে প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। সেই সঙ্গে 'যাবেই' ও 'পৌঁছে' শব্দে অর্থব্যঞ্জনা আপনিই এসে পড়ে।

হাতে লণ্ঠন/করে ঠন্‌ঠন্‌/জোনাকীরা দেয়/আলো

L_3.......................... ....

মাভৈঃ রাণার এখনো রাতের কালো

(L_3+n_2).........................

প্রথম পংক্তিটি L_3 শুদ্ধ স্বরে কেবল রোলিংসহ বর্ণনাত্মকভাবে বলি। লয় যে দ্রুততায় পৌঁছেছে, সেটা ঠিক রাখি। ফলে দৃশ্যগত গতির অনুভব সরে যায় না। 'হাতে লণ্ঠন, করে ঠন্‌ঠন্‌' শব্দপুঞ্জে ধ্বনিব্যঞ্জনার দ্বারা দোদুল্যমান

লণ্ঠনের দৃশ্যানুভব যুক্ত হয়। পরের পংক্তিতে রোলিং সরিয়ে নেওয়া হয়, ছন্দের ঘাতও। (L_2+n_2) যুগ্মস্বরে আশ্বাসবাণী ঘোষণার মতো করে পংক্তিটি প্রক্ষেপণ করা হয়। 'মাভৈঃ', 'রাতের কালো' ও 'এখনো' শব্দে সম্ভাব্য অর্থ-ব্যঞ্জনা করি।

এমনি করেই/জীবনের বহু/বছরকে পিছু/ফেলে

L_1.... . ...

পৃথিবীর বোঝা/ক্ষুধিত রাণার/পৌঁছে দিয়েছে/'মেলে'

L_2... ....

ক্লান্ত শ্বাস/ছুঁয়েছে আকাশ/মাটি ভিজে গেছে/ঘামে

(A_4+L_2)......................... ... .

জীবনের সব/রাত্রিকে ওরা/কিনেছে অল্প/দামে

L_2 .....

অনেক দুঃখে/বহু বেদনায়/অভিমানে অনু/রাগে

l_4...

ঘরে তার প্রিয়া/একা শয্যায়/বিনিদ্র রাত/জাগে

l_4 ... .

ঘোষণাজনিত আবর্তহীন স্বরে 'মাভৈঃ, রাণার...' পংক্তিটি বলেই আবার রাণার-এর দৌড়-এর লয়ে ফিরে যাই। শুরু করি L_1 স্বরে। স্বরে আবর্তনও থাকে। পরের পংক্তি একইভাবে L_2তে। 'মেলে' শব্দে 'Mail-এ' কথার অর্থ উচ্চারণের যথার্থ যত্নে প্রকাশ করতে হয়। এখানে গতিচিত্রটি সম কিন্তু দ্রুত লয়ে জেগে থাকে। L_1 থেকে পরবর্তী পংক্তিতে L_2 স্বরে উঠলে স্বভাবতই রাণারের ছুটে চলার উদ্যমটুকু ফুটে ওঠে। দুটি পংক্তিতেই অভিব্যক্তিতে বঞ্চনার বেদনা থাকে।

পরের পংক্তিতে ধাবমান রাণারের শারীরিক কষ্ট ও শ্বাসের ওঠা-পড়া স্পষ্ট করে তোলার সুবিধের জন্য L_2 স্বরের সঙ্গে A_4 স্বরকে যুগ্মভাবে ব্যবহার করি। গতির লয় একই থাকে। অভিব্যক্তিতে পথশ্রমের কষ্ট ও অন্তর্বেদনা মিলে মিশে থাকে। এরই মধ্যে বাক্যার্থ স্পষ্ট করে তুলি। 'অল্প' শব্দে তারই ফলে অর্থব্যঞ্জনা হয়।

পরবর্তী পংক্তিতে গৃহস্মৃতি আরো ব্যথাতুর কণ্ঠে বর্ণিত হয়, l_4 কোমল স্বরে। 'দুঃখে', 'বেদনায়', 'অভিমানে-অনুরাগে' শব্দে ব্যঞ্জনা হয়। তার পরবর্তী পংক্তিতে l_4 বা তার ঠিক নিম্নবর্তী কোমল স্বর ব্যবহার করে স্মৃতিভারাতুরতা বজায় রাখতে থাকি। এবং লয় ক্রমশ মন্থর করে আনি। এই মূহুর্তে, ব্যক্তিগত ব্যথার স্মৃতি রাণারের চলনকে মন্থরতা দিলো। তার পা আর চলে না। এই হচ্ছে দৃশ্যব্যঞ্জনা।

রাণার! রাণার!
n_1 ....

এ বোঝা টানার / দিন কবে শেষ / হবে
n_1 .... n_2—n_1—l_5—l_4

রাত শেষ হয়ে / সূর্য্য উঠবে / কবে।
i_4 ... l_4 ....

কোমল পর্দা n_1 দিয়ে শুরু। দ্বিতীয় পংক্তিতে স্বরের আবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাহত হয় লয় ক্রমশঃ মন্থরতর হওয়ায়। তার স্থান নেয় স্বল্প মীড়, যেমন দেখানো হয়েছে। অভিব্যক্তিতে সহানুভূতি ও হতাশা দুই-ই থাকে। যেহেতু রাণারকে উদ্দেশ্য করে আবৃত্তিকারই একথা বলছেন, তাই সহানুভূতি। আর দৃশ্যব্যঞ্জনায় মন্থরতা এমনভাবে আসছে, যেন রাণারের হাঁটু ভেঙে আসছে, টলে পড়ে যাবে সমস্ত শরীর। তাই হতাশা। 'রাত', 'সূর্য্য' এবং 'কবে' শব্দে ব্যঞ্জনা।

ঘরেতে অভাব / পৃথিবীটা তাই / মনে হয় কালো / ধোঁয়া
A_4 ....

পিঠেতে টাকার / বোঝা : তবু এই / টাকাকে যাবে না / ছোঁয়া
L_1 .. ..

এখানে লয়ের মন্থরতা বজায় থাকে। ছন্দের ঘাত একটু অনিয়মিতভাবে পড়ে যেন লয়কে টলিয়ে দেয় যাতে দৃশ্যব্যঞ্জনায় রাণারের এলোমেলো ক্লান্ত পদক্ষেপ ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে অভিব্যক্তিতে ক্লান্তি, হতাশা ও ক্ষোভ থাকে। স্বরে আবর্তন থাকে কিন্তু লয়ের অনিয়মের জন্য তার ঘাতও এমন হয়, যেন

পরিশ্রান্ত মানুষের স্বরের অনিয়ন্ত্রণ। অভাব, কালো, ধোঁয়া, টাকা, ছোঁয়া, ইত্যাদি শব্দে অর্থব্যঞ্জনা।

রাত নির্জন / পথে কত ভয় / তবুও রাণার / ছোটে
A_3 ....

দস্যুর ভয় / তারো চেয়ে ভয় / কখন সূর্য্য / ওঠে
A_4 ... .

এখান থেকে আবার লয় বাড়তে আরম্ভ করে এবং নিয়মিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, দৃশ্যতঃ, রাণার সম্বিৎ পেয়ে তার কর্তব্যের মধ্যে ফিরে এসেছে। স্বর আবর্তিত হয় যথাক্রমে A_3 ও A_4 স্তরে। ছুটে চলার দৃশ্যব্যঞ্জনাকে গুরুত্ব দিয়ে আবৃত্তি করি। সেই সঙ্গে রাতের নির্জনতা, আশঙ্কা এসব ফোটে অভিব্যক্তিতে। স্বাভাবিকভাবেই, নির্জন, ভয়, তবুও, দস্যু, সূর্য্য ইত্যাদি শব্দে অর্থব্যঞ্জনা হয়। মনে রাখতে হয়, কখনোই অভিব্যক্তি ও অর্থব্যঞ্জনার কাজ করতে গিয়ে লয় ও স্বরের আবর্তন দ্বারা গড়ে ওঠা পরিবেশটি যেন নষ্ট না হয়।

কত চিঠি লেখে / লোকে
L_1.... ....

কত সুখে প্রেমে / আবেগে স্মৃতিতে / কত দুঃখে ও / শোকে
L_1 .. ..

এর দুঃখের / চিঠি পড়বে না / জানি কেউ কোনো / দিনও
l_3 ....

এর জীবনের / দুঃখ কেবল / জানবে পথের / তৃণ
l_3 ... ...

এর দুঃখের / কথা জানবে না / কেউ শহরে ও / গ্রামে
l_3 ....

এর কথা ঢাকা / পড়ে থাকবেই / কালো রাত্রির / খামে
l_3 ... .

এই ছয়টি পংক্তি জুড়ে স্বরের রোলিং সম্পূর্ণ বজায় থাকে। লয় মধ্যম। মধ্যগতিতে রাণারের ছুটে চলার দৃশ্যব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি

L_1 স্বরে। এই পংক্তি দুটির অভিব্যক্তি সাধারণ কথা বলার। তৃতীয় পংক্তি থেকে পর্দা বদল হয়। কোমল স্বর। অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে সহানুভূতি। সহানুভূতির সঙ্গে কিছুটা ক্ষোভ মেশে। সেই আবেগের খাতিরেই পরের পংক্তিতে গলা এক পর্দা চড়ে, কোমল স্বর l_3-তে। পরক্ষণেই আবার নেমে আসে l_2তে। অভিব্যক্তিতে গাঢ় হয়ে আসে বিষণ্ণতার ছায়া। এই ফাঁকে, ছন্দের গতির মধ্যেই যথাসম্ভব অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেষ্টা হয় 'কত' শব্দে, 'সুখে-প্রেমে' 'আবেগে-স্মৃতিতে', 'দুঃখে ও শোকে' শব্দ-জোড়গুলিতে, ৪র্থ পংক্তির 'দুঃখ' এবং 'তৃণ' শব্দে, ৫ম পংক্তির 'কেউ' শব্দে ও ৬ষ্ঠ পংক্তির 'ঢাকা' শব্দে, 'কালোরাত্রির খামে' শব্দসমষ্টিতে।

দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটি মিটি

n_3 ....

একে যে ভোরের / আকাশ পাঠাবে / সহানুভূতির চিঠি

$(n_1+A_5)-(l_5'+A_5)\ (l_5+A_5)-(l_4+A_5)-(l_3+A_5)-(l_2+A_5)$

আবৃত্তির লয় ঠিক রেখে, দৃশ্যব্যঞ্জনায় রাণারের দৌড় বজায় রেখে, যেন এখন তাকাই আকাশের দিকে, যেখানে তারারা সমবেদনায় দৃষ্টি মেলে আছে। তার ফলে গলা উঠে যায় n_3 কোমল পর্দায়। এই পংক্তিতে স্বরের রোলিং প্রায় নেই। কেবল স্বল্প শ্বাসাঘাত আছে প্রতি পর্বে। যাতে ধাবমান রাণারের দৃশ্য তখনও মাথায় থাকে। এই পংক্তিতে 'কাঁপে' ও 'মিটিমিটি' শব্দে ব্যঞ্জনা আপনিই আসে, প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব রাণারের ব্যথার শরিক—এরকম অনুভব থেকে।

পরবর্তী পংক্তিতে আকাশের থেকে চোখ নামিয়ে আবার মাটিতে আসতে হয়। সেই সঙ্গে আকাশ-মাটির মধ্যবর্তী শূন্যতা জুড়ে নেমে আসে সমবেদনার ছায়া। তাই স্বর n_1 থেকে গড়িয়ে নামে l_2 পর্যন্ত। কিন্তু স্বরে এই সমস্ত পরিক্রমায় shade থাকে A_5 স্বরের, যুগ্মস্বর হিসেবে। সে কেবল দৃশ্যাভিঘাত অটুট রাখার জন্য। এ সময় লয় একটু মন্থর হয়ে গেলেও পর্বে পর্বে ঘাতগুলির আভাস বজায় রাখতে হয়। ভোরের, আকাশ, সহানুভূতি, শব্দে ব্যঞ্জনা থাকে।

রাণার! রাণার! /

A_5... ....

কী হবে এ বোঝা / বয়ে

A_5 ... .

কী হবে ক্ষুধার / ক্লান্তিতে ক্ষয়ে / ক্ষয়ে

A_5... ....

রাণার। রাণার। /

(A_5+L_1)... ....

ভোর তো হয়েছে / আকাশ হয়েছে / লাল

(A_5+L_1).... ....

আলোর স্পর্শে / কবে কেটে যাবে / এই দুঃখের / কাল

(A_5+L_2) ... ...

রাণার, গ্রামের / রাণার

(A_5+L_2)... ... .

সময় হয়েছে / নতুন খবর / আনার

(A_5+L_2) ....

শপথের চিঠি / নিয়ে চল আজ / ভীরুতা পেছনে / ফেলে

(A_5+L_3) ....

পৌঁছে দাও এ / নতুন খবর / অগ্রগতির / 'মেলে'

(A_5+L_4).... ....

দেখা দেবে বুঝি / প্রভাত এখুনি / নেই দেরী নেই / আর

(A_5+N_1) ....

ছুটে চলো, : ছুটে / চলো আরো বেগে / দুর্দম হে রা / নার

(L_1+N_1) - .... N_1... n_2 ....

গতির দৃশ্যব্যঞ্জনা অব্যাহত রেখেই এই অংশটিতে পৌঁছে যাবার পর ব্যাকুল একটি জিজ্ঞাসা ও ক্ষোভের মিশ্র অভিব্যক্তিতে এই অংশের আবৃত্তি শুরু। যে লয়ে আগের পংক্তি আবৃত্তি হচ্ছিল, এখানেও 'ক্ষয়ে ক্ষয়ে' পর্য্যন্ত সেই লয়ই বজায় থাকে। কিন্তু স্বরে আবর্তনের স্পষ্টতা বাড়িয়ে তুলে দৃশ্যব্যঞ্জনার দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়। স্বরস্থান, A_5-এ রাখা হয় এই সমস্ত সময় জুড়ে।

পরবর্তী পংক্তির শুরুতেই, রাণারের চলার গতি বাড়িয়ে দিই। যেন ভেতর থেকে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার এক দুরন্ত তাগিদ উদ্দীপনাময় করে তোলে তার চলাকে। এরপর পংক্তি থেকে পংক্তিতে ক্রমশঃ দ্রুততর হতে থাকে পদক্ষেপ এবং শেষ পংক্তিতে 'ছুটে চলো' অংশটি উচ্চারণের পর, উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য প্রক্ষেপণের ভঙ্গিতে অণুমাত্রকাল বিরতি নিয়ে অতিপর্ব হিসেবে উচ্চারণ করা 'ছুটে' শব্দটির ঘায়ে 'চলো আরো বেগে দুর্দম হে রাণার' অংশটির উচ্চারণে যেন কামানের গোলার মত চোখের সামনে দিয়ে ছিট্‌কে দুরন্ত গতিতে ছুটে বেরিয়ে যায় রাণার, অনন্ত দিগন্তের দিকে।

'রাণার! রাণার!' পংক্তি থেকেই A_5 স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় L_1 এবং ক্রমে উদ্দীপনার ও লয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে, A_5 কে কর্ড হিসেবে নিয়ে L_2, L_3, L_4 হয়ে N_1 পর্যন্ত স্বর চড়ে যেতে থাকে। শেষে কর্ডটিও উঠে আসে L_1 স্বরে। এবং 'দুর্দম হে রাণার' অংশে দৌড়ে দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া বোঝাতে যথাক্রমে N_1 ও n_2 ন্যাজাল স্বরে পৌঁছে আবৃত্তি শেষ হয়। শেষ মুহূর্তে দৃশ্যব্যঞ্জনার খাতিরে আপনিই L_1 যুগ্মস্বরটি প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। এরই মধ্যে 'রাণার গ্রামের রাণার' অংশ থেকে দ্রুততার সঙ্গে স্বরে রেলিং-এর ঘাত বাড়তে থাকলে, দ্রুততার মধ্যে রাণারের পদক্ষেপ ও পদধ্বনি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ক্ষুধার, ক্লান্তিতে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে, ভোর, আকাশ, লাল, আলোর, দুঃখের, নতুন, শপথের, ভীরুতা, অগ্রগতির Mail-এ, ছুটে চলো, আরো বেগে, দুর্দম ইত্যাদি শব্দে ব্যঞ্জনা থাকে, যার প্রত্যেকটিই অনিবার্য।

এই সমস্ত কাঠামোটাই যে আবৃত্তি শুরু করার আগে ছকে নেওয়া হয়েছে এমন নয়। অনুভবের পূর্বকথিত সব বিবর্তনের পর কোনো একসময় সেই অনুভবকে কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। নানাভাবে চেষ্টা হয়েছে প্রকরণ আর অনুভবকে মেলাবার। শেষ পর্যন্ত যখন একটা চেহারায় পৌঁছনো

গেল, সেই চেহারাটার বারংবার উপস্থাপনে, বারবারই অনুভবকে ছুঁতে পারা যাচ্ছে এমন দেখা গেল, তখন তাকে বিশ্লেষণ করে এই কাঠামো উপস্থাপিত হ'ল।

একজন আবৃত্তিকারের সংবেদন ও মনন থেকে জন্ম যে আবৃত্তিরূপের, শিল্পতত্ত্বগত কারণেই অন্যজনের তা অনুসরণ করার কোনো মানে নেই। একটা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি এভাবে তুলে ধরার একটিই কারণ, কেমন করে গড়ে ওঠে আবৃত্তিরূপ, তার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন।

কিন্তু এই সমগ্র গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে পড়ে ও ধারার অনুশীলন করতে করতে না এলে, এই রূপটি সঠিক বুঝে নেওয়া সম্ভব নয় এবং আবৃত্তি করার সময় কাজে না লাগলেও কেবল আবৃত্তিরূপটি উপভোগ করার ইচ্ছা হলেও, বর্ণিত কাঠামোটি গলায় তুলে নেওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। সেক্ষেত্রে, মোটের ওপর এই কাঠামোটি অনুসরণ করে আবৃত্তি করতে পারলে, বর্ণিত স্বরস্থান বা স্বরসঞ্চালনের কিছু ইতরবিশেষ ঘটলেও, আবৃত্তিরূপটি উপভোগ করা সম্ভবপর হবে বলেই বিশ্বাস।

রচনাপঞ্জী

১। শিল্পতত্ত্ব পরিচয়—সাধন ভট্টাচার্য্য

২। শিল্পতত্ত্ব আলোচনার ধারা—সাধন ভট্টাচার্য্য

৩। নন্দনতত্ত্ব—ডঃ সুধীর কুমার নন্দী

৪। তিলোত্তমা শিল্প—কুমার রায়

৫। প্রসঙ্গ : নাট্য—শম্ভু মিত্র

৬। অভিনেতার প্রস্তুতি—কন্‌স্তান্‌তিন্‌ স্তানিস্লাভস্কি (অনুঃ ব্রজসুন্দর দাস)

৭। কবিতা পরিচয় (সংকলন)—অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

৮। রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। কাব্যালোক—ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

১০। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব

১১। পান্থজনের সখা— ঐ

১২। নিঃশব্দের তর্জনী—শঙ্খ ঘোষ

১৩। শব্দ আর সত্য—শঙ্খ ঘোষ

১৪। 'মেঘদূত' ও 'বোদলেয়রের কবিতা'র ভূমিকা—বুদ্ধদেব বসু

১৫। শিল্পায়ন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬। ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮। শিল্পকথা—নন্দলাল বসু

১৯। সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের পথে, শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০। চিত্রকর—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

২১। রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২২। নাট্যশাস্ত্র—ভরত

২৩। Poeties—Aristottle

২৪। Aesthetics—B. Croche

২৫। নাটক-অভিনয়—প্রকাশ নন্দী
২৬। বাঙালীর নাট্যচর্চা—অহীন্দ্র চৌধুরী
২৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮। কবিতার কথা—জীবনানন্দ দাশ
২৯। যে পথে দাঁড়িয়ে—পল্ রোবসন্ (অঃ—দীপেন্দু চক্রবর্তী)
৩০। Voice & Speech in Theatre—J. C. Turner.
৩১। Voice & Speech—Malcom Morrison
৩২। The Voice—W. A. Aikin M. D.
৩৩। সঙ্গীতচিন্তা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৪। গীতসূত্রসার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫। রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা—ডঃ নীহারবিন্দু সেন
৩৬। স্বর ও বাক্‌রীতি—ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
৩৭। স্বর ও শ্রুতি—ডাঃ অমরনাথ মল্লিক
৩৮। রবীন্দ্র সংগীত—শান্তিদেব ঘোষ
৩৯। ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪০। ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন
৪১। বাংলাভাষার আধুনিকতত্ত্ব ও ইতিকথা—ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
৪২। General Phonetics—R. M. S. Heffner
৪৩। বাংলা ভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৪। শব্দতত্ত্ব— ঐ
৪৫। Phonetics—R. K. Bansal
৪৬। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
৪৭। কাব্য মঞ্জুষা—মোহিতলাল মজুমদার
৪৮। বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার
৪৯। ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫০। ছন্দ-সরস্বতী—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৫১। কবিতার ক্লাশ—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৫২। ছন্দের বারান্দা—শঙ্খ ঘোষ
৫৩। ছন্দ-পরিক্রমা—প্রবোধচন্দ্র সেন,
৫৪। বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা—ঐ

৫৫। ছন্দোজিজ্ঞাসা —ঐ

৫৬। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ —ঐ

৫৭। আধুনিক বাংলা ছন্দ (১ম ও ২য়)—নীলরতন সেন

৫৮। বাংলা ছন্দের কূটস্থান—উত্তম দাশ

৫৯। Microphones—How they work & how to use them—
Martin Clifford

সংকোচের সঙ্গেই সংযোজিত হ'ল এই রচনাপঞ্জী। আমার সামগ্রিক আবৃত্তি ভাবনার গঠনে প্রত্যক্ষ সাহায্য আছে নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থের ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা রচনার, যার সকল সূত্র যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয় নি, অথচ তার নির্যাস রয়ে গেছে আমার চর্চায়। আবার, কিছু গ্রন্থের প্রভাব এত দূরায়ত্তী, যে তাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ভেবে সে সব নাম বর্জিত হ'ল। এইভাবে, যথার্থ ঋণ স্বীকারে ত্রুটি রয়ে গেল। এজন্য দুঃখিত।

গ্রন্থকার

আবৃত্তি বিষয়ে পঠনীয়

পুস্তক

আবৃত্তি-কোষ—ডঃ নীরদবরণ হাজরা

বিষয় : আবৃত্তি—স. দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায়

বাংলা আবৃত্তি সমীক্ষা—প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আবৃত্তি-শিক্ষা—কল্যাণ মিত্র

বাংলা কবিতা আবৃত্তি—প্রফুল্ল কুমার দত্ত

সাময়িক পত্র

ছন্দনীড় — ছন্দনীড় আবৃত্তি সংস্থার মুখপত্র

বাল্মিকী স্মরণ — আবৃত্তি আকাদেমীর মুখপত্র

বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে মনে হয়েছিল, গ্রন্থকারের কণ্ঠ, উচ্চারণ, ছন্দ ও অভিব্যক্তির ক্রিয়াগুলির আলোচনার পাশাপাশি ওই বিষয়গুলি ধরে গ্রন্থকারের স্বকণ্ঠের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করতে পারলে বইটি সম্পূর্ণতা পায়, অনুশীলনের ক্ষেত্রটি আরো সহজ হতে পারে।

সেই আগ্রহেই একটি ক্যাসেট প্রকাশ করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই।

বিজ্ঞাপিত বিক্রয়কেন্দ্রে ঘোষণাপত্রটি দেখালে কুড়ি টাকা মূল্যের ক্যাসেটটি আঠারো টাকায় পাওয়া যাবে।

প্রজ্ঞা প্রকাশন